তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

১

এতে রয়েছে

- মূল কুরআনুল কারীম
- অনুবাদ : আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর তরজমার অনুকরণে
- শব্দে শব্দে অনুবাদ
- শানে নুযূল / কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট
- তাফসীর : মুফতি শফী (র.)-এর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের অনুকরণে
- আয়াত ও সূরার পূর্বাপর সম্পর্ক : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)-এর অনুকরণে
- আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি
- প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল
- শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ
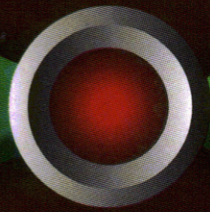
ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা

المكتبة الإسلامية

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

[১ম থেকে ৫ম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক

লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (১ম খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম

২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস

২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم - "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رحمة للعالمين ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتى -

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্রময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✧ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا اِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ اٰيَاتٍ لَمْ يَجَاوِزْهُنَّ حَتّٰى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)।

সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন–

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ -

অর্থাৎ, এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ اَوْ اَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✧ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুতি, হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত

করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্দেলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসুম
৪১১দক্ষিণ, মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা
২৩/০৭/২০১৩ ইং
১৩ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- **মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক**
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুল আলীম**
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হুসাইন**
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- **মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী**
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান**
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হুসাইন**
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

কুরআন পরিচিতি

কুরআন কি?

কুরআন বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ ও মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মানব জাতির পথনির্দেশের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের উপরেই ইসলামের পরিপূর্ণ কাঠামো ভিত্তিশীল। ইসলামের মূলনীতি ও নিয়ম কানুন সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় কুরআনপাক চূড়ান্ত দলিল বলে স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরিত নির্দেশাবলির সংকলনই হচ্ছে– 'কুরআন'।

'কুরআন' শব্দের আভিধনিক অর্থ : আরবি কুরআন (قُرْآن) শব্দটি قَرَأَ يَقْرَأُ -এর ক্রিয়া মূল (مَصْدَرٌ)। সে হিসেবে قُرْآن অর্থ পাঠ করা। শব্দটি مَفْعُوْل তথা مَقْرُوْءٌ [পঠিত] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই একে কুরআন (قُرْآن) বলে নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কুরআনের সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ–

اَلْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ ـ

অর্থাৎ, কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি নাজিল করা হয়েছিল এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যা "তাওয়াতুর" (تَوَاتُرْ) -এর সাথে অর্থাৎ, সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। –[নূরুল আনওয়ার, পৃ. ৯ ও ১০]

নামকরণ : কুরআন মানে পাঠ, পাঠ করা হয়েছে বা পঠিত। যেহেতু কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এক সাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং পূর্ণ ২৩ [তেইশ] বৎসরে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁরই নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট প্রয়োজন অনুসারে পাঠ করে শুনিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, যা অদ্যাবধি মানুষ পাঠ করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করতে থাকবে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কুরআন'।

কুরআন মাজীদের নামসমূহ :

১. اَلْقُرْآنُ : ইরশাদ হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ ـ

এরূপভাবে কুরআন মাজীদের আরো ৬৫ স্থানে এই قُرْآن কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. اَلْكِتَابُ : ইরশাদ হয়েছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

৩. اَلذِّكْرُ : ইরশাদ হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

৪. اَلْفُرْقَانُ বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। যথা– هُوَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

৫. اَلنِّعْمَةُ বা নিয়ামত, বিশেষ দান। যথা– وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ

৬. كَلَامُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাণী। যথা– حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

৭. اَلنُّوْرُ বা আলোকবর্তিকা। যথা– وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

৮. اَلْكَرِيْمُ বা সম্মানিত। যথা– إِنَّهٗ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ

৯. اَلْحِكْمَةُ বা তত্ত্বজ্ঞান। যথা– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

১০. اَلْحُكْمُ বা বিচার। যথা– أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ
১১. اَلصِّرَاطُ বা পথ। যথা– وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا
১২. اَلْحَقُّ বা সত্য, সঠিক। যথা– إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ
১৩. اَلتَّنْزِيْلُ বা প্রত্যাদেশ, অবতীর্ণ। যথা– إِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
১৪. اَلْمَوْعِظَةُ বা উপদেশ বা নসিহত। যথা– قَدْ جَائَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
১৫. أَحْسَنُ الْحَدِيْثِ বা সর্বোত্তম বাণী। যথা– اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ
১৬. اَلْهُدٰى বা হেদায়েত, পথ প্রদর্শক। যথা– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ
১৭. اَلرُّوْحُ বা আত্মা। যথা– يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ
১৮. اَلشِّفَاءُ বা নিরাময়কারী। যথা– وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ
১৯. اَلْعِلْمُ বা জ্ঞান। যথা– مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
২০. اَلْحَبْلُ বা রশি। যথা– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا
২১. اَلْاَمْرُ বা আদেশ। যথা– ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ؛
২২. اَلْمُبِيْنُ বা প্রকাশ্যমান। যথা– حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ
২৩. اَلرَّحْمَةُ বা দয়া, করুণা। যথা– وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ
২৪. اَلْوَحْىُ বা প্রত্যাদেশ। যথা– إِنَّمَآ أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ
২৫. اَلْبَشِيْرُ বা সুসংবাদদাতা। যথা– بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ
২৬. اَلنَّذِيْرُ বা ভয় প্রদর্শনকারী। যথা– اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا
২৭. اَلْعَزِيْزُ বা মহাপরাক্রমশালী। যথা– وَاِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ
২৮. اَلْقَوْلُ বা কথা। যথা– اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
২৯. اَلْمُكَرَّمَةُ বা সম্মানিত। যথা– فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

কুরআন অবতরণের সময় ও পদ্ধতি

মহাগ্রন্থ 'কুরআন' নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; বরং এটা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা সম্বলিত একটি ঐশী গ্রন্থ। কুরআনপাক লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত। এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ, বরং এ মহিমান্বিত কুরআন লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত। লাওহে মাহফূয হতে পবিত্র রমজান মাসে 'লায়লাতুল কদর' বা মহিমান্বিত রাতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআন পৃথিবীর প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ওহীর মাধ্যমে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হতো।

ওহীর অর্থ : ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– গোপনে সংবাদ দেওয়া। অন্তঃকরণে কোনো ভাব সৃষ্টি এবং ইঙ্গিত দান করাকেও ওহী বলে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ওহী হচ্ছে– هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى أَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, নবীদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত বাণীকে ওহী বলে।

ওহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর পৃথিবী হলো মানব জাতির জন্য পরীক্ষাগার। কেননা এখানে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি উপভোগে তাঁরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং আদেশ-নিষেধের অনুসরণে সাবধানে চলতে হয়। আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাকে পৃথিবীর মোহাচ্ছন্নতা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকতে হয়, তাই তাকে জানতে হয় কোনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ এবং কোনটিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি। মানুষ সাধারণত তিনটি মাধ্যমে কোনো কিছু জানতে পারে। যথা– ১. পঞ্চেন্দ্রিয়, ২. জ্ঞান ও ৩. ওহীর মাধ্যমে। পঞ্চেন্দ্রিয় ও জ্ঞানের মাধ্যমে যা জানা যায় তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কোনটি তার চলার সঠিক পথ, কোনটি সুখ-শান্তি ও কল্যাণের পথ, কোনটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ তা সে পরিপূর্ণভাবে জানতে সক্ষম হয় না। তাই সিরাতে মুস্তাকীমের নির্দেশনা পেতে হলে তাকে ওহীর জ্ঞান জানা অত্যাবশ্যক। কেননা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ সেখানেই ওহীর জ্ঞানের শুরু। বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি যেখানে এসে তিমিরাচ্ছন্নতায় থমকে দাঁড়ায় ওহী সেখানে আলোর পথ দেখায়। ওহী অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাই পৃথিবীর পরীক্ষাগার হতে উত্তীর্ণ হয়ে মানযিলে মাকসূদে পৌঁছতে হলে ওহীর জ্ঞান অপরিহার্য।

ওহীর প্রকারভেদ

ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ সাধাণত দুই প্রকার। যথা– ১. ওহীয়ে মাতলূ বা পঠিত ওহী ২.ওহীয়ে গায়রে মাতলূ বা অপঠিত ওহী। যে ওহীর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাকে ওহীয়ে মাতলূ বলে। আর যে ওহীর মর্মার্থ আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূল ﷺ-এর তাকে ওহীয়ে গায়রে মাতলূ বলে। তাই পবিত্র কুরআন হলো ওহীয়ে মাতলূ এবং হাদীস শরীফ বা সুন্নাহ হলো ওহীয়ে গায়রে মাতলূ।

ওহী অবতরণের পদ্ধতি

সত্যের জ্ঞানের প্রধান উৎস ওহী। আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -এর উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ওহী অবতীর্ণ করেছেন। হাদীশাস্ত্র পর্যালোচনা করে ওহী অবতরণের যে সকল পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে–

(১) ঘণ্টাধ্বনির মতো এক ধরনের ওহী। ঘণ্টা যেমন বিরতিহীনভাবে বাজতে থাকে, ওহী-এর ঘণ্টাও তেমনি। এ ধরনের ওহী নাজিল হলে রাসূল ﷺ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন, ওহী নাজিলের সকল পদ্ধতির মধ্যে এটিই ছিল সর্বাধিক কষ্টকর।

(২) কখনো কখনো রাসূল ﷺ-এর ঘুমন্ত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ওহী নাজিল হতো। আর রাসূল ﷺ-এর স্বপ্ন সাধারণ লোকের জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব ঘটনা স্বচক্ষে দেখার চেয়েও সত্য।

(৩) কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন। যেমন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত জিবরাঈল (আ.) অধিকাংশ সময় হযরত দিহইয়াতুল কালবী (প্রখ্যাত সাহাবী)-এর আকৃতিতে আমার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

(৪) কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন।

(৫) কোনো কোনো সময় পর্দার আড়াল হতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথা বলেছেন। এ প্রকারের ওহীতে তাঁদের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী ছিল না।

(৬) মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ -এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি ওহীর উদয় হতো। রাসূল ﷺ আল্লাহ প্রদত্ত এ ওহীকে তাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতেন।

(৭) হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সাথে রাসূল ﷺ কথা বলতেন। এ পদ্ধতিতে মি'রাজের রাতে মহানবী ﷺ ওহী লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া কোনো কোনো সময় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে হযরত ইসরাফীল (আ.) ও মহানবী ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

ওহী লেখকদের নাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহী লেখার কাজ যাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা কোনো কোনো মুফাসসির চল্লিশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত যুবায়ের, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, আমর ইবনে আস, উবাই ইবনে রাবী, মুগীরা ইবনে শু'বা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, সাঈদ ইবনে আস, মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, যায়েদ ইবনে সাবেত, তালহা ইবনে ওবায়দিল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মু'আইকিব দাউসী, হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান ও হুয়াইতিব ইবনে আবদিল ওজ্জা (র.)।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাস : কুরআন মাজীদ মূলত আল্লাহর কালাম। এজন্য যে কুরআন কারীম লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ছিল। যেমন– কুরআনে আছে– بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
"বরং এটাতো সম্মানিত কিতাব যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত" অতঃপর বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী পুরো কুরআনে কারীমকে কদরের রজনীতে লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আকাশে বায়তুল ইজ্জত নামক ঘরে অবতীর্ণ করা হয়। বাইতুল ইজ্জতকে বাইতুল মা'মূরও বলে, যা কা'বা শরীফের ঠিক বরাবর প্রথম আসমানে অবস্থিত। এটি ফেরেশতাদের ইবাদতগাহ। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) বাইতুল ইজ্জত থেকে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। যার ধারাবাহিকতা ২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে।

কুরআন সংকলন করা ও তার হেফাজতের ইতিহাস

এ কুরআন কারীম লিখে একত্র করা হয়েছে প্রথমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে। দ্বিতীয়বার হযরত আবূ বকর (রা.) -এর যুগে। তৃতীয়বার হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে।

রাসূলের যুগে কুরআন হেফাজতের পদ্ধতি : কুরআন কারীম যেহেতু একসাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই কিতাব আকারে লিখে সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। তাই রাসূল ﷺ-এর সময়ে কুরআন কারীমের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য কুরআনে কারীম মুখস্ত করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন রাসূল ﷺ সাথে সাথে তা বার বার পড়তে থাকতেন, যাতে করে মুখস্থ হয়ে যায়। এ কারণে সূরায়ে কিয়ামায় আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কুরআন মুখস্থ করার জন্য বারবার পড়ার দরকার নেই; বরং আমি নিজেই তা মুখস্থ করিয়ে দিব, এবং আপনার হৃদয়ে গেঁথে দিব। অর্থাৎ, আপনাকে এমন মুখস্থ শক্তি দান করা হবে যে, একবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি তা কখনো ভুলবেন না। সুতরাং তাই হলো। একদিকে রাসূল ﷺ-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, অন্য দিকে রাসূল ﷺ-এর তা মুখস্থ হয়ে যেত এভাবে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র সীনা মুবারকে পুরা কুরআনে কারীম সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। আর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন কারীম মুখস্থ করিয়ে দিতেন। কুরআন মুখস্থ করার উৎসাহ উদ্দীপনা এমন ছিল যে, কোনো কোনো মহিলা নিজের স্বামীর কাছ থেকে মহর গ্রহণ করার পরিবর্তে কুরআন কারীম মুখস্থ করিয়ে দেওয়াকেই মহর হিসেবে গ্রহণ করতেন। শতশত সাহাবায়ে কেরাম তাদের জিন্দেগী কুরআন কারীমের পিছনে বিলীন করে দিয়েছেন। হযরত উবাদা (রা.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি হিজরত করে মদিনায় আসত তখন তাকে রাসূল ﷺ আমাদের একজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন কুরআন শিখিয়ে দেওয়ার জন্য, এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম -এর এক বিশাল জামাত কুরআন কারীমের হাফেজ হয়ে গেলেন। যাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও হযরত তালহা, হযরত সা'আদ, হুযায়ফা, সালিম, আবূ হুরায়রা, আমর ইবনে আস, কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুরআন কারীমকে হেফজ করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লেখকদের মাধ্যমে লিখিয়ে রাখতেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর ওহী লেখার কাজ করতাম। এছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত হোযায়ফা, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান, হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস, হযরত শুরাহবীল ও হাসানা (রা.)-এর নাম কাতেবে ওহী হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, যখন কুরআনের কোনো আয়াত নাজিল করা হতো তখন তিনি কাতেবে ওহীদেরকে বলতেন, যে এই আয়াতটিকে অমুক পারার অমুক সূরার অমুক আয়াতের সাথে লেখ। সেই যুগে আরবদের নিকট যেহেতু কাগজের প্রচলন খুবই কম ছিল। এ কারণে কুরআনে কারীমের বেশির ভাগ আয়াত পাথরের উপর, চামড়ার উপর, খেজুর গাছের খোলের উপর, বাঁশের উপর এবং জানোয়ারের হাড়ের উপর লেখা হতো। এভাবে রাসূল ﷺ-এর জমানাতেই রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কুরআনে কারীমের একটি খণ্ড লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যদিও তা পুস্তক আকারে বিন্যস্ত ছিল না।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে কুরআনের সংকলন

যেহেতু রাসূল ﷺ-এর জমানায় কুরআন কারীম কিতাব আকারে সংকলিত ছিল না এবং সাদা পাথরের টুকরায়, চামড়ার উপর, বাঁশের উপর এবং খেজুর গাছের ডালের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল তাই ঐ সময় কুরআন কারীম হেফাজত করতে বেশি নির্ভর করা হতো হাফেজে কুরআনদের উপর। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত কালে যখন নবুয়তের মিথ্যাদাবিদার مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ [মুসাইলাতুল কায্যাব]-এর বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহাবী শহীদ হলেন। যার মধ্যে ৭০ জন্য হাফেজে কুরআন সাহাবীও ছিলেন।

হাফেজ সাহাবীদের শহাদাতের কারণে হযরত ওমর (রা.) এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, যদি এভাবে হাফেজ সাহাবীরা শহীদ হতে থাকেন তাহলে কুরআনের বিরাট একটি অংশ আমাদের থেকে হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অতএব কুরআন এভাবে শুধু হেফজের উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় না; বরং পুরা কুরআনে কারীমকে গ্রন্থাকারে নিয়ে আসা উচিত। তাই তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট ব্যাখ্যা ভিত্তিক প্রস্তাব পেশ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন,

"আমি এমন কাজ করব না যা রাসূল ﷺ করেননি।" কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং উক্ত কাজটির উপকারিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে ভালোভাবে বুঝাতে লাগলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.) অনেক ভেবে চিন্তে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং বললেন–

شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ عَلٰى مَا قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ "ওমরের প্রস্তাবের উপর আল্লাহ আমার দিলকে খুলে দিলেন।" অর্থাৎ, ওমরের প্রস্তাবের যথার্থতা আল্লাহ আমার দিলে ঢেলে দিলেন। অতএব হযরত ওমর (রা.)-এর যে অভিপ্রায় আমারও সেই অভিপ্রায়। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবে একমত হয়ে গেলেন। অতঃপর এ কাজের জন্য كَاتِبُ الْوَحْىِ [ওহী লেখক] হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-কে দায়িত্ব দেওয়া হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যয়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে যায়েদ! তুমি একজন যুবক, বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ওহী লেখার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছ। অতএব তুমি কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো সংগ্রহ করে জমা করে দাও। হযরত যায়েদ (রা.) -ও এই প্রস্তাবকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ন্যায় প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তাঁদের উভয়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে এ গুরুদায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নেন।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) কিভাবে কুরআন মাজীদ সংকলন করেছিলেন?

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) নিজে হাফেজ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিজে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে পুরা কুরআন লিখতে পারতেন। এছাড়া শত শত হাফেজে কুরআন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে কুরআন মাজীদ লিখতে পারতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যে নুসখা লেখা ছিল হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) ঐ নুসখার দ্বারা পুরা কুরআন সংকলন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেননি; বরং তিনি সমস্ত পদ্ধতিকে সামনে রেখে কুরআনে কারীম সংকলন করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) তার নুসখার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াত লিখতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত আয়াতটি مُتَوَاتِرْ হওয়ার উপরে মৌখিক কিংবা লিখিত সাক্ষী না পাওয়া যেত। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যে নুসখা লেখা হয়েছিল তা বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) সে সমস্ত নুসখাকে একত্র করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁর কাছে যতটুকু কুরআন কারীম ছিল, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত সেগুলোকে একত্র করে নিলেন। যখন কোনো সাহাবী তাঁর কাছে কোনো লিখিত আয়াত নিয়ে আসতেন, তখন তিনি তা চার পদ্ধতিতে যাচাই করতেন।

১. সর্বপ্রথম তিনি দেখতেন তিনি যেভাবে মুখস্থ করেছেন তার সাথে মিল আছে কিনা?
২. অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি হযরত ওমর (রা.) কে দিয়ে সত্যায়ন করাতেন। কারণ হযরত ওমর (রা.) হাফেজ ছিলেন।
৩. লিখিত কোনো আয়াতকে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এ আয়াতের সত্যায়নের উপর দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সাক্ষ্য না দিত যে, তা রাসূলের সামনেই লেখা হয়েছিল।
৪. অতঃপর সে আয়াতকে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের লিখিত আয়াতের সাথে মিলানো হতো। এভাবে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কুরআনের একটি নুসখা তৈরি করলেন, কিন্তু নুসখাটির আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তারতীব অনুযায়ী লিখা হলেও সূরাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তারতীব অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল না এবং এ নুসখার মধ্যে কুরআনের সাত কেরাতকেও জমা করা হয়েছিল। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখাটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ছিল এবং তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মুলমুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রাখা ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর মারওয়ান ইবনে হাকাম সেই নুসখাটি বিলুপ্ত করে দেন। কারণ, তখন হযরত উসমান (রা.)-এর তৈরিকৃত নুসখাই চলছিল।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

যখন হযরত উসমান (রা.) খলিফা হলেন তখন ইসলাম আরব থেকে রুম ও ইরান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এ দিকে আজারবাইজান, খোরাসান, বুখারা, সমরকান্দ, তাশখন্দ, তুর্কিস্থান, উজবেকিস্তান, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, কাযাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, সিজিস্তান, তাজিকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান মুসলমানরা জয় করতে লাগল এবং এসব এলাকার লোকেরা যখন মুসলমান হতে লাগল তখন তারা বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন কেরাত অনুযায়ী কুরআন শিখতে লাগল, আর প্রত্যেক সাহাবী তার শাগরেদকে ঐ কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়াতেন যে কেরাত তিনি নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পড়েছেন। এভাবে কেরাতগুলোর اِخْتِلَافْ দূর দূরান্তে পৌঁছে গেল। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ে অবগত ছিল যে, কুরআন সাত কেরাতের উপর নাজিল হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে কেরাতের ভিন্নতার কারণে কোনো প্রকারের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তীতে কেরাতের ভিন্নতা যখন দূর দূরান্তে পৌঁছে গেল এবং লোকেরা কুরআন সাত কেরাতের উপর অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অবগত ছিল না বিধায় তাদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে গেল, তখন কিছু লোক নিজের কেরাতকে সহীহ এবং অন্যের কেরাতকে ভুল বলতে লাগল। এ ঝগড়ার দ্বারা লোকেরা একদিকে

কুরআনের مُتَوَاتِرْ তথা ধারাবাহিক কেরাতগুলোকে ভুল গণ্য করার অপরাধে লিপ্ত হতে লাগল। অন্য দিকে তা যাচাই করার মতো কোনো সুযোগও ছিল না। কারণ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখা শুধু মদিনাতেই ছিল। এছাড়া কুরআনের নির্ভরযোগ্য কোনো নুসখা ছিল না।

শামের লোকেরা উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ত। আর ইরাকের লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ত। যেহেতু শামের লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিল, সে কারণে তারা ইরাকের লোকদেরকে কাফের বলতে লাগল। মদিনাতেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পরামর্শ করলেন। পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, সকলে মিলে কুরআনের এমন একটি নুসখা তৈরি করবে যা সকলে পড়বে ও পড়াবে এবং সাত লুগাতের ছয় লুগাতকেই বাদ দিয়ে শুধু লুগাতে কোরাইশের উপরই কুরআনকে সংকলন করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং অন্যান্য জলীলুল কদর সাহাবীদেরকে নিয়ে একটি টিম গঠন করলেন এবং তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন যে, হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রাখা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখা থেকে এমন একটি নুসখা তৈরি করবে যার মধ্যে সূরাগুলো সঠিক ধারাবাহিকতায় থাকবে এবং কুরআন শুধু লুগাতে কুরাইশের উপরই বহাল থাকবে। এভাবে কুরআনের একটি কপি তৈরি হলো।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআনের তৈরি নুসখার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে প্রস্তুতকৃত নুসখার মধ্যে সূরাগুলো তারতীব অনুযায়ী ছিল। যা হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা.)-এর জমানায় প্রস্তুতকৃত নুসখার মধ্যে ছিল না।

২. কুরআন কারীমের আয়াতগুলো এমন এক তারতীবে লেখা ছিল যে, লেখার ভিতরে কোনো হরফের নুকতাও ছিল না, এমনকি যের, যবর ও পেশ কিছুই ছিল না।

৩. হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে প্রস্তুতকৃত নুসখাটি পুরো উম্মতের সম্মিলিত সত্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল। উক্ত নুসখার সংখ্যা ছিল ৫টি, আবার কেউ কেউ বলেন ৭টি। ৭টি নুসখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো–

১. একটি নুসখা মক্কায়, এ নুসখাটি ৬৫৭ হিজরি পর্যন্ত মক্কায় ছিল। মা'মার ইবনে জুবায়ের আন্দালুসী ৫৭৯ হিজরিতে তা দর্শন করেছিলেন। আল্লামা শিবলী নুমানী (র.) লিখেন, যে যুগে তিনি সফর করেছিলেন, তখন এ নুসখাটি জামে দিমাশক-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কাশশাফুল মাহদি ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, সুলতান আব্দুল হামিদ খান যিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন ছিলেন এবং আনুমানিক ৩০ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তাঁর যুগে একবার মসজিদে জামে দিমাশকে আগুন লেগে যায়, তখন ঐ নুসখাটি পুড়ে যায়।

২. একটি নুসখা ছিল শামে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল্লামা আহমদ মুকরী ৩৭৫ হিজরিতে এ নুসখাটি দর্শন করেছিলেন। এ নুসখাটি পরে সালাতীনে আন্দালুস, অতঃপর সালাতীনে মুহিদ্দীন অতঃপর সালাতীনে বনী মুরীনের হস্তগত হয় এবং জামে কুরতুবার মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তীতে কুরতুবাবাসী এ নুসখাটি সুলতান আব্দুল মুমিনকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে আব্দুল মুমিনের নির্দেশে ইবনে শাকুরী রাজধানী মারাকেশে নিয়ে যান। সম্ভবত স্থানান্তরটি ১১ শাওয়াল ৫৫২ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। ৬৪৫ হিজরিতে খলিফা মুতাযিদ আলী ইবনে মামুনের কাছে ছিল। ঐ বৎসর খলিফা তালেমান আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যুদ্ধের মধ্যে নুসখাটি হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে যেকোনোভাবে নুসখাটি তালেমানের শাহী খাজানায় পাওয়া যায় সেখান থেকে একজন ব্যবসায়ী ক্রয় করে পাছ শহরে নিয়ে আসেন যা এখনো পাছের মধ্যেই আছে।

৩. একটি নুসখা ছিল ইয়েমেনে, ঐতিহাসিকদের মতে এ নুসখাটি মিশরের কুতুবখানা জামে কায়রোর মধ্যে রয়েছে।

৪. একটি নুসখা ছিল বাহরাইনে, ঐতিহাসিকদের মতে এ নুসখাটি ফ্রান্সের কুতুবখানায় রয়েছে।
৫. একটি নুসখা ছিল বসরায় এ নুসখাটি মিশরের খাদিও নামক কুতুবখানায় ছিল তা সুলতান সালাউদ্দিন আইউবীর উজির ৫৭৫ হিজরিতে ৩০ হাজার আশরাফী দিয়ে ক্রয় করে নেন।
৬. একটি নুসখা ছিল কুফায়, এ নুসখাটি কুস্তুনতুনিয়ার কুতুবখানায় রয়েছে।
৭. একটি নুসখা ছিল মদিনায়। এই নুসখাটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট ছিল। পরে হযরত আলী (রা.)-এর হস্তগত হয়। হযরত আলী (রা.)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হওয়ার পর তার হস্তগত হয়। সেখান থেকে আন্দালুস চলে যায়। সেখান থেকে মারাকেশের রাজধানী পাছে চলে যায়। সেখান থেকে আবার মদিনায় ফিরে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধে গভর্নর ফখরী পাসা অন্যান্য বরকতময় জিনিসের সাথে এ নুসখাটি কুস্তুনতুনিয়ায় নিয়ে যান। এখনো সেখানে আছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এছাড়া হযরত উসমান (রা.)-এর আরো ৩টি নুসখা ছিল একটি কায়রোর জামে সাইয়েদিনা হুসাইন (রা.)-এর মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়টি জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লিতে ছিল। যদি ভারত বিভক্তির সময় নষ্ট বা ধ্বংস না হয়ে থাকে তাহলে এখনো থাকতে পারে। তৃতীয়টি ইণ্ডিয়া অফিস লন্ডন কুতুবখানায় রয়েছে। তার উপর লেখা ছিল কাতাবাহু উসমান ইবনে আফ্‌ফান। এ নুসখাটি মোগল সম্রাটের কাছে ছিল। তার উপর বাদশাহ আকবর এর সিল মোহর লাগানো আছে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মেজর রাওনাস তার সন্ধান পান। পরে তিনি তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুতুবখানায় দিয়ে দেন। এটি এখনো ইণ্ডিয়া অফিসের কুতুবখানায় রয়েছে।
–[সূত্র– আল্লামা শামসুল হক আফগানীর লিখিত উলূমুল কুরআনের ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা]

উক্ত নুসখাগুলো তৈরি হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) ছোট ছোট যত নুসখা সাহাবায়ে কেরামের কাছে সংরক্ষিত ছিল সবগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে দিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখার উপর সমস্ত উম্মত একমত হয়ে গেল যে, কুরআন কারীমকে রুসমে উসমানীতে তথা হযরত উসমান (রা.)-এর লিপির বিপরীত অন্য কোনো পদ্ধতি লিপির লেখা জায়েজ নেই।

কুরআনকে সাত লুগাতে অবতীর্ণ করার তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমকে সাতটি গোত্রের ভাষায় নাজিল করেছেন। যাতে করে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয় এবং সহজেই তেলাওয়াত করা যায়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মদীকে কুরআনের শব্দকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ অনেক সময় অনেক মানুষ কোনো শব্দকে অন্যের মতো একইভাবে পড়তে পারে না। তাই তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে সাতটি পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ "কুরআন কারীমকে সাত কেরাত এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।" অতএব এই সাত পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতি তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় সে পদ্ধতিতে পড়।

সাত পদ্ধতি কি কি?

১. اِخْتِلَافُ الْاَسْمَاءِ এ এখতেলাফের মধ্যে مُفْرَدْ، تَثْنِيَة، جَمْع، تَذْكِيْر، تَانِيْث -এর পার্থক্য শামিল রয়েছে। যেমন এক কেরাত এর মধ্যে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ অথচ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ
২. اِخْتِلَافُ الْاَفْعَالِ এ এখতেলাফের মধ্যে যেমন এক কেরাতে রয়েছে صِيْغَةُ الْمُضَارِعِ অথচ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে صِيْغَةُ الْاَمْرِ আবার অন্য কেরাতে আছে صِيْغَةُ الْمَاضِىْ যেমন : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا অথচ অন্য কেরাতে আছে بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا
৩. اِخْتِلَافُ وُجُوْهِ الْاَعْرَابِ অর্থাৎ যার মধ্যে اِعْرَابْ -এর পার্থক্য রয়েছে। যেমন এক কেরাতে আছে لَا يُضَارُّ كَاتِبٌ অন্য কেরাতে আছে لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ

৪. اِخْتِلَافُ قِلَّةِ الْاَلْفَاظِ وَكَثْرَتِهَا শব্দের কম বেশির اِخْتِلَافْ অর্থাৎ এক কেরাতের মধ্যে কোনো لَفْظ কম আছে আর অন্য কেরাতের মধ্যে কোনো শব্দ বেশি আছে। যেমন– এক কেরাতে আছে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অন্য কেরাতে আছে تَجْرِىْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

৫. اِخْتِلَافُ تَقْدِيْمِ الْاَلْفَاظِ وَتَاخِيْرِهَا অর্থাৎ, শব্দের আগে পরের পার্থক্য। যেমন, এক কেরাতের মধ্যে একটি لَفْظ আগে আছে। আরেক কেরাতের মধ্যে পরে আছে। যেমন এক কেরাতের মধ্যে আছে وَجَائَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে وَجَائَتْ سَكْرَتُ بِالْحَقِّ الْمَوْتِ

৬. اِخْتِلَافُ تَبْدِيْلِ الْاَلْفَاظِ অর্থাৎ, এক কেরাতের মধ্যে একটি لَفْظ আছে। অন্য কেরাতের মধ্যে এর পরিবর্তে অন্য لَفْظ আছে যেমন এক কেরাতে আছে نُنْشِرُهَا অন্য কেরাতের মধ্যে আছে نُنْجِهُ

৭. اِخْتِلَافُ اللَّهْجَةِ অর্থাৎ এর মধ্যে لَفْظ-এর পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পড়ার পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন এক কেরাতে আছে مُوْسَى আর এক কেরাতে আছে مُوْسٰى

কুরআন কারীমের তারতীব

কুরআন মাজীদ এর বর্তমান তারতীব লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী, নাজিল হওয়ার তারতীব অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ শুরুতেই যখন কুরআনে কারীম লাওহে মাহফূয থেকে সামায়ে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হলো তখন লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে, অতঃপর সামায়ে দুনিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল (আ.) তারতীব ছাড়াই প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু করে নিয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে লিখিয়ে দিতেন বা ইয়াদ করিয়ে দিতেন তখন লাওহে মাহফূয এর তারতীব অনুযায়ী ইয়াদ করিয়ে দিতেন বা লিখিয়ে দিতেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ প্রত্যেক রমজান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করতেন এবং জীবনের শেষ রমজানেও হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করেছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিল যাতে করে কুরআনের তারতীব লাওহে মাহফূয এর তরতীব অনুযায়ী হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান কুরআনের তারতীব লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত বা রহস্য

এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কেরাম কয়েকটি জবাব পেশ করেছেন–

১. কুরআন কারীম যদি এক সাথে অবতীর্ণ হতো তাহলে কুরআন মুখস্থ করা ও আয়ত্ব করা কঠিন হয়ে যেত।

২. কুরআন যদি এক সাথে অবতীর্ণ হতো তাহলে কুরআনের হুকুম আহকাম জানা কঠিন হয়ে যেত।

৩. যেহেতু কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক কষ্ট দিতো, তাই হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বারবার আসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার কারণ হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা সহজ হতো এবং তাঁর ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেত।

৪. কুরআনের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন ঘটনা ও প্রশ্ন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং সমীচীন হলো যখন ঘটনা বা প্রশ্ন আসবে তখনই আয়াত নাজিল হবে। যাতে করে মানুষ সময় উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। –[সূত্র : তাফসীরে কাবীর, ২ : ৩৩৬]

কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করা : কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করাটা অর্থের দিক থেকে করা হয়নি; বরং বাচ্চাদের পড়ার সুবিধার্থে কুরআনকে ত্রিশ পারায় বণ্টন করা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করেন।

কুরআন মাজীদের হরফের সংখ্যা

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন কুরআনের حَرْف সংখ্যা হলো– ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৬ শত একাশি।

২. হযরত ফজল বিন আতা বিন ইয়াছার বলেন, কুরআনের حَرْف সংখ্যা হলো– ৩ লক্ষ ২৩ হাজার পনেরটি।

৩. হাজ্জাজ বিন ইউসূফ তৎকালীন সমস্ত হাফেজ, কারী ও কাতেবদেরকে ডেকে কুরআনের হরফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা ভালো করে গুণে সর্বসম্মতভাবে রায় দিলেন যে, কুরআনে হরফ সংখ্যা হলো ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত ৪ সংখ্যা হলো–

ا -এর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৪ শত ৭২টি
ب -এর সংখ্যা ১১ হাজার ২০০টি।
ت -এর সংখ্যা ১ হাজার ১ শত ৯২টি।
ث -এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭৬টি।
ج -এর সংখ্যা ৩ হাজার ২ শত ৭৬টি।
ح -এর সংখ্যা ৩ হাজার ৩ শত ৭৩টি।
خ -এর সংখ্যা ২ হাজার ৪ শত ১৬টি।
د -এর সংখ্যা ৫ হাজার ৬ শত ৪২টি।
ذ -এর সংখ্যা ৪ হাজার ৬ শত ৯৭টি।
ر -এর সংখ্যা ১১ হজার ৭ শত ৯৩টি।
ز -এর সংখ্যা ১ হাজার ৫ শত ৯০টি।
س -এর সংখ্যা ৫ হাজার ৮ শত ৯১টি।
ش -এর সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৫৩টি।
ص -এর সংখ্যা ২ হাজার ১৩টি।
ض -এর সংখ্যা ১ হাজার ৬ শত ৩৭টি।
ط -এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭৪টি।
ظ -এর সংখ্যা ৮ শত ৪৬টি।
ع -এর সংখ্যা ৯২ হাজার ২ শতটি।
غ -এর সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৮টি।
ف -এর সংখ্যা ৮ হাজার ৪ শত ৯৯টি।
ق -এর সংখ্যা ৬ হাজার ৮ শত ১৩টি।
ك -এর সংখ্যা ৯ হাজার ৫ শত ২২টি।
ل -এর সংখ্যা ৩ হাজার ৪ শত ৩২টি।
م -এর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫ শত ৩৫টি।
ن -এর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫ শত ৬০টি।
و -এর সংখ্যা ২৫ হাজার ৫ শত ৩৬টি।
ه -এর সংখ্যা ১৯ হাজার ৭০টি।
ء -এর সংখ্যা ৪ হাজার ১ শত ১৫টি।

পবিত্র কুরআনের লাম আলিফের সংখ্যা ৩ হজার ৭ শত ২৫টি। ى -এর সংখ্যা হলো ২৫ হজার ৯ শত ১৯টি। উল্লিখিত তথ্য আল্লামা আবূ নায়েছ সমরকান্দি তার কিতাব বুস্তানী মুহাদ্দিসাতে তাঁর উস্তাদ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহর থেকে বর্ণনা করেছেন।

হরকতের সংখ্যা : কুরআনের মধ্যে হরকত অর্থাৎ যবর, যের, পেশ এবং দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশের চিহ্ন সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (র.) লাগিয়েছেন। কিন্তু তার লাগানো হরকত বর্তমানে আমাদের সামনে যে হরকত রয়েছে এ আকৃতিতে ছিল না; বরং যবর বুঝানোর জন্য হরফের উপরে এক নুকতা। যের বুঝানোর জন্য হরফের নিচে এক নুকতা আর পেশ বুঝানোর জন্য হরফের সামনে এক নুকতা এবং দুই যবর দুই যের দুই পেশ বুঝানোর জন্য অন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আমাদের সামনে যে হরকতের চিহ্ন রয়েছে তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ-এর নির্দেশে হযরত ইয়াহ ইবনে ইয়ামার, হাসান বসরী, হযরত নছর ইবনে আসিম, হযরত লাইছী (র.) সম্মিলিতভাবে লাগিয়েছেন।

عُلُوْمُ الْقُرْآنِ لِلْاَفْغَانِىْ -এর বর্ণনা মতে এবং বিখ্যাত আলেম সুপ্রশিদ্ধ ফকীহ আল্লামা আবুল লাইছ সামারকান্দী (র.)-এর অভিমত অনুসারে اَلْقُرْآنُ এর যবর-এর সংখ্যা ৫৩ হাজার ২ শত ৪২ টি বা ৪৩ টি; যের -এর সংখ্যা ৪৯ হাজার ৫ শত ৮২টি; পেশ এর সংখ্যা ৮ হাজার ৮ শত ৪টি।

تَشْدِيْد وَهَمْزَه হযরত আহমদ ইবনে খলিল (র.) ১৭০ হিজরিতে লাগিয়েছিলেন। আবু লাইছ সামারকান্দির মতানুসারে কুরআনের তাশদীদ এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৫২ টি। এবং হামযা -এর সংখ্যা ৪ হাজার ১ শত ১৫টি عُلُوْمُ الْقُرْآنِ لِلْاَفْغَانِىْ তেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আরববাসীদের মধ্যে হরফের উপর নুকতা লাগানোর কোনো নিয়ম ছিল না। পরবর্তীকালে যখন অনারবীরা ইসলামে দিক্ষিত হতে লাগল। তখন তারা কুরআন কারীম ভুল পড়তে লাগল। তাই অনারবীদের সুবিধার্থে কুরআনের হরফের উপর নুকতা লাগানো হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম কে নুকতা লাগিয়েছেন, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কারো কারো মতে হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী (র.) হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম কুরআনে নুকতা লাগিয়েছেন।
২. আবার কেউ কেউ বলেন কুফার গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবী সুফিয়ান এ কাজটি করেছেন।
৩. আবার কেউ কেউ বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে হযরত হাসান বসরী, ইয়াহইয়াহ ইবনে ইয়ামার, নছর ইবনে বনূ আসিম লাইছি এ কাজটি করেছেন।

আল্লামা লাইছির অভিমত অনুসারে কুরআনের নুকতার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৮১ টি অথবা ১ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৮৪টি আবার কেউ বলে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৪৮টি, আবার কেউ বলেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৮২টি।

মদের সংখ্যা : কুরআনের মদের সংখ্যা হলো ১ হাজার ৭ শত ৭১টি।

কুরআনের জ্ঞাতব্য কিছু বিষয়

কুরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা। পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহ' শব্দটি ২ হাজার ৫ শত ৮৪ বার এসেছে। কুরআন নাজিল হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর। পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মদ' শব্দটি ৪ বার এসেছে এবং আহমদ শব্দটি ১বার এসেছে।

কুরআন নাজিল হয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রুহুল আমিন, রুহুল কুদুস বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম কুরআন নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান

কুরআন সর্বপ্রথম ১৭ই রমজান ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই আগস্ট রোজ সোমবার হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাজিল হয়। পুরা কুরআন নাজিল হতে সময় লেগেছে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন। পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত আছে লাওহে মাহফূযে। পবিত্র কুরআনের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

কখন কোন সূরা নাজিল হয়েছে

১. নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বৎসর : সূরা আলাক, আল কলম, আল মুয্যাম্মিল ও আল মুদ্দাসসির।
২. নুবয়তের ২য় বৎসর : আল-আ'লা, আত তাকভীর, আল ক্বিয়ামাহ, আল ইখলাস, আল ফীল, কুরাইশ, আল ফজর, আত ত্বীন, আল লাহাব, আল ফালাক, আন নাস।
৩. নবুয়তের ৩য় বৎসর : আশ শামস, আল লাইল, আদ দুহা, আল ইনশিরাহ, আল বালাদ, আত্ব ত্বারিক, আল বুরূজ, আবাসা, আল ফাতিহা, আশ শু'আরা, আত্ব তূর, আয যারিয়াত, ক্বাফ, আল গাশিয়াহ, আল আদিয়াত, আত তাকাসূর।
৪. নবুয়তের ৪র্থ বৎসর : আল ফুরকান, আন নামল, সাবা, ফাত্বির, আন নাজম, আল কামার, আর রহমান, আল ওয়াকিয়াহ, আল মুলূক, আল হাক্কাহ, আল মা'আরিজ।
৫. নবুয়তের ৫ম বৎসর : আল মুরসালাত, আদ্দাহর, নূহ, সা'দ, ত্বা-হা, মারইয়াম, আলমাউন, আল কাউসার, আস সাফ্ফাত, হা-মীম সাজদা।
৬. নবুয়তের ৬ষ্ঠ বৎসর : ইয়াসীন, আননাবা, আল আসর, আত তাত্বফীফ, আল ইনফিতার, আল কাফিরূন্
৭. নবুয়তের ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর : আন নাযি'আত, আল ইনশিকাক, আর রূম, আল ক্বারিআহ, আল আম্বিয়া।
৮. নবুয়তের ৮ম বৎসর : আল কদর, আল বায়্যিনাহ, আল হুমাযা।
৯. নবুয়তের ৯ম বৎসর : আল আনকাবূত, আস সাজদাহ, লুকমান, আয যিলযাল।
১০. নবুয়তের ১০ম বৎসর : আন নামল, আল মুমিনূন, আশ শূরা, আয যুখরুফ, আদ দুখান, আল জাসিয়া, আল জিন।
১১. নবুয়তের ১০/১১ম বৎসর : আল আহকাফ।
১২. নবুয়তের একাদশ বৎসর : আল মুমিনূন, আল আন'আম, ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, আর রা'দ, ইবরাহীম, আল হাজার।
১৩. নবুয়তের একাদশ-দ্বাদশ : আয যুমার, আল আ'রাফ।
১৪. নবুয়তের দ্বাদশ : বনী ইসরাঈল, আল কাহাফ, আল কাসাস, আংশিক হা-মীম আস সাজদা।
১৫. নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসর হিজরি ১ম সন : আল হাজ, আত তাগাবুন, মুহাম্মদ।
১৬. হিজরি ১-২য় সন : আল বাকারা, আল ইনফি'তাল।
১৭. হিজরি ২য়-৩য় সন : আল ইমরান।
১৮. হিজরি ৩য় সন : আন নিসা, আল মায়েদা, আস সাফ।
১৯. হিজরি ৩য়-৪র্থ সন : আল জুমুআ।
২০. হিজরি ৪র্থ সন : আল আশার।
২১. হিজরি ৫ম বৎসর : আল মুনাফিকুন, আল আহযাব, আন নূর।
২২. হিজরি ৬ষ্ঠ বৎসর : আত তালাক, আল ফাতহ, আল মুজাদালা।
২৩. হিজরি ৭ম সন : আত তাহরীম, আংশিক আহযাব।
২৪. হিজরি ৮ম সন : আল মুমতাহিনা, আল হাদীদ।
২৫. হিজরি ৯ম সন : আত তওবা, আল হুজুরাত।
২৬. হিজরি ১০ম সন : আন নাস, ও اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আয়াতের শ্রেণি বিন্যাস

قَالَ الدَّانِيْ : اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ عَدَدَ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ سِتَّةُ الْاٰفِ اٰيَةٍ، ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَزِدْ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : وَمِئَتَا اٰيَةٍ وَاَرْبَعُ اٰيَاتٍ، وَقِيْلَ : وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَقِيْلَ : وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَقِيْلَ : وَخَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ، وَقِيْلَ : وَسِتٌّ وَّثَلَاثُوْنَ. (بِمُعْجَمِ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ الدَّكْتُوْر حُسَيْن تَصَارْ فِى الْمُقَدَّمَةِ)

প্রথম ও শেষ বিবিধ আলোচনা

১. নাজিলকৃত সর্বপ্রথম শব্দ হলো اِقْرَأْ

২. মক্কায় সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে সূরায়ে আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

৩. মক্কাবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা আছে। কেউ বলেন, সূরায়ে আনকাবূত, কেউ বলেন, সূরায়ে মুমিন, কেউ বলেন, সূরায়ে তাখফীফ।

৪. মদিনায় সর্বপ্রথম নাজিলকৃত সূরা হলো সূরায়ে বাকারা।

৫. সর্বশেষ সূরা হলো সূরায়ে মায়েদা।

৬. সমষ্টিগতভাবে সূরা আলাক -এর প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম নাজিল হয় এবং সর্বশেষ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ নাজিল হয়।

৭. তবে পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম সূরায়ে ফাতেহা নাজিল হয়।

৮. কুরআনের সর্বপ্রথম হাফেজ হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৯. কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)।

১০. আল কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন রবার্ট ক্যাটেনেনিছা।

১১. সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আমীরুদ্দীন বশুনিয়া আংশিক ১৮০৮ ঈসায়ী সালে এবং মৌলভী নঈমুদ্দীন পূর্ণাঙ্গ।

১২. সর্বপ্রথম পুস্তক আকারে অনুবাদ করে প্রকাশ করে গিরিশ চন্দ্র সেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। অনেক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কুরআনের অনুবাদ মূল গিরিশ চন্দ্র সেন করেননি; বরং অনুবাদ করেছেন মৌলভী আব্দুর রহীম। কিন্তু পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা ছিল না। যার কারণে তিনি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তৎকালীন ইংরেজদের রাজধানী কলকাতায় গেলেন ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা নেওয়ার জন্য। কিন্তু ইংরেজরা মৌলভী আব্দুর রহীম থেকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি জোর করে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর মৌলভী আব্দুর রহীম অনেক অনুনয় করার পরেও কুরআনের পাণ্ডুলিপি ফেরত না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে রিক্ত হস্তে বাড়িতে ফিরে আসেন। এদিকে ইংরেজরা কুরআনের পাণ্ডুলিপি গিরিশচন্দ্র সেন -এর হাতে তুলে দেয়। গিরিশচন্দ্র সেন অনেকখানি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিজের নামে প্রকাশ করে। ১৫১৫ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কুরআন সবচেয়ে বেশি উর্দূ ভাষায় অনুদিত হয়। যার সংখ্যা ৭৭০ টি। এ পর্যন্ত ১২০ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়। ছাপার অক্ষরে কুরআনের সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ হলো مَوَاهِبُ الْوُهِيَّةِ যা তাফসীরে হোসাইনী নামে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হয়।

কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা হলো সূরায়ে বাকারা। আর সবচেয়ে ছোট সূরা হলো সূরায়ে কাউছার। কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো اٰيَةُ الدَّيْنِ অর্থাৎ সূরায়ে বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াত। কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো– وَالْفَجْرِ وَالضُّحٰى ইত্যাদি।

স্থান ও কাল হিসেবে আয়াতের প্রকারভেদ

স্থান ও কাল হিসেবে আয়াত কয়েক প্রকার :

১. اٰيَات حَضَرِىٌّ [আয়াতে হাজারী] অর্থাৎ সমস্ত আয়াত বাড়িতে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে হাজারী বলে।

২. اٰيَات سَفَرِىٌّ [আয়াতে সাফারী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত সফর অবস্থায় নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে সাফারী বলে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এর ধরনের আয়াতের সংখ্যা ৪০ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। –[সূত্র : ইতকান– ১ : ১৯-২১]

৩. اٰيَات نَهَارِىٌّ [আয়াতে নাহারী] অর্থাৎ দিনে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে আয়াতে নাহারী বলা হয়। অধিকাংশ আয়াত এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪. اٰيَات لَيْلِىٌّ [আয়াতে লাইলী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত রাতে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে লাইলী বলে। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানের শেষ আয়াত– اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ

৫. اٰيَات صَيْفِىٌّ [আয়াতে সাইফী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত গরমকালে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে সাইফী বলে। যেমন সূরায়ে নিসার শেষ আয়াত– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ

৬. اٰيَات شِتَائِىٌّ [আয়াতে শিতায়ী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত শীতকালে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে শিতায়ী বলে। যেমন– সূরায়ে নূরের আয়াত– اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ

৭. آيَات فِرَاشِىٌّ [আয়াতে ফেরাশী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত বিছানায় থাকাকালীন অবস্থায় নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে ফেরাশী বলে। যেমন– اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ –[সূত্র : ইতকান– ১ : ১২-২১]

৮. نَوْمِىٌّ যেগুলো নিদ্রা অবস্থায় নাজিল করা হয়েছে।

৯. سَمَاوِىٌّ যেগুলো মে'রাজের সময় আকাশে অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।

১০. فَضَائِىٌّ শূন্যে অবতীর্ণ আয়াত। –[প্রাগুক্ত ৬৪-৬৬]

حِزْب وَمَنْزِل **মানযিল বা হিযব :** সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাবেয়ীগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কুরআন মাজীদ খতম [শেষ] করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে মানযিল বা হিযব বলা হয়। তাই তাঁরা পাঠের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৭ মানযিলে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম মানযিল : সূরা ফাতিহা হতে সূরা আননিসা -এর শেষ পর্যন্ত
দ্বিতীয় মানযিল : সূরা মায়িদা হতে সূরা আত তাওবা -এর শেষ পর্যন্ত
তৃতীয় মানযিল : সূরা ইউনূস হতে সূরা আন নাহল -এর শেষ পর্যন্ত
চতুর্থ মানযিল : সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা আল ফুরকান -এর শেষ পর্যন্ত
পঞ্চম মানযিল : সূরা আশ-শুআরা হতে সূরা ইয়াসীন -এর শেষ পর্যন্ত
ষষ্ঠ মানযিল : সূরা আস্সাফফাত হতে সূরা আল হুজুরাত -এর শেষ পর্যন্ত
সপ্তম মানযিল : সূরা কাফ হতে শেষ সূরা পর্যন্ত।

جُزْء বা পারা : পবিত্র কুরআনে ত্রিশটি অংশে বিভক্ত যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। পারার এই বিভক্তি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়নি; বরং পড়তে যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমান অংশে কুরআনে কারীমকে বিভক্ত করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এই বিভক্তি সর্বপ্রথম কে করেছেন? তবে কারো কারো ধারণা এটা নবী জামাতা হযরত উসমান (রা.) মাসহাফ অনুকপি করানোর সময় পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারায় [সহীফায়] লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা তকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিতাবে আমি -এর কোনো দলিল এ পর্যন্ত পাইনি।

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) বলেন, কুরআনের ত্রিশ পারার এই নিয়ম প্রসিদ্ধভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে এবং মাদরাসাসমূহের কুরআনী নুসখায়ও এটা প্রচলিত রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় যেন এই বণ্টনধারা সাহাবা পরবর্তী যুগে শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

اَخْمَاسْ وَ اَعْشَارْ খুমুস এবং আ'শার : প্রথম যুগের কুরআনি নুসখায় আরেকটি প্রচলন ছিল, তা হলো– পাঁচ আয়াতের পরে হাশিয়াতে খামছ বা خ এবং দশ আয়াত শেষে আ'শার বা ع লেখা হতো।

প্রথম প্রকারের চিহ্নকে اَخْمَاسْ এবং দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নকে اَعْشَارْ বলে। –[মানাহিলূল ইরফান, খ. ১ম, পৃ. ৪০৩] পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এই আলামতগুলো জায়েজ, আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো মাকরূহ। –[আল ইতকান, খ. ২য়, পৃ. ১/১৭]

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ كَرِهَ التَّعْشِيْرَ فِى الْمُصْحَفِ

অর্থাৎ হযরত মাসরূক (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) পাণ্ডুলিপির মাঝে اَعْشَارْ সংযোজন করাকে অপছন্দ করতেন। –[মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,খ. ২য়, পৃ. ৪৯৭]-এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আশার সাহাবা যুগে প্রচলিত ছিল।

رُكُوْع রুকূ' : আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে রুকূ'। যার প্রবর্তন পরবর্তীকালে করা হয়েছে এবং এ যাবত প্রচলিত রয়েছে। রুকূ' গঠনে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখানে এক ধরনের আলোচনা শেষ হয়, সেখানেই হাশিয়াতে রুকূ' এর চিহ্ন দেওয়া হয়। আর তার সংকেত হচ্ছে (ع)। উলূমুল কুরআনের প্রণেতা হযরত মাওলানা তাকী ওসমানী [দা. বা.] বলেন, আমি যথেষ্ট খোজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি যে, কে কবে রুকূ'র সূচনা করেন। [তারিখুল কুরআন, পৃ. ৮১] কারো কারো ধারণা হচ্ছে, হযরত ওসমান (রা.)-এর সময়েই রুকূ' নির্ধারণ করা হয়। মাওলানা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, রেওয়ায়েতে এর কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

অবশ্য একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই আলামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের এমন একটি পরিমাণ নির্ণয় করা যা নামাজের এক রাকাতে পাঠ করা যায়। এই চিহ্নগুলোকে রুকূ' এই জন্য বলা হয় যে, নামাজে এই স্থানে পৌঁছে রুকূ' করা হয়।

رُمُوْز اَوْقَافْ বিরাম চিহ্ন : কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদের সহজীকরণের নিমিত্তে আরেকটি উপকারী কাজ এটা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাক্যের শেষে এমন কিছু চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই স্থানে ওয়াকফ করাটা কেমন? এই চিহ্নগুলোকে রুমূযে আওকাফ বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একজন অনারবী ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, তখন যেন সে যথাস্থানে ওয়াক্‌ফ করতে পারে এবং ভুল স্থানে শ্বাস ত্যাগ করার কারণেও যেন অর্থের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। এ ধরনের অধিকাংশ চিহ্নের প্রণেতা হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (র.)।

পবিত্র কুরআনের বিরামচিহ্নসমূহ নিম্নরূপ :

○ : বাক্যের শেষে এই চিহ্ন থাকে। এটা ওয়াকফ তাম -এর সংক্ষেপ। বিরতির চিহ্ন। একটি আয়াতের সমাপ্তি বুঝায়। কিন্তু এর উপরে অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

ط : এটা ওয়াকফ মুতলাকের সংক্ষিপ্তরূপ। এর উদ্দেশ্য হলো এখানে ধারাবাহিক আলোচনা বা কথার মিল সমাপ্ত হয়েছে। তাই এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি করা উত্তম।

ج : এটা ওয়াকফ জায়িজ -এর চিহ্ন। এ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز : ওয়াকফে মুযাওয়াযের এটা সংক্ষিপ্তরূপ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে এখানে না থামাই ভালো।

ص : এটা ওয়াকফে মুলাখখাসের চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে যেহেতু বাক্য দীর্ঘকার বা প্রলম্বিত হয়েছে সেহেতু নিঃশ্বাস রাখা সম্ভব না হলে বিরতি করা যায়।

م : এটা ওয়াক্‌ফে লাযেম -এর সংকেত। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওযাকফ করা না হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ স্থানে বিরতি করা [ওয়াকফ্ করা] অতি উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে ওয়াজিব নামেও অভিহিত করেছেন।

তবে এখানে ওয়াজিব বলতে পারিভাষিক ওয়াজিব বুঝানো হয়নি, যা না করলে গুনাহ হয়; বরং এখানে ওয়াজিব বলতে বুঝানো হয় যে, মাঝে মাঝে এই স্থানে ওয়াক্‌ফ করা অধিক উত্তম।

لا : এটা لَا تَقِفْ -এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থেমো না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখানে ওয়াক্‌ফ করা নাজায়েজ; বরং এর অনেক স্থান এমন আছে, যেখানে ওয়াক্‌ফ করলে কোনো অসুবিধা নেই। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াক্‌ফ করতে হয় তবে উত্তম হলো একে পুনরায় মিলিয়ে পড়া। উপরোল্লিখিত বিরাম চিহ্নসমূহ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এর প্রবর্তনকারী হলেন আল্লামা সাজাওয়ান্দী (র.)।

سكتة : এটা সাকতার চিহ্ন। এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত করে কিঞ্চিত থামতে হয়; কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়া যায় না। এটা সাধারণত এমন স্থানে আনা হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়লে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কুরআনের ৪ স্থানে এটা আছে।

قف : এ ধরনের চিহ্নিত স্থানে সাকতার থেকে সামান্য দীর্ঘ বিরতি করতে হয়। এ ধরনের স্থানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা যাবে না।

ق : এটা قِيْلَ عَلَيْهِ -এর সংক্ষেপ। এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি হবে, আর অন্যান্যদের মতে বিরতি হবে না।

وقف : এর অর্থ থেমে যাও। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা উচিত।

صل : এটা [قَدْ يُوْصَلُ] কাদইউসালু -এর সংক্ষেপ। এরূপ স্থানে থামা না থামা উভয়টাই সঠিক তবে থামাই ভালো।

صلى : এটা اَلْوَصْلُ اَوْلٰى -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া উত্তম এই অর্থ প্রকাশ করে।

مع – مُعَانَقَة এটা মু'আনাকা নামে অভিহিত। আয়াতের বা শব্দের ডানে বা বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مَعَ - এর চিহ্ন থাকে অথবা বলা হয় এক আয়াতের দুটো তাফসীর যেখানে সম্ভব, সেখানে এই চিহ্ন লেখা হয়েছে। এক তাফসীর অনুযায়ী এক স্থানে ওয়াক্‌ফ হবে এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য স্থানে ওয়াক্‌ফ হবে। তবে এ দুয়ের মাঝে যেকোনো এক স্থানেও ওয়াক্‌ফ করতে পারে; কিন্তু যদি এক স্থানে বিরতি করে তাহলে অন্য স্থানে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই। –[উলূমূল কুরআন, পৃ.২০০] একে مُقَابَلَة নামেও অভিহিত করা হয়।

وَقْفُ النَّبِيِّ : কোনো কোনো রেওয়ায়েত মুতাবিক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এখানে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন।
وَقْفُ جِبْرَائِيْل : এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামলে বরকত লাভ হয় বলে বর্ণিত আছে।
وَقْفُ غُفْرَانْ : এর চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।
اَلرُّبُعُ : এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার এক চতুর্থাংশ।
اَلنِّصْفُ : অর্ধাংশ অর্থাৎ পারার অর্ধাংশ।
اَلثُّلُثُ : তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার তিন চতুর্থাংশ। –[প্রাগুক্ত : ১৯৩–২০১]

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব ও ধারাবাহিকতা : কুরআন শরীফের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত ও সূরা যে তারতীবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে, মূলত সেটাই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র তরতিব। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকেও এই তরতিবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআনে বর্তমান তরতিব একান্তই ওহীগত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুসলিম উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করে লিখেন–
"কুরআনের প্রত্যেক সূরা ও আয়াতসমূহের তরতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে অবগত করানোর পর সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। –[হাশিয়াতুল জামাল, খ. ১., পৃ. ১২]
কুরআনের প্রথম ৭টি সূরা বড়। পরিভাষায় এগুলোকে سَبْع طِوَالْ বলা হয়। সূরা বাকারা হতে তওবা পর্যন্ত। তার পর কম বেশি একশত আয়াত সম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রয়েছে। পরিভাষায় এগুলোকে مِئِيْن [মিঈন] বলা হয়। এরূপ সূরা সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ২৪টি। তারপর রয়েছে শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাসমূহকে এসব। বলা হয় مَثَانِىْ [মাছানী]। এ সূরাগুলোতে ঘটনাবলি ও উপদেশসমূহের পুনরুক্তি রয়েছে, তাই এগুলোকে মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে ছোট সূরাগুলো। এগুলোকে বলা হয় مُفَصَّلْ মুফাসসাল। সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলে।

মুফসসাল সূরাগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত :

১. طِوَال مُفَصَّلْ : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ৩০টি সূরা রয়েছে।
২. اَوْسَط مُفَصَّلْ : সূরা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ [সূরা লাম ইয়াকুন] পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৩টি সূরা রয়েছে।
৩. قِصَار مُفَصَّلْ : সূরা বায়্যিনাহ [লাম ইয়াকুন] থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৭টি সূরা রয়েছে। –[তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি : ই. ফা. বা]

কুরআন পাকের বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআন হলো মহান আল্লাহর অমিয় বাণী যা আশরাফুল মাখলুকাত ও আল্লাহর খলিফা মানব জাতিকে হেদায়েতের সরল-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনের সকল আলোচনা কেন্দ্রীভূত। তাই পবিত্র কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষ এবং মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবন। কুরআনের বিষয়বস্তু নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা–

(১) عِلْمُ الْمُحَاكَمَةِ **বা শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান :** মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে এতে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত আদায় করো।

(২) عِلْمُ الْمُخَاصَمَةِ **বা ভ্রান্তপন্থীদের আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্কের জ্ঞান :** সমকালীন বিশ্বে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শ যেমন– ইহুদি, খ্রিস্টান এবং কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক্যবাদী ইত্যাদি মতবাদের সকল প্রশ্নের জবাব এতে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন– وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করছ সব কিছু।

(৩) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِاَيَّامِ اللّٰهِ **পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলি :** পবিত্র কুরআন ইতিহাসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। অসংখ্য ঐতিহাসিক কাহিনী এতে বর্ণনা করার মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِاٰلَاءِ اللّٰهِ **[আল্লাহর নিয়ামতরাজি ও নিদর্শনাবলি সংক্রান্ত জ্ঞান]** পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ছড়িয়ে আছে। এসব নিয়ামতরাজির উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ. অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল পাবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা একান্তভাবেই তাঁরই ইবাদত কর।

(৫) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ **[মৃত্যু পরবর্তীকালীন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান]** মানুষের জন্য পৃথিবীর এই জীবনই শেষ নয়; বরং মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু হবে তার প্রকৃত জীবন পরকাল বা আখেরাত। এতে আখেরাতের বিভিন্ন পর্যায়– কবর, হাশর, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন তোমরা আমল করেছিলে। وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرِ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত।

চিত্রে পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের পরিসংখ্যান

সূরা	১১৪	যবর	৫৩২৪২
রুকূ'	৫৪০	যের	৩৯৫৮২
মদনী আয়াত	৩২১৪	পেশ	৮৮০৪
মক্কী আয়াত	৩২২১	মাদ্দ	১৭৭১
বসরী আয়াত	৬২২৫	তাশদীদ	১২৫২
শামী আয়াত	৬২২৬	নোক্তা	১৫৬৮৪
মোট শব্দ	৭৭,৪৩৯	হরফ	৩,৬৪,২১৯

أَسْبَابُ النُّزُوْلِ **[শানে নুযূল]** : অবতরণের দিক দিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ দুপ্রকার। শানে নুযূলবিহীন আয়াত ও শানে নুযূল বিশিষ্ট আয়াত। কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতই এমন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ঘটনার বিবরণ কিংবা সে সময়ে সংঘটিত কোনো সমস্যার সমাধান এসব আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়াতসমূহ এরূপ যেগুলো কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো প্রশ্নের জবাব প্রদান কিংবা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত আয়াত নাজিলের পটভূমির এসব সমস্যা, উত্থাপিত প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে তাফসীর শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় শানে নুযূল।

মক্কী মদনী সূরা

নবুয়ত লাভের পর প্রিয়নবী ﷺ মক্কা শরীফে ১২ বছর ৫ মাস ২ দিন ছিলেন, অতঃপর তিনি মদিনা শরীফে হিজরত করেন এবং ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন মদিনা শরীফে অতিবাহিত করার পর ১১ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

মক্কা শরীফে অবস্থান কালে পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলোকে "মক্কী" সূরা বলা হয়। আর যেসব সূরা মদিনা শরীফে অবস্থানকালে নাজিল হয়েছে সেগুলোকে "মদনী" সূরা বলা হয়।

আমরা কথাটিকে এভাবেও বলতে পারি যে, হিজরতের পূর্বে যেসব সূরা নাজিল হয়েছে, সে সূরাসমূহকে মক্কী সূরা বলা হয়। আর হিজরতের পর অবতীর্ণ সূরাসমূহকে মদনী সূরা বলা হয়। নিম্নে মক্কী ও মদনী সূরাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	
১	সূরা আলাক	১৯	মক্কা শরীফ
২	সূরা মুদ্দাস্সির	৩৫	"
৩	সূরা মুজ্জাম্মিল	৩০	"
৪.	সূরা দোহা	১১	"
৫	সূরা ইনশিরাহ	৮	"
৬	সূরা ফালাক	৫	"
৭	সূরা নাস	৬	"
৮	সূরা ফাতেহা	৭	"
৯	সূরা কাফিরূন	৬	"
১০	সূরা ইখলাস	৪	"
১১	সূরা লাহাব	৫	"
১২	সূরা কাউসার	৩	"
১৩	সূরা হুমাযা	৯	"
১৪	সূরা মাউন	৭	"
১৫	সূরা তাকাসুর	৮	"

১৬	সূরা লাইল	২১	”
১৭	সূরা কলম	৫২	”
১৮	সূরা বালাদ	২০	”
১৯	সূরা ফিল	৫	”
২০	সূরা কুরাইশ	৪	”
২১	সূরা কদর	৫	”
২২	সূরা আত্‌তারেক	১৭	”
২৩	সূরা আশ্‌শামস	১৫	”
২৪	সূরা আবাসা	৪২	”
২৫	সূরা আ'লা	১৯	”
২৬	সূরা আত্‌তীন	৮	”
২৭	সূরা আসর	৩	”
২৮	সূরা বুরূজ	২২	”
২৯	সূরা কারিয়া	১১	”
৩০	সূরা যিলযাল	৮	”
৩১	সূরা ইনফিতার	১৯	”
৩২	সূরা তাকভীর	২৯	”
৩৩	সূরা ইনশিকাক	২৫	”
৩৪	সূরা আদিয়াত	১১	”
৩৫	সূরা নাজি'আত	২৪	”
৩৬	সূরা মুরসালাত	৫০	”
৩৭	সূরা নাবা	৪০	”
৩৮	সূরা গাশিয়া	২৩	”
৩৯	সূরা ফাজর	৩০	”
৪০	সূরা কিয়ামা	৪০	”
৪১	সূরা মুত্বাফফিফীন	৩৬	”
৪২	সূরা আল-হা-ককা	৫২	”
৪৩	সূরা জারিয়াত	৬০	”
৪৪	সূরা তূর	৪৯	”
৪৫	সূরা ওয়াকিয়া	৯৬	”

৪৬	সূরা নজম	৬২	”
৪৭	সূরা মা'আরিজ	৪৪	”
৪৮	সূরা আর রহমান	৭৮	”
৪৯	সূরা কমর	৫৫	”
৫০	সূরা সাফ্ফাত	১৮২	”
৫১	সূরা নূহ	২৮	”
৫২	সূরা দাহর	৩১	”
৫৩	সূরা দুখান	৫৯	”
৫৪	সূরা কাফ	৪৫	”
৫৫	সূরা তোয়াহা	১৩৫	”
৫৬	সূরা শুয়ারা	২২৭	”
৫৭	সূরা হিজর	৯৯	”
৫৮	সূরা মারইয়াম	৯৮	”
৫৯	সূরা ছোয়াদ	৮৮	”
৬০	সূরা ইয়াসীন	৮৯	”
৬১	সূরা যুখরুফ	৮৯	”
৬২	সূরা জিন	১৮	”
৬৩	সূরা মূলক	৩০	”
৬৪	সূরা মুমিনূন	১১৮	”
৬৫	সূরা আম্বিয়া	১১৩	”
৬৬	সূরা ফুরকান	৭৭	”
৬৭	সূরা বনী ইসরাঈল	১১১	”
৬৮	সূরা নমল	৯৩	”
৬৯	সূরা কাহফ	১১০	মদিনা শরীফ
৭০	সূরা সিজদা	৫৪	”
৭১	সূরা হামীম-আস সিজদা	৫৪	”
৭২	সূরা জাসিয়া	৩৭	”
৭৩	সূরা নাহল	১২৮	”
৭৪	সূরা রূম	৬০	”
৭৫	সূরা হুদ	১২৩	”

৭৬	সূরা ইবরাহীম	৫২	”
৭৭	সূরা ইউসুফ	১১১	”
৭৮	সূরা মুমিন	৮৫	”
৭৯	সূরা কাসাস	৮৮	”
৮০	সূরা যুমার	৭৫	”
৮১	সূরা আনকাবুত	৬৯	”
৮২	সূরা লোকমান	৩৪	”
৮৩	সূরা শুরা	৫৩	”
৮৪	সূরা ইউনুস	১০৯	”
৮৫	সূরা সাবা	৫৪	”
৮৬	সূরা ফাতির	৪৫	”
৮৭	সূরা আ'রাফ	২০৬	”
৮৮	সূরা আহকাফ	৩৫	”
৮৯	সূরা আন'আম	১৬৬	”
৯০	সূরা রা'দ	৪৩	”
৯১	সূরা বাকারা	২৮৬	”
৯২	সূরা বাইয়্যিনা	৮	”
৯৩	সূরা তাগাবুন	১৮	”
৯৪	সূরা জুমা	১১	”
৯৫	সূরা আনফাল	৭৫	”
৯৬	সূরা মুহাম্মদ	৩৮	”
৯৭	সূরা আলে ইমরান	২০০	”
৯৮	সূরা সফ্	১৪	”
৯৯	সূরা হাদীদ	২৯	”
১০০	সূরা নিসা	১৭৭	”
১০১	সূরা তালাক	১২	”
১০২	সূরা হাশর	২৪	”
১০৩	সূরা আহযাব	৭৩	”
১০৪	সূরা মুনাফিকুন	১১	”

১০৫	সূরা নূর	৬৪	"
১০৬	সূরা মুজাদালা	২২	"
১০৭	সূরা হজ্জ	৭৮	"
১০৮	সূরা ফাত্হ	২৯	"
১০৯	সূরা তাহরীম	১২	"
১১০	সূরা মুমতাহিনা	১৩	"
১১১	সূরা নাসর	৩	"
১১২	সূরা হুজুরাত	১৮	"
১১৩	সূরা তওবা	১২৯	"
১১৪	সূরা মায়েদা	১২০	"

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১১৪ সূরার মধ্যে ৮৬ টি সূরা মক্কী ২৮ টি সূরা মদনী ।

১. মাক্কী সূরাগুলো অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে । ভাষা জোরালো ও আবেগপূর্ণ ।
২. মাক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, ইবাদত, কুফর, শিরক, আখেরাত, বেহেশ্ত, দোজখ, সৃষ্টি কৌশল এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের বর্ণনা রয়েছে ।
৩. যে সকল সূরায় كَلَّا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী ।
৪. (হানাফী মাযহাব মতে) যে সকল সূরায় সেজদার আয়াত এসেছে সেগুলো মক্কী ।
৫. সূরা বাকারা ব্যতীত যে সকল সূরায় হযরত আদম (আ.) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী ।
৬. মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত يَاَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা সম্বোধন হয়েছে ।
৭. মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলঙ্কার বহুল এবং এগুলোতে উপমা-উৎপেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে । অধিকন্তু এ সকল সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দ সম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে ।

মদনী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. যে সকল সূরাতে ইসলামি শরিয়তের হুকুম-আহকাম বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে সেগুলো মদনী সূরা ।
২. মদনী সূরাগুলো সাধারণত দীর্ঘ ও ভাবগম্ভীর ।
৩. মদনী সূরা সালাত, জাকাত, হজ, হিবা, উশর ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ।
৪. মদনী সূরাগুলো অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক ।
৫. এ সূরাগুলোতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে ।
৬. সূরা 'আনকাবূত' ব্যতীত যে সকল সূরায় মুনাফিকদের আলোচনা বিদ্যমান সেগুলো মদনী ।
৭. মদনী সূরাসমূহে আহলে কিতাব এবং জিম্মিদের সাথে আচরণ ও সন্ধির বিধান বর্ণিত হয়েছে ।
৮. জিহাদ, গনিমত, ফাই, জিযিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যে সূরায় আলোচিত হয়েছে তা মদনী ।

পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য

১. পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে আমি আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ।

২. পবিত্র কুরআন সে গ্রন্থ, যা বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে এসেছেন, যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সর্বাধিক সম্মানিত, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র এবং সকলের নিকট সুস্পষ্ট, যাঁর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

৩. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ইনকিলাব এনেছে, মূর্খতার বদলে জ্ঞান এবং জুলুম অত্যাচারের স্থলে সুবিচার কায়েম করার মহান শিক্ষা পেশ করেছে।

৪. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা সকল সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং যাবতীয় মন্দ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৫. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে বিশ্ববাসীকে তার মোকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে। কিন্তু কুরআনের একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতেও বিশ্ববাসী সক্ষম হয়নি।

৬. পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা ভাষার অলংকারে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, শব্দ চয়নে, এককথায় সব ব্যাপারেই অনন্য-সাধারণ, অদ্বিতীয়, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যায় না।

৭. পবিত্র কুরআন একমাত্র কিতাব, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, যুগের আবর্তন-বিবর্তন তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারেনি, এমনকি একটি যের যবরেরও পরিবর্তন হয়নি।

৮. পবিত্র কুরআন এমনি এক গ্রন্থ, যার পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

৯. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা সর্বদা এবং সর্বত্র পাঠ করা হয়, সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক লোক পাঠ করে থাকে।

১০. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ সকল যুগে মুখস্থ করে রাখে, এতদ্ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থ এভাবে হেফজ করা হয় না।

১১. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ যার অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা তাফসির পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত ভাষায় করা হয়েছে।

১২. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা বারে বারে পাঠ করলেও কোনো দিন পুরাতন মনে হয় না।

১৩. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার তাফসীরে সকল যুগের ওলামায়ে কেরাম আজীবন সাধনা করেছেন।

১৪. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মধ্যে গবেষণা করে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ লক্ষ লক্ষ মাসআলা প্রমাণ করেছেন। শুধু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) পবিত্র কুরআন থেকে ১৩ লক্ষ মাসআলা বের করেছেন। একবার ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর শিষ্য ইমাম আহমদ (র.)-এর মেহমান ছিলেন, তাঁর শয়নকক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজের অজুর জন্য পানি রাখা হয়েছিল, ফজরের নামাজের সময় দেখা গেল যথাস্থানে অজুর পানি রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন না, এ কথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। ইমাম আহমদ (র.) তাঁর উস্তাদের মেজাজ পুরসী করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর রাতে কি আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল? তিনি বললেন, "না, তবে শয়নকালে পবিত্র কুরআনের একখানি আয়াত মনে হয়েছিল, তা বারবার পাঠ করছিলাম এবং আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। এরই মধ্যে ফজেরর আজান শ্রবণ করলাম, অবশ্য এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক একশত একটি মাসআলা প্রমাণ করার তৌফিক দান করেছেন।" মূলতঃ এটি শুধু আল্লাহ পাকের কালামেরই বৈশিষ্ট্য।

১৫. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বিধি-নিষেধের উপর সর্বদা সর্বত্র আমল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমল করা হবে।

১৬. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

১৭. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মহান শিক্ষা মানুষের স্বভাব মোতাবেক এবং যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবের অগ্নিপরীক্ষায় শতবার পরীক্ষিত।

১৮. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা দ্বারা একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন সাধারণ মানুষ উভয়ই উপকৃত হতে পারেন।

১৯. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যাতে রয়েছে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন তথা অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান, সমাজ জীনের দায়িত্ব ও অধিকার, ইবাদত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, আকিদা-বিশ্বাস এক কথায় মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআনে রয়েছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল নিয়ম-কানুন এক কথায় মানব জীবনের চরম সাফল্য এবং চিরশান্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে পবিত্র কুরআন।
২০. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা নারী সমাজে অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করেছে
২১. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা ক্রীতদাসের মুক্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে।
২২. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার প্রশংসায় অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরাও পঞ্চমুখ।
২৩. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরস্পরের পরামর্শের বিধান কায়েম করেছে।
২৪. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য বর্ণনাতীত এমনকি কল্পনাতীত, এর সবই অলৌকিক, সবই বিস্ময়কর, সবই অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন– পৃ. ৮৭-৮৯]

কুরআন সম্পর্কীয় কতিপয় সন ও তারিখ

১. হিজরি ১০ সনে আরজায়ে আখির অর্থাৎ শেষ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। যাতে সূরার ধারাবাহিকতা আয়াত বিন্যাস এবং লুগাতে কুরাইশ নির্ধারণের কাজ সুস্পষ্টভাবে সুসম্পন্ন করা হয়।
২. হিজরি ১০ সনে সফর মাসে কুরআন অবতরণ সমাপ্ত করা হয়।
৩. হিজরি ১২ সনে সিদ্দিকী যোগে সর্বসুধিজন স্বীকৃত পূর্ণ কপি প্রস্তুত হয়।
৪. হিজরি ১৫ সনে ফারুকী আমলে তারাবীর নামাজে বিরাট জামাতে পূর্ণ কুরআন খতমের সুন্নতের প্রচলন হয়।
৫. হিজরি ২০ সনের উসমানী যুগে সর্ব সম্মতিক্রমে ৬ষ্ঠ লুগাত রহিত এবং কুরাইশী লুগাত বহাল রাখা হয় এবং ঐ বৎসরেই কুরাইশী লুগাতে কুরআনের আসমানি অনুলিপি প্রস্তুত হয়।
৬. হিজরি ৭৫ সনে সহজে বুঝার জন্য পুরা কুরআনে কারীমকে ৩০ পারা এবং প্রত্যেক পারা ثلث، نصف، ربع অংশের চিহ্নিত করা হয়।
৭. হিজরি ৭৫ সনে তৎকালীন ইরাকী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আজমী বা অনারবী মুসলমানদেরকে পড়ার সুবিধার্থে কয়েকজন বুযুর্গের সাহায্যে কুরআনে কারীমের মধ্যে হরকত এবং নুকতার ব্যবস্থ করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তরজমা

কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা বহু ভাষায় তরজমা করা হয়। এতেই কুরআনের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। সর্ব প্রথম ১১৪৬ সালে লেটিন, ভাষায় কুরআনের তরজমা করা হয় তার পরবর্তীতে জার্মান, গ্রীক, পেলিস, ইটালিয়া, ইস্পেলিস, বেনজারী, ফ্রোজো, পরতুগিজ, সার্ভিয়া, হলাণ্ড, ইন্দোচীন, ডেনমার্ক, রোমানিস, আর্মেনিয়, অষ্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়, জাপানী, বহেলী, চীনা, সুইডিস, আফগানী, পাবী, তামীল, সিন্দি, গুজরাটী, জাভা, পস্তু, তুর্কি, হিন্দী, বার্মিজ, তেলেগু, মারহাটি, পূর্ব আফ্রিকা, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করা হয়।

কুরআনে উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম

১. হযরত আদম (আ.) ২. হযরত নূহ (আ.) ৩.হযরত ইদরীস (আ.) ৪. হযরত হূদ (আ.) ৫. হযরত সালেহ (আ.) ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত ইসহাক (আ.) ৯. হযরত লূত (আ.) ১০. হযরত ইয়াকূব (আ.) ১১. হযরত ইউসুফ (আ.) ১২. হযরত মূসা (আ.) ১৩. হযরত হারূন (আ.) ১৪. হযরত শুআইব ১৫. হযরত ইউনুস (আ.) ১৬. হযরত ইলিয়াস (আ.) ১৭. হযরত আলইয়াসা (আ.) ১৮. হযরত যুলফিকল (আ.) ১৯. হযরত দাউদ (আ.) ২০. হযরত সুলাইমান (আ.) ২১. হযরত আইউব (আ.) ২২. হযরত ইয়াহইয়াহ (আ.) ২৩. হযরত জাকারিয়া (আ.) ২৪. হযরত উযাইর (আ.) ২৫. হযরত ঈসা (আ.) ২৬ হযরত মুহাম্মদ ﷺ। কুরআনে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর নাম, তার নাম কুরআনের মধ্যে ১৩৫ বার এসেছে আর মুহাম্মদ (সা.) শব্দটি ৪ বার এসেছে আর আহমদ শব্দটি ১ বার এসেছে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অনুবাদ : 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

শাব্দিক অনুবাদ : اَعُوْذُ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট مِنَ হতে الشَّيْطَانِ শয়তান الرَّجِيْمِ অভিশপ্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন, তখন তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, আপনি পাঠ করুন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অতঃপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে বলেন।

তখন রাসূল ﷺ প্রথমে আ'উযুবিল্লাহ ও পরে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করেন। অতঃপর اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الخ অবতীর্ণ হয়।

تَعَوُّذْ -এর নামকরণ : تَعَوُّذْ অর্থাৎ আ'উযুবিল্লাহ বাক্যটি কুরআন পকের অংশ নয়; বরং এটি একটি কুরআন পাকের নির্দেশিত বাণী। تَعَوُّذْ পাঠের দ্বারা অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট, ক্ষতি ও প্ররোচনা হতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। তাই এ পবিত্র বাক্যটি تَعَوُّذْ অর্থাৎ, আশ্রয় প্রার্থনা বাক্য নামে অভিহিত।

تَعَوُّذْ পাঠের নিয়ম : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ যখন কুরআন পাঠ করো, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত কুরআন পাঠের প্রাক্কালে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা সুন্নত। এ পাঠ চাই নামাজের মাধ্যেই হোক বা নামাজের বাইরেই হোক। কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ নয়। যখন কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ'উযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অন্য সূরা আরম্ভ করতে (সূরা তাওবা ব্যতীত) শুধু বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াতকালে সূরা তাওবা মাঝখানে আসলে তখন বিস্‌মিল্লাহ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা তওবা দ্বারা আরম্ভ করতে হয়, তাহলে আ'উযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়টি পাঠ করতে হবে। তেলাওয়াতের মাঝখানে যদি কোনো কারণবশত বিরতি দিতে হয়, তাহলে পুনঃ আরম্ভ করতে হলে 'আউযুবিল্লাহ পাঠ করা জরুরি।

اَللّٰهُ শব্দের বিশ্লেষণ : اَللّٰهُ শব্দটি মহান আল্লাহর জাতিবাচক নাম এবং ইসমে আযম। এ পবিত্রতম নামটি বচনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত। জগতের কোনো ভাষায়, শব্দে অথবা প্রতিশব্দে এর অনুবাদও হতে পারে না। اَللّٰهُ বলতে অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা। এ নামে অন্য কোনো কিছুকে আখ্যা দেওয়া হয়নি এবং হবেও না।

আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকদের মতে اَللّٰهُ শব্দটি اَلْاِلٰهُ শব্দ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। এটি একটি গুণবাচক শব্দ। ইসলামের পূর্বে এ শব্দ দ্বারা প্রকৃত ও কল্পিত উভয়বিধ উপাস্যকে বুঝানো হতো। পরে শরিয়তে اَللّٰهُ শব্দটিকে প্রকৃত ও একক উপাস্য বিশ্ব স্রষ্টার জন্যই নির্ধারিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসমে জাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতই নির্ভরশীল ও গ্রহণীয়।

اَلشَّيْطَانِ **শব্দের বিশ্লেষণ :** شَيْطَانٌ শব্দটি شَيْطٌ বা شَطْنٌ মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে দূরীভূত, বিতাড়িত ও পথভ্রষ্ট। এ জন্য সরল, সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্নকারী প্রত্যেক জীবকে 'শয়তান' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

رَجِيْم **শব্দের বিশ্লেষণ :** رَجِيْم শব্দটি رَجْمٌ ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে অভিশপ্ত, দূরীভূত, বিতাড়িত। যেহেতু শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত হতে ফেরেশ্‌তাদের দ্বারা নক্ষত্রের ঢিলে বিতাড়িত হয়েছিল তাই তাকে اَلشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বা বিতাড়িত শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ শব্দমূল (ع ـ و ـ ذ) জিনসে اجوف واوى অর্থ– আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَجِيْمٌ : এ শব্দটি فَعِيْلٌ এর ওজনে اِسْم فَاعِل مُبَالَغَة-এর সীগাহ। অর্থ– অত্যধিক অভিশপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ : اَعُوْذُ ফে'ল, এতে اَنَا যমীর ফায়েল, بَاء শব্দটি হরফে জার, اللّٰهِ শব্দটি মাজরূর/ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। مِنَ হরফে জার الشَّيْطَانِ মাওসূফ, الرَّجِيْمِ সিফাত; মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ গঠিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সরল অনুবাদ : পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) الرَّحْمٰنِ (যিনি) পরম করুণাময় الرَّحِيْمِ অতি দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **-এর বিশ্লেষণ :** সকল মুসলমান এতে একমত যে, এ আয়াতটি কুরআনে কারীমের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ। আর এতেও একমত যে, সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয়। এটি কি সূরা ফাতিহার অংশ না সকল সূরারই অংশ তা নিয়ে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নামল ব্যতীত অন্য কোনো সূরার অংশ নয়। তবে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত, যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লিখা হয়েছে (সূরা তাওবা ব্যতীত) এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতকে تَسْمِيَة বলা হয়। এর মর্মার্থ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। যেহেতু কোনো কাজের শুরুতে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণের উদ্দেশ্যে এটি পঠিত হয় তাই একে তাসমিয়া বলা হয়।

এ কল্যাণময় বাক্যে আল্লাহ তা'আলার তিনটি মহিমান্বিত নামের সমাবেশ ঘটেছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহ্, রাহমান ও রাহীম। এ আয়াতটির মধ্যে একটি ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। ক্রিয়া পদটি উহ্য থাকার তাৎপর্য হচ্ছে যে, মুসলমানের যাবতীয় শুভ কাজের সূচনা এ কল্যাণময় বাক্য দ্বারা করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ **এর ব্যাখ্যা :** ভাষার নিয়ম অনুযায়ী بِسْمِ اللّٰهِ-এর بَاء বর্ণটি আল্লাহর নামের পূর্বে اِسْم শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, بَاء বর্ণটি আলিফের সঙ্গে মিলিয়ে এবং اِسْم শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো بِاسْمِ اللّٰهِ কিন্তু মাসহাফে উসমানীর লিখন পদ্ধতিতে 'হামযাহ; বর্ণটি উহ্য রেখে بَاء বর্ণটিকে سِيْن-এর সাথে যুক্ত করে লিখে بَاء কে اِسْم-এর অংশ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে অর্থ হয় আল্লাহর নামে আরম্ভ। একই কারণে অন্যত্র الف-কে উহ্য রাখা হয়নি, যেমন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ এতে الف-কে- بَاء-এর সাথে লিখা হয়েছে। মোটকথা, বিস্‌মিল্লাহর বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই بَاء বর্ণকে-اِسْم-এর সঙ্গে মিলিত করে লিখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণ :** رَحْمٰن শব্দটি فَعْلَانْ-এর ওযনে এবং رَحِيْم শব্দটি فَعِيْل-এর ওযনে رَحْمٌ মাসদার হতে নির্গত। رَحْمٰن-এর অর্থে এমন আধিক্য বিদ্যমান, যা رَحِيْم শব্দে নেই।

ইবনুল হিসারসহ অনেক ভাষাবিদের মতে الرَّحْمٰنِ শব্দটি اَلرَّحْمَةُ হতে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ এমন দয়াপরায়ণ সত্তা যার দয়ার কোনো তুলনা নেই।

رَحْمٰن ও رَحِيْم উভয়টি মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম। রাহমান অর্থ– সাধারণ ও ব্যাপক রহমতের অধিকারী এবং রাহীম অর্থ– পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমতের অধিকারী। رَحْمٰن শব্দটি আল্লাহ তা'আলার 'যাতের' সাথে নির্দিষ্ট, তাই কোনো সৃষ্টিকে রাহমান বলা যায় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমগ্র বিশ্বচরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। তাই আল্লাহ শব্দের ন্যায় রাহমান শব্দেরও বচনভেদ হয় না। কেননা শব্দটি একক সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। –[কুরতুবী]

اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ শব্দদ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তিনভাবে হতে পারে। যথা–

১. اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ উভয় শব্দই পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ এই পৃথিবীতে মুসলিম, কাফের, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, সে হিসেবে তিনি اَلرَّحْمٰنِ আবার এ পৃথিবীতে তিনি মুসলমানদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাই তিনি রাহীম।

২. اَلرَّحْمٰنِ দ্বারা মহান আল্লাহ যে ইহ ও পরজগতে রহমত বর্ষণকারী তা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে اَلرَّحِيْمِ দ্বারা তিনি যে বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি পরকালীন রহমত বর্ষণকারী সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. اَلرَّحْمٰنِ দ্বারা শুধু পরকালীন রহমত এবং اَلرَّحِيْمِ দ্বারা ইহকালীন রহমতকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থ অনুযায়ী اَلرَّحْمٰنِ শব্দের অর্থে আধিক্য বিদ্যমান। কারণ পরকালীন নিয়ামতের তুলনায় ইহকালীন নিয়ামত অতি তুচ্ছ। –[কাশশাফ]

اَلرَّحْمٰنِ কে اَلرَّحِيْمِ-এর পূর্বে নেওয়ার কারণ : اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ উভয় শব্দই আধিক্যের অর্থপ্রকাশক এবং স্থায়ী গুণবাচক শব্দ। اَلرَّحْمٰنِ কে اَلرَّحِيْمِ-এর পূর্বে আনার কারণ হলো–

(ক) اَلرَّحْمٰنِ দ্বারা মহান আল্লাহ যে, এ পৃথিবীতে মু'মিন, কাফের নির্বিশেষে সকল সৃষ্টজীবের প্রতি রহমত বর্ষণকারী তা বুঝানো হয়েছে। আর اَلرَّحِيْمِ দ্বারা তিনি যে পরকালে মু'মিনদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর নিয়ামত ও রহমত আখেরাতের পূর্বে বিধায় اَلرَّحْمٰنِ-কে পূর্বে আনা হয়েছে।

(খ) اَللّٰهِ শব্দটি যেমন মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না তেমনি اَلرَّحْمٰنِ শব্দটিও অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এ দিক দিয়ে শব্দ দু'টির মাঝে মিল রয়েছে। তাই এ শব্দ দু'টিকে পাশাপাশি উল্লেখপূর্বক اَلرَّحِيْمِ-কে পরে নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক বৈধ কাজে বিসমিল্লাহ বলার রহস্য

জাহিলিযুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীর নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিব্রাঈল (আ.) পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী নিয়ে এসেছেন তাতে ইরশাদ হয়েছে– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে। অতঃপর বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামে সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহ বলে যাবতীয় বৈধ কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করার মাধ্যমে আল্লাহমুখী হয়ে উঠে। বারবার আল্লাহর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের স্বীকারোক্তির নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম এক আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ব্যতীত সম্পাদিত হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া ও চাকরি-ব্যবসাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজ-কর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করতে যেমন সময়ের কোনো অপচয় ঘটে না তেমনি কষ্টও হয় না; বরং এতে তার প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয় এবং সে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়।

বিসমিল্লাহর ফজিলত

হাদীস শরীফে এসেছে– যেসব ভালোকাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা হয়নি তা লেজকাটা অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন– যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত শুরু করা হয়, তাতে কোনো বরকত থাকে না। তাফসীরকারগণ বলেন, বিসমিল্লাহর মধ্যে ১৯ টি হরফ রয়েছে, জাহান্নামের ফেরেশ্‌তাও ঊনিশ জন। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়বে, তার জন্য এর বরকতে এক এক ফেরেশতা দূরে সরে যাবে। যদি মা-বাবা কবরে আজাবে নিপতিত থাকে আর সন্তান মক্তবে বিসমিল্লাহ পড়ে, তখন মা-বাবার আজাব হালকা হয়ে যায়। বিসমিল্লাহ ছাড়া জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা হালাল হয় না।

বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান : বিসমিল্লাহ যেহেতু কুরআন কারীমের একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত, তাই এর বিধান পবিত্র কুরআনের অনুরূপ। অন্যান্য আয়াতের মতো এ আয়াতটিরও সম্মান করা ওয়াজিব। অজু ছাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েজ নয়। গোসল ফরজ হয় এরূপ অপবিত্র অবস্থায় তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও নাজায়েজ। তবে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে দোয়া রূপে পাঠ করা সর্বাবস্থায় জায়েজ ও ছওয়াবের কাজ।

বাক্য-বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : بَاء হরফে জার, اِسْمِ টি মুযাফ, اللّٰهِ মাওসূফ, الرَّحْمٰنِ এবং الرَّحِيْمِ উভয়টি সিফাত, মাওসূফ ও উভয় সিফাত মিলে মোযাফ ইলাইহ, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর; জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হলো أَبْتَدِئُ উহ্য ফে'ল -এর, أَبْتَدِئُ ফে'ল তাতে أَنَا যমীর ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হলো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই উপযোগী- যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١)
(২) যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢)
(৩) যিনি প্রতিফল-দিবসের [কিয়ামত-দিবসের] মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣)
(৪) আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤)
(৫) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥)
(৬) ঐ লোকদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦)
(৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে, আর না তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১.) اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলারই উপযোগী رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক

(২) الرَّحْمٰنِ যিনি পরম করুণাময় الرَّحِيْمِ অতি দয়ালু।

(৩) مٰلِكِ যিনি মালিক يَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসের।

(৪) اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা আপনারই ইবাদত করছি وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

(৫) اِهْدِنَا আমাদেরকে প্রদর্শন করুন الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সরল পথ।

(৬) صِرَاطَ الَّذِيْنَ ঐ লোকদের পথ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

(৭) غَيْرِ তাদের পথ নয় الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে وَلَا আর না তাদের পথ الضَّآلِّيْنَ যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম স্থান লাভ করেছে। এটি কেবল সংকলনগত বিন্যাসই নয়; বরং নাজিল হওয়ার দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এ সূরাটিই প্রথম।

নামকরণ : ফাতিহা শব্দের অর্থ হচ্ছে– আরম্ভিকা, অবতরণিকা, উদ্বোধনী, উপক্রমণিকা ইত্যাদি। বাংলায় একে ভূমিকা বা মুখবন্ধ বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটিকে فَاتِحَةُ الْكِتَابِ বা 'গ্রন্থের সূচনা' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রসঙ্গ : রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর এ সূরাটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে সূরাটির অধিক গুরুত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

এ সূরার অন্যান্য নামসমূহ : উপরিউক্ত নামটি ছাড়াও হাদীসে এ সূরাকে আরো কতিপয় তাৎপর্যবহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন–

২. উম্মুল কুরআন (কুরআনের উৎস)।
৩. উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। কেননা পূর্ণাঙ্গ কুরআন এ সূরাটির স্থুল বিষয়সমূহের বিস্তৃত বিবরণ।
৪. আল-কান্য (সর্বজ্ঞানাধার)। কেননা এতে সূক্ষ্মভাবে যাবতীয় জ্ঞানের প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
৫. আল-কাফিয়া (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। কেননা এতে রীতি-নীতি থেকে কর্ম-নীতি পর্যন্ত সব কিছুর জন্য সংক্ষেপিত দিক নির্দেশনা রয়েছে।
৬. আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। কেননা এতে কুরআনের মৌলিক বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।
৭. আসসাব'উল-মাছানী (নিত্যপাঠ্য বাণী সপ্তক)। কেননা নামাজে এ সূরাটি পুনঃ পুনঃ পঠিত হয়ে থাকে।
৮. সূরাতুল হামদ (প্রশংসাসূচক সূরা)। কেননা এ সূরাটির সূচনা আল-হামদু দ্বারা করা হয়েছে।
৯. সূরাতুস সালাত (নামাজের সূরা)। কেননা এ সূরাটি ছাড়া নামাজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না।
১০. আদইয়াউল মাসআলা (যাচনার সূরা)। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি বান্দার বিনয় প্রকাশ ও জীবনের মুখ্য বিষয়ের প্রার্থনা রয়েছে।
১১. সূরাতুশ-শিফা (রোগমুক্তির সূরা)। কেননা মর্মার্থসহ এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে মানসিক ও দৈহিক রোগমুক্তি লাভ হয়।
১২. সূরাতুল ওয়াফিয়া (পূর্ণাঙ্গ সূরা); কেননা এ সূরাটি স্থুলভাবে জীবনের সর্ববিষয়ের ধারক ও বাহক।
১৩. সূরাতুল মুনাজাত (প্রার্থনার সূরা); কেননা এ সূরাটিতে আল্লাহর সমীপে প্রয়োজনীয় প্রার্থনার বচন রয়েছে।
১৪. সূরাতুল তাফবীয (আত্মসমর্পণের সূরা); কেননা এ সূরার মর্মকথা হলো, নিজেকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করা।
১৫. সূরাতুর রুকইয়া (রক্ষা কবচমূলক সূরা); কারণ এতে মানসিক ক্লেদ মুক্তি ও দৈহিক জ্বরা মুক্তির গুণাবলি রয়েছে।
১৬. সূরাতুশ-শুকর; কেননা এ সূরাটি দ্বারা আল্লাহর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।
১৭. সূরাতুন নূর; কেননা এ সূরাটি মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

সূরার বিষয়বস্তু : মূলত এ সূরা একটি প্রার্থনার পদ্ধতি মাত্র। এ সূরার প্রথমার্ধে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর বিশেষ গুণগান প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি অনুগত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা এ প্রার্থনা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ সূরার প্রারম্ভে রয়েছে সর্বগুণাধার আল্লাহ নামের মহত্ত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর বন্দনা। অতঃপর ইহলোক ও পরলোকে তাঁর অন্যতম গুণবত্তার স্বীকৃতি। তৎপর তাঁর সাথে পরম আত্মীয়তার সূত্রে তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি ও সর্ববিষয়ে তাঁর সাহায্যের প্রার্থনা। অতঃপর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মহামনীষীদের অনুসৃত সরল পথ প্রাপ্তির আবেদন এবং পরিশেষে অভিশপ্ত জাতিগুলোর বিকৃত পথ হতে রক্ষা করার আকুল মিনতি। মূলত এগুলোই কুরআনের সারবস্তু।

এ সূরায় প্রার্থনা করা হয়– হে আল্লাহ! আমরা সর্ববিষয়ে একমাত্র আপনার দাসত্ব স্বীকার করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের অনুসৃত সত্য ও সঠিক পথ দেখান এবং অভিশপ্ত জাতির বিকৃত পথ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন মানুষের সম্মুখে জীবনবিধান রূপে পেশ করে পরবর্তী সূরার শুরুতেই "এ কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, এটা সত্য অনুসন্ধানকারীদের জন্য একমাত্র জীবন-বিধান" একথা বলে দেওয়া হয়েছে।

সূরার মাহাত্ম্য : রাসূল ﷺ বলেন, এ সূরার তুল্য তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে কোনো সূরা নেই। কুরআন মাজীদ সব স্বর্গীয় গ্রন্থের মূল, আর সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের মূল। যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করল সে যেন সমগ্র তাওরাত, যাবূর

যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই যে অনন্ত অসীম শক্তির। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তা ছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। কুরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপর দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতি বাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে।

حَمْد এবং شُكْر ও مَدْح -এর মধ্যে পার্থক্য: حَمْد এবং مَدْح -এর মধ্যে আম ও খাস মুতলাকের সম্পর্ক। হাম্‌দ হলো খাস আর মাদ্‌হ হলো আম। হাম্‌দ হলো কারো স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তার পক্ষ থেকে সেটা কোনো নিয়ামত হোক বা অন্য কিছু হোক। আর মাদ্‌হ বলা হয় সাধারণত কারো কোনো উত্তম বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তা ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত হোক বা খোদা-প্রদত্ত হোক। অতএব, حَمِدْتُ خَالِدًا عَلٰى خُطْبَتِهٖ বলা বৈধ। কিন্তু حَمِدْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ নয়। কেননা خُطْبَة (বক্তৃতাদান) স্বেচ্ছাকৃত বিষয় আর طُوْل (লম্বা হওয়া) স্বেচ্ছাকৃত নয়। তবে مَدَحْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ; شُكْر অর্থ হচ্ছে, কারো অনুগ্রহের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা সম্মান প্রদর্শন করা চাই তা বক্তব্যের মাধ্যমে হোক বা কর্মের মাধ্যমে হোক, অথবা বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক।

আল্লামা যামাখশারীর মতে مَدْح এবং حَمْد -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই সমার্থক শব্দ। حَمْد এবং مَدْح -এর বিপরীত ذَمّ আর شُكْر -এর বিপরীতে كُفْر ব্যবহৃত হয়।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : رب শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– প্রতিপালক। প্রতিপালন বলতে কোনো বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়াকে বুঝায়। এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তবে সম্বন্ধ পদরূপে অন্যের জন্যও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি اَلْعَالَمُ শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা–আকাশ-বাতাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, ফেরেশ্‌তাকুল, জিন, জমিন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক! সৃষ্টিকুলের মধ্যে যা কিছু আমাদের সৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না, সে সবগুলোই এক একটা আলম। তা ছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা দেখতে পাই না। সে জগতের সংখ্যা কেউ বলে চল্লিশ হাজার, আবার কেউ বলে আশি হাজার। এ ছোট বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্তনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ সকল জগতের ব্যবস্থাপনার অতি প্রাজ্ঞ পরিচালক একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা।

اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ -এর মধ্যকার পার্থক্য : اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ শব্দ দু'টি رَحْمٌ ধাতু হতে নির্গত। রাহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না এবং এর স্ত্রীলিঙ্গও হয় না। বাংলা ভাষায়-এর অর্থ হয় দয়াময়। রাহীম শব্দের অর্থ–বিশেষ দয়ালু। আল্লাহর দয়া দু' প্রকার। এক প্রকার দয়া যা সকলে পাচ্ছে বা ভোগ করছে। এ দয়া হতে কাফের, নাস্তিক, অন্যান্য কাউকেই বঞ্চিত করা হয় না। এ প্রকারের দয়া চিরস্থায়ী থাকে না। শুধু ইহজগতের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের দয়া আল্লাহর খাস দয়া, যা ইহলোকে ও পরলোকে চিরস্থায়ী হবে। এ প্রকারের দয়া শুধু তারাই পাবে যারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মানবে, তারাই হলো মুসলিম। এরাই পরলোকে মুক্তি পাবে, জান্নাত লাভ করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য দয়ালু, অনুগ্রহদাতা, বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি পরম দয়াশীল, অনুগ্রহশীল ও স্থায়ী নিয়ামতদাতা।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর অর্থ : এর আভিধানিক অর্থ 'প্রতিদান দিবসের স্বত্বাধিকারী, একচ্ছত্র অধিপতি'। সাধারণ ব্যবহারে 'ইয়াওম' বলে এক সূর্যোদয় হতে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে। আবার আরবি ভাষায় ইয়াওম শব্দটি সাধারণ সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার সুবিশাল সময়কেও ইয়াওম বলা হয়। এখানে সুদীর্ঘ সময় অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই যে অনন্ত অসীম শক্তির। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তা ছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। কুরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপর দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতি বাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে।

حَمْد এবং شُكْر ও مَدْح -এর মধ্যে পার্থক্য: حَمْد এবং مَدْح -এর মধ্যে আম ও খাস মুতলাকের সম্পর্ক। হাম্‌দ হলো খাস আর মাদ্‌হ হলো আম। হাম্‌দ হলো কারো স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তার পক্ষ থেকে সেটা কোনো নিয়ামত হোক বা অন্য কিছু হোক। আর মাদ্‌হ বলা হয় সাধারণত কারো কোনো উত্তম বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তা ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত হোক বা খোদা-প্রদত্ত হোক। অতএব, حَمِدْتُ خَالِدًا عَلٰى خُطْبَتِهٖ বলা বৈধ। কিন্তু حَمِدْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ নয়। কেননা خُطْبَة (বক্তৃতাদান) স্বেচ্ছাকৃত বিষয় আর طُوْل (লম্বা হওয়া) স্বেচ্ছাকৃত নয়। তবে مَدَحْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ; شُكْر অর্থ হচ্ছে, কারো অনুগ্রহের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা সম্মান প্রদর্শন করা চাই তা বক্তব্যের মাধ্যমে হোক বা কর্মের মাধ্যমে হোক, অথবা বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক।

আল্লামা যামাখশারীর মতে مَدْح এবং حَمْد -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই সমার্থক শব্দ। حَمْد এবং مَدْح -এর বিপরীত ذَمّ আর شُكْر -এর বিপরীতে كُفْر ব্যবহৃত হয়।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : رب শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– প্রতিপালক। প্রতিপালন বলতে কোনো বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়াকে বুঝায়। এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তবে সম্বন্ধ পদরূপে অন্যের জন্যও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি اَلْعَالَمُ শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা–আকাশ-বাতাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, ফেরেশ্‌তাকুল, জিন, জমিন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক! সৃষ্টিকুলের মধ্যে যা কিছু আমাদের সৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না, সে সবগুলোই এক একটা আলম। তা ছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা দেখতে পাই না। সে জগতের সংখ্যা কেউ বলে চল্লিশ হাজার, আবার কেউ বলে আশি হাজার। এ ছোট বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্তনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ সকল জগতের ব্যবস্থাপনার অতি প্রাজ্ঞ পরিচালক একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা।

اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ -এর মধ্যকার পার্থক্য : اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ শব্দ দু'টি رَحْمٌ ধাতু হতে নির্গত। রাহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না এবং এর স্ত্রীলিঙ্গও হয় না। বাংলা ভাষায়-এর অর্থ হয় দয়াময়। রাহীম শব্দের অর্থ–বিশেষ দয়ালু। আল্লাহর দয়া দু' প্রকার। এক প্রকার দয়া যা সকলে পাচ্ছে বা ভোগ করছে। এ দয়া হতে কাফের, নাস্তিক, অন্যান্য কাউকেই বঞ্চিত করা হয় না। এ প্রকারের দয়া চিরস্থায়ী থাকে না। শুধু ইহজগতের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের দয়া আল্লাহর খাস দয়া, যা ইহলোকে ও পরলোকে চিরস্থায়ী হবে। এ প্রকারের দয়া শুধু তারাই পাবে যারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মানবে, তারাই হলো মুসলিম। এরাই পরলোকে মুক্তি পাবে, জান্নাত লাভ করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য দয়ালু, অনুগ্রহদাতা, বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি পরম দয়াশীল, অনুগ্রহশীল ও স্থায়ী নিয়ামতদাতা।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর অর্থ : এর আভিধানিক অর্থ 'প্রতিদান দিবসের স্বত্বাধিকারী, একচ্ছত্র অধিপতি'। সাধারণ ব্যবহারে 'ইয়াওম' বলে এক সূর্যোদয় হতে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে। আবার আরবি ভাষায় ইয়াওম শব্দটি সাধারণ সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার সুবিশাল সময়কেও ইয়াওম বলা হয়। এখানে সুদীর্ঘ সময় অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারণ কর্মফলের সময়টা দ্বিতীয়বার উত্থান-বিষাণে ফুঁক দেওয়ার সময় হতে আরম্ভ করে মানব সৃষ্টির আদি হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সমস্ত লোকের হিসাব হয়ে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করার হুকুম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

مَالِكِ এবং مَلِكِ-এর মধ্যকার পার্থক্য : এ শব্দটি মীমের পরে আলিফ এবং আলিফ ছাড়া উভয়ভাবেই পড়া যায়। মক্কা ও মদীনার লোকেরা আলিফ ছাড়া পড়েন। আবার অনেকের মতে আলিফ দিয়ে পড়া উত্তম। اَلْمَلِكُ বলতে বুঝায়, اَلَّذِى يُدَبِّرُ اَعْمَالَ رَعِيَّتِهِ الْعَامَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রজা-সাধারণের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, অথচ তাদের ব্যক্তিগত বিশেষ কাজ ও ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। কিন্তু মালিক (مَالِكِ) সর্ববিষয়ের নিয়ন্তা। এতে একটি অক্ষর বেশি হওয়াতে এর অর্থ অধিকতর ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়েছে।

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা : প্রথমতঃ প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, তদরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে, সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, প্রতিদান দিবস সে দিনই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা ভালো মন্দ সকল কাজকর্মের প্রতিদান দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়া ভালো মন্দ কাজ কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং এটি হলো কর্মস্থল; কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারো অর্থ সম্পদের আধিক্য ও সুখ শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাউকে বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহর অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোনো কোনো লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এ জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদে পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আউলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নির্দর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কোনো কোনো কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সে কাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ : বাক্যটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ প্রকাশ্যে, গোপনে জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়; গোপনীয় দিকের উপর নয়। জীবিতের উপর বর্তায়, মৃতের উপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য কি? কুরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এত একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এ কথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যেদিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাওয়ার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিনা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

সূরা ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তাফসীরে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

اَلدِّيْنِ -এর অর্থ : সাধারণ ব্যবহারে দীন অর্থ– ধর্ম, কর্মফল, আইন ইত্যাদি। এখানে কর্মফল অর্থটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– আল্লাহ তা'আলা কর্মফল দিবস তথা বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ শুধু রাহমান-রাহীমই নন, অনুগ্রহকারী আর মেহেরবানই নন, সুবিচারকও বটে। তিনি এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিচারক ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে, সেদিন তাঁর অনুমতি ব্যতীত আর কারো একটি বাক্যও উচ্চারণ করার ক্ষমতা থাকবে না, এটাই হবে শেষ বিচার দিবস। ঐ দিনের ফয়সালাই বেহেশত বা দোজখের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ উক্তিতে মাফঊলকে ফে'লের পূর্বে নেওয়ার কারণ: এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ উক্তি দু'টোতে اِيَّاكَ মাফঊলকে ফে'ল-এর উপর مُقَدَّمْ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো ফে'লকে পূর্বে উল্লেখ করা এবং মাফঊল পরে আনা। এরূপ করা হয় اِخْتِصَاصْ -এর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, ফে'লটিকে ঐ মাফঊলের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। অতএব অর্থ দাঁড়ায়– হে আল্লাহ! "আমরা তোমারই জন্য ইবাদত করি (ইবাদত একমাত্র তোমারই জন্য খাস)। আর তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাই না।

اَلْعِبَادَةُ -এর অর্থ : اَلْعِبَادَةُ (ইবাদত) শব্দটি عَبْدٌ -এর ক্রিয়ামূল। আবদ বলা হয় দাস ও বান্দাকে। এটারই ক্রিয়ামূল হলো ইবাদত অর্থাৎ বন্দেগি বা দাসত্ব করা। কথাটির মর্ম নিম্নরূপ–

১. যে বন্দেগী স্বীকার করে সে বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা।
২. সৃষ্টির মূলে এমন এক নেতা আছেন যাঁর বন্দেগি করা অপরিহার্য।
৩. যাঁর বন্দেগী করা হবে, তাঁর তরফ হতে নিয়ম ও আইন-বিধান নাজিল হলে যে ব্যক্তি বন্দেগি করবে সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিতে হবে।
৪. কাউকে মা'বূদ বলে স্বীকার করা এবং তাঁর দেওয়া আইন-কানুন পালন করে চলার একটি অনিবার্য ফলাফল রয়েছে, যে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগির কাজ করা হবে।

عِبَادَةٌ শব্দ থেকেই عُبُوْدِيَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ দাসত্বের স্বীকৃতি তথা অধীনতা স্বীকার করা, সর্ববিধ আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এর আর এক অর্থ مَا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয় ও ভীতি এসব ক'টি ভাবধারা যাতে সমন্বিত হয় তাই عُبُوْدِيَّةٌ নামে অভিহিত হয়।

মানবের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। মূলত আল্লাহ এ জন্যই মানবকূলকে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মানবের পক্ষে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই ইবাদতের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার ভাষায় ব্যক্ত করা হচ্ছে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এ কর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এতে আল্লাহর পক্ষ হতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা ইবাদতের জন্য দৃঢ়সংকল্প হোক, নিজের সাধ্যমতো এ কর্তব্য পালন করে যাক, আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুক, আমি তাকে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করব।

اَلْاِسْتِعَانَةُ -এর অর্থ : اَلْاِسْتِعَانَةُ মানে طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ অর্থাৎ, সাহায্য প্রার্থনা করা। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য মতে বান্দার কোনো কাজ আল্লাহর معونة ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক مَعُوْنَةٌ দু'প্রকার। যথা– ضَرُوْرِيَّةٌ এবং غَيْر ضَرُوْرِيَّةٌ অর্থাৎ, যা ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না তাকে ضَرُوْرِيَّةٌ বলা হয়। আর যা ছাড়া কাজ করা যায়; তবে কষ্ট হয়; সহজভাবে করা যায় না তাকে غَيْر ضَرُوْرِيَّةٌ বলে। এখানে اِسْتِعَانَةٌ বলে উভয় প্রকার مَعُوْنَةٌ -কে বুঝানো হয়েছে।

مَعْنَى الْهِدَايَةِ [হেদায়েতের অর্থ] : هِدَايَةٌ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ– পথ প্রদর্শন করা, অথবা পথের শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। মানুষকে এ হেদায়েত চারটি দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত স্বভাবজাত জ্ঞান হতে কাজের পথ জেনে নেওয়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা ও ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে জীবন পথের জ্ঞান অর্জন করা। তৃতীয়ত স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির পথনির্দেশ লাভ করা এবং চতুর্থত দীন হতে পথ নির্দেশনা লাভ করা।

প্রথমোক্ত তিন ধরনের হেদায়েত সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে; কিন্তু এ স্বভাবজাত হেদায়েত দ্বারা মানুষের জীবনের ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ কিছুতেই পূরণ হতে পারে না। জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে দীন ভিত্তিক হেদায়েত একান্ত আবশ্যক যা মানুষের কাছে আসে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং যা বাস্তবায়ন করেন রাসূলগণ।

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর অর্থ : اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। যথা– (১) সিরাতে মুস্তাকীম হলো কিতাবুল্লাহ, (২) ইসলাম, (৩) আবুল আলিয়ার মতে হযরত মুহাম্মদ (সা.), আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর আদর্শ উদ্দেশ্য, (৪) সাহ্‌ল বলেন, সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা উদ্দেশ্য, (৫) ইমাম মুযানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর তরিকাকে সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে এবং (৬) আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, সত্য পথ ও দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْاِسْتِقَامَةُ -এর অর্থ : اِسْتِقَامَةٌ শব্দের অর্থ– সোজা, সরল হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, اِعْتِدَالٌ তথা সমান্তরাল হওয়া ইত্যাদি। সূরা ফাতিহায় اِسْتِقَامَةٌ বলতে সরল-সোজা পথকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ইসলাম সরল সোজা পথ তথা নির্ভেজাল জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু এখানে ইসলামকেই সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : যারা আল্লাহর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে তাদের বর্ণনা সূরা নিসার ৯ম রুকূ'তে নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্গত। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও সম্পূরক বিবরণ হিসেবে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের উল্লিখিত প্রকার اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ উক্তির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং এরাই উক্তিটির মুখ্য ব্যক্তিত্ব।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন– وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের উপর গজব এবং অভিশাপ অবতরণ করেছেন। –(ইবনে কাসীর)

اَلضَّآلِّيْنَ বলতে নাসারা তথা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন– قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ 'তারা নিজেরা পূর্বেই ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে ভ্রষ্ট করেছে।'

অথবা, مَغْضُوْبِ এবং ضَآلِّيْنَ বলে মুনাফিক উদ্দেশ্য, অথবা مَغْضُوْبِ দ্বারা ফাসিক অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত উদ্দেশ্য আর ضَآلِّيْنَ দ্বারা মন্দ আকিদা পোষণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সূরা ফাতিহা পঠনান্তে اٰمِيْن বলা প্রসঙ্গ: আমীন শব্দটি কুরআন মাজীদের আয়াত বা অংশ নয়। তবে সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করে আমীন বলা মোস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলে আমীন বলতে শুনেছি এবং তিনি এতে স্বর দীর্ঘায়িত করেছিলেন। আবূ দাউদে এসেছে যে, রাসূল ﷺ اٰمِيْن শব্দ উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট اٰمِيْن শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আয় আল্লাহ! তুমি কবুল করো।' জাওহারী বলেন, এর অর্থ 'এরূপ হোক'। ইমাম তিরমিযী বলেন, এর অর্থ 'আমাদের নিরাশ করো না'। ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশ বলেন, সাধারণভাবে এর অর্থ 'আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো"; কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য অর্থও গৃহীত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে আমীন বলতে শিখিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, চিঠিপত্রে যেরূপ সীলমোহর লাগানো হয়, তদ্রূপ সূরা ফাতিহার জন্য আমীন সীলমোহর স্বরূপ। যখন বান্দা সূরা ফাতিহা পাঠ করে আমীন বলে, তখন ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন এবং এরই অসিলায় আল্লাহ তা'আলা পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

মোটকথা : সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের সর্বপ্রকার বিষয়বস্তুর সার, এর বিস্তারিত বিবরণ হলো পূর্ণ কুরআন মাজীদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ : এখানে ال টি استغراقی সমস্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। আর حَمْدٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ح - م - د) জিনস صحيح অর্থ– সকল প্রশংসা, যাবতীয় প্রশংসা।

رَبِّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَرْبَابٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব نَصَرَ মাসদার رَبًّا، رَبَابَةٌ মূলবর্ণ (ر - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রতিপালক।

الْعٰلَمِيْنَ : এ শব্দটি বহুবচন, একবচনে عَالَمٌ শব্দগত جمع مذكر سالم এবং অর্থগত جمع قلت কিন্তু جمع كثرت -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ– সমস্ত বিশ্বজগত।

الرَّحْمٰنِ : এ শব্দটি رَحْمَةٌ ধাতু হতে নির্গত, সিফাতের সীগাহ, মূলবর্ণ (ر - ح - م) জিনস صحيح অর্থ– পরম দয়ালু।

مٰلِكِ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন مِلَاكٌ - مُلَّكٌ অর্থ– মনিব, কর্তা।

الدِّيْنِ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন اديان অর্থ– কর্মফল।

نَعْبُدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع - ب - د) জিনসে صحيح অর্থ– আমরা উপাসনা করি, আমরা ইবাদত করি।

نَسْتَعِيْنُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا : এখানে نا শব্দটি যমীরে মানসূবে মুত্তাসিল, সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন।

الصِّرَاطَ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন صُرُطٌ অর্থ– রাস্তা, পথ।

الْمُسْتَقِيْمَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল, সোজা, সঠিক।

اَنْعَمْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْعَامُ মূলবর্ণ (ن - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন।

الْمَغْضُوْبِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَضَبُ মূলবর্ণ (غ - ض - ب) জিনস صحيح অর্থ– অভিশপ্ত। এখানে اَلْمَغْضُوْب এর ال টি اَلَّذِىْ অর্থে যারা অর্থাৎ ইহুদিরা।

الضَّآلِّيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ضَالٌّ অর্থ– পথভ্রষ্ট, যারা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : اَلْحَمْدُ মুবতাদা, لِ হরফে জার, اللّٰه মাওসূফ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে সিফাত; মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর; জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হলো ثَابِتٌ শিবহে ফে'ল -এর। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ : اِهْدِنَا ফে'ল যমীর ফায়েল, نَا টি মাফউলে বিহী الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে বিহী ছানী। অবশেষে ফে'ল, ফায়েল, ও উভয় মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে ইন্‌শাইয়্যা হলো।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ
সূরা বাকারা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত– ২৮৬, রুকূ'– ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ (১) আলিফ-লাম-মীম। [আল্লাহ তা'আলাই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত]	الٓمّٓ ﴿١﴾
(২) এই কিতাব এমন যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, [এটা] আল্লাহভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক।	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾
(৩) ঐ আল্লাহভীরুগণ এমন যে, বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামাজ কায়েম/ প্রতিষ্ঠা রাখে, আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি, তা হতে ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾
(৪) এবং তারা এমন যে, বিশ্বাস স্থাপন করে এই কিতাবের প্রতিও যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আখেরাতের প্রতিও তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓ আলিফ লাম মীম [আল্লাহ তা'আলাই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত।]

(২) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ এই কিতাব এমন لَا رَيْبَ فِيْهِ যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই هُدًى [এটা] পথ প্রদর্শক لِّلْمُتَّقِيْنَ আল্লাহভীরুগণের জন্য,

(৩) الَّذِيْنَ ঐ আল্লাহভীরুগণ এমন যে, يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করে بِالْغَيْبِ অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি وَيُقِيْمُوْنَ এবং কায়েম/প্রতিষ্ঠা রাখে الصَّلٰوةَ নামাজ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি তা হতে يُنْفِقُوْنَ তারা ব্যয় করে,

(৪) وَالَّذِيْنَ এবং তারা এমন যে, يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করে بِمَآ এই কিতাবের প্রতিও যা اُنْزِلَ اِلَيْكَ আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যা অবতীর্ণ হয়েছিল مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ এবং আখেরাতের প্রতিও তারা يُوْقِنُوْنَ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা 'আল-ফাতিহা'য় হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করা হয়েছিল। আর সূরা 'আল-বাক্বারা'য় উক্ত প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে গৃহীত হওয়ার সুসংবাদ দান প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনোই সন্দেহ নেই'। সুতরাং সেটার অনুসরণ কর। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাদ্বয়ের পরস্পরের সম্পর্ক (রব্ত) সুস্পষ্ট।

নামকরণ : اَلْبَقَرَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَقَرَاتٌ অর্থ-গাভী। এ সূরা ৬৭ হতে ৭১ আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের প্রতি গাভী জবাইয়ের আদেশ এবং তাদের অবাধ্যতা সংক্রান্ত ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এ সূরায় বহুবিধ উন্নত আলোচনা ও হেদায়েতপূর্ণ বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, তথাপি নামকরণের জন্য সাধারণ সম্পর্ক বা যোগসূত্রই যথেষ্ট।

উল্লিখিত بَقَرَةٌ শব্দ অবলম্বনে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে اَلْبَقَرَةُ (আল-বাক্বারা)। নবী করীম ﷺ মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটি সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন। সূরার নামকরণ 'আল-বাক্বারাহ' করার অর্থ এই নয় যে, এতে শুধু গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং অপরাপর বিষয়ের মধ্যে গাভী সম্পর্কিত আলোচনাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা বাকারার ফজিলত : এ সূরা বহু আহকাম সম্বলিত সবচেয়ে বড় সূরা। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা বাক্বারা পাঠ করো। কেননা এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোনো اَهْلِ بَاطِلٌ তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

নবী করীম ﷺ এ সূরাকে سنام القران (সিনামুল কুরআন) ও ذُرْوَةُ الْقُرْاٰنِ (যারওয়াতুল কুরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। سَنَامٌ ও ذُرْوَة বস্তুর উৎকৃষ্ট ও উঁচু অংশকে বলা হয়।

সূরাতুল বাক্বারায় اٰيَةُ الْكُرْسِى নামের একটি আয়াত রয়েছে; তা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। -[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি সেগুলো নিয়মিত পাঠ করে তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মতো সকল বালা-মসিবত, রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে– সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি তথা আয়াতুল কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহকাম ও মাসায়েল : আহকাম ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাক্বারা সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হিকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও ঘটনাবলি রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বিষয়বস্তু : সূরা 'আল-বাক্বারা' পবিত্র কুরআনের সর্ববৃহৎ ও দীর্ঘতম সূরা। এতে ২৮৬ টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ' রয়েছে এ সূরায় শরিয়তের আহ্কাম, রীতি-নীতি, আদেশ-নিষেধ যত অধিক বর্ণিত হয়েছে, তত অধিক অন্য কোনো সূরায় বর্ণিত হয়নি। –[মা'আরিফুল কুরআন]

এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে– 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।' অতঃপর মু'মিন, কাফের ও মুনাফেকদের পরিচিতি বর্ণনা করে– মু'মিনগণ কিভাবে মহান আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে, আর কাফের ও মুনাফেকরা কিভাবে অমান্য করে, তা বর্ণিত হয়েছে। জীবন, মৃত্যু, পুনর্জীবন, পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি, খলিফা নিয়োগের সংকল্প, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, পৃথিবীতে অবতরণ ও মার্জনা লাভ, বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন অনুগ্রহ, তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি দান এবং তাদের অবাধ্যতা ও পরিণাম প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আহলে কিতাবদের বাকবিতণ্ডা এবং কিভাবে আহলে কিতাবরা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং গর্ব ও অহঙ্কার শেষে রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করে, তা বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গ এবং একে পবিত্রকরণ, সার্বজনীন ধর্ম স্থাপন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিনীত প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর 'বাইতুল মাকদিস-এর পরিবর্তে পবিত্র কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করে একে উপাসনার কেন্দ্র নির্দেশ করা হয়েছে এবং তার কারণে আহলে কিতাবদের অন্তরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পর শরিয়তের হুকুম-আহকাম, খাদ্য, পানীয়, সালাত, সাওম, জাকাত, হজ, কিসাস, অসিয়ত, জিহাদ, বিয়ে, তালাক, মহরানা, ঈলা, খুলা, রাজা'আত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ, এতিম, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ, প্রাণ ও ধন উৎসর্গ, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক যোগ্যতা, জ্ঞানবল-বাহুবলই যে জাতীয় নেতৃত্বের অন্যতম মানদণ্ড তা বিবৃত হয়েছে। অতঃপর মু'মিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তালূত-জালূত ও হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলগণের পরস্পরের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ঘোষণা, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে নমরূদের বিতর্কের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পথে দান, দানের নামে নির্যাতনের পরিণাম, লেনদেনে সাক্ষী ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব এবং কাফেরদের বিপক্ষে সফলতা অর্জনে মু'মিনদের দোয়া শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : সূরা 'আল-বাক্বারা'-এর বেশিরভাগ আয়াত নবী করীম ﷺ-এর মাদানী জীবনের প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়। কারো কারো মতে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এ সূরাটি প্রথম। শুধুমাত্র وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّٰهِ মহানবী ﷺ -এর জীবনের শেষ দিকের আয়াত এবং সুদের আয়াতগুলোও তাঁর জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক এই, সূরা ফাতেহাতে বান্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের জন্য আরজি পেশ করেছে, তারই জবাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তাই সূরা বাকারার শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে– لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
“এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শক আল্লাহভীরু লোকদের জন্য।
অতএব সূরায়ে ফাতেহায় হেদায়েতের যে দরখাস্ত করা হয়েছে তা মঞ্জুর হওয়ার খোশখবরী রয়েছে সূরা বাকারার প্রারম্ভে।

قَوْلُهُ الٓمّٓ ....هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াতসমূহ মালেক ইবনে সাইফ ইহুদি প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। সে মুমিনদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির মানসে বলত– 'এ কুরআন সেই কিতাব নয়, যার সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবে দেওয়া হয়েছে। তখন মহান রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাদের বিভ্রান্তিকর উক্তির সন্দেহ দূর করেন। অতঃপর চারটি আয়াত মুমিনদের প্রশংসায়, দুটি আয়াত কাফেরদের অসৎ চরিত্র বর্ণনা এবং পরবর্তী আয়াতটি মুনাফিকদের নিন্দায় নাজিল করেন। –[লুবানুন নুকূল]

- ❖ কেউ কেউ বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুভ সংবাদ রূপে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'আমি আপনার উপর অতি সুন্দর ও অতুলনীয় গ্রন্থ নাজিল করব। যখন পবিত্র কুরআন নাজিল হতে শুরু করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করেন– 'হে প্রতিপালক! এটাই কি সেই কিতাব, যার সংবাদ আপনি পূর্বে দিয়েছিলেন? তখন মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূলের ইচ্ছা ও প্রশ্নের উত্তরে অত্র আয়াতগুলো নাজিল করেন।
- ❖ নবী করীম ﷺ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করার পর যখন তথাকার অধিবাসীগণ ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে এবং ইসলাম ধর্মের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ইহুদিরা তার নবুয়ত, রিসালাত ও পবিত্র কুরআনকে সত্য বলে অস্বীকার করে এবং জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির অপকৌশল অবলম্বন শুরু করে। তখন তার প্রতিবাদে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

الٓمّٓ **এর বিশ্লেষণ :** পবিত্র কুরআনের বহু সংখ্যক সূরার শুরুতে এ ধরনের 'হরফ বা বর্ণ রয়েছে। এসব হরফ বা বর্ণকে حُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتِ বলা হয়। এগুলোর সঠিক অর্থ মানুষের জ্ঞানের অগম্য। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যবর্তী এ রহস্য অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য। কেউ কেউ এগুলোর তাফসীরও করেছেন; কিন্তু তাদের এ তাফসীরে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

- ❖ হযরত ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, এগুলো সূরার নাম।
- ❖ আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এগুলো পবিত্র কুরআনের নামের মধ্যে অন্যতম।
- ❖ আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো আল্লাহ্‌র নাম।
- ❖ প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الم এটা আল্লাহর নাম।
- ❖ অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, এটা আল্লাহর কসম এবং তাঁর নাম।

❖ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, الٓمّٓ অর্থ– اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ আমিই অভিজ্ঞ আল্লাহ।

❖ কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, 'আলিফ অর্থ– আনা, আহাদ, আযালী, আবাদী, আওয়াল ও আখির অর্থাৎ আমি, অদ্বিতীয়, অসীম, অনন্ত, আদি ও অন্ত; আর 'লাম অর্থ– আল্লাহু লাতীফুন– সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ; 'মীম অর্থ– মিন্নী, মাজীদ, মা'বুদ ও মালিক। এরূপ আরো অনেক অর্থ মুফাস্‌সিরগণ করেছেন। গ্রহণযোগ্য ও সঠিক অভিমত হলো, এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। সর্বসাধারণের জন্য এর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা অনুচিত।

ذٰلِكَ হলো اِسْمِ اِشَارَه لِلْبَعِيْدِ বা দূরজ্ঞাপক। তবে আরবি সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহারে ذٰلِكَ 'ইহা এবং 'উহা উভয় অর্থে ব্যবহৃত। তাই প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে ذٰلِكَ অর্থ হচ্ছে هٰذَا এ দু'টো اِسْمِ اِشَارَة একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এটা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে الٓمّٓ -এর প্রতি। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ذٰلِكَ দ্বারা সেই কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর সাথে ইতঃপূর্বে اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا-এর মাধ্যমে করেছিলেন।

অথবা, এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ দূরজ্ঞাপক ইসমে ইশারাহ সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো কারো মতে এখানে 'লাওহে মাহ্‌ফূয-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ **এর ব্যাখ্যা :** এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পবিত্র কুরআনের সাবলীল ভাষা, বর্ণনার মাধুর্য, অকাট্য যুক্তি ও বিজ্ঞানময় বক্তব্য তার যথার্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু কেউ যদি অবাস্তব সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে, তাতে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা বিনষ্ট হবে না; বরং এতে সত্য বিমুখতাই প্রমাণিত হবে। এ জন্য পবিত্র কুরআনে সন্দেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলেও সন্দেহকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি।

اَلْكِتٰبُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** কিতাব অর্থ লিখিত পুস্তক, অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা। এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীম। কালামুল্লাহর অংশবিশেষকে কিতাব বলা হয়। কিতাবের সংজ্ঞা বা পরিচিতি প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বলেন,

اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ۔

অর্থাৎ কিতাব হলো কুরআন যা নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ ও মাসাহেফে লিখিত এবং নবী করীম ﷺ হতে এমনভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, যাতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَا رَيْبَ فِيْهِ **-এর অর্থ :** কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী, কুরআন সম্পর্কে অপবাদজনিত কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। কোনো কালাম বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। (১) কালাম ভুল, আর কুরআনের ক্ষেত্রে এ কারণ অসম্ভব। কেননা বিধর্মীরা এটা প্রমাণ করতে পূর্বেই অপারগ হয়েছে। (২) কালাম নির্ভুল, তবে কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। যার উল্লেখ কুরআনের অন্যত্র রয়েছে– وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا الخ যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ করো। ...... (বস্তুত বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু করো)। তাই মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা পবিত্র কুরআন সত্য তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ যা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত।

ঈমানের অর্থ : অভিধানে اِيْمَانٌ অর্থ হলো تَصْدِيْق বা সত্যতা জ্ঞাপন করা, যেমন আল্লাহর বাণী– وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا অর্থাৎ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا - اِيْمَانٌ শব্দটি اَمْنٌ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ফাতহুল মুলহিম-এর গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো– تَصْدِيْق এবং اِعْتِقَاد অর্থাৎ সে সকল আহকামকে সত্যতা জ্ঞাপন এবং বিশ্বাস করা, যেগুলো মহানবী ﷺ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। ইমাম বায়যাভী (র.)-এর অভিমতও এরূপ।

ইমাম গাজালী (র.) তাঁর ফায়সালাতুত তাফরেকাহ গ্রন্থে আরও বলেন– اَلْاِيْمَانُ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ। অর্থাৎ মহানবী ﷺ যে সকল আসমানি প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমাম রাযী (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

غَيْبٌ -এর মর্মার্থ : غَيْبٌ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য হওয়া, অনুপস্থিত, মানুষের জ্ঞান এবং অনুভূতির উপরে হওয়া। ঐ সমস্ত জিনিস, যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অনুভূতির নাগালের বাইরে; যার জ্ঞান নবীদের বলা ব্যতীত লাভ করা যায় না। নবীদের কাছে আগত ওহী, অদৃশ্য জ্ঞান- এ সমস্ত অর্থেই কুরআন মাজীদে غَيْبٌ -এর ব্যবহার হয়েছে। غَيْبٌ শব্দটি পবিত্র কুরআনে نكرة [অনির্দিষ্ট] হিসেবে ব্যবহার হয়নি। আবার باء -এর উপর যবর, পেশ ও যের তিন রূপেই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই معرفة হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মোট ৪৯ বার শব্দটি এসেছে। মাত্র এক জায়গায় এটি اضافت হয়েছে সর্বনামের দিকে। অবশিষ্ট ৪৮ স্থানে একে ال যোগে معرفة করা হয়েছে এবং প্রথম ইসমের দিকে اضافت হয়েছে। আমরা এখন উদাহরণ স্বরূপ ইমাম রাগেবের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থিত করব। عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ যে সমস্ত জিনিস তোমরা দেখ এবং যা সম্বন্ধে তোমরা জান আর যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জান না, আল্লাহ সবকিছু জানেন। তোমরা কিছুই জান না আল্লাহ ঐ সবকিছুই জানেন। –[সূরা হাশর : ২৩] اَطَّلَعَ الْغَيْبَ [সূরা মারইয়াম : ৭৮] যে সমস্ত জিনিস চক্ষু এবং দিব্য জ্ঞানের সীমার উপরে, যে পর্যন্ত কল্পনা ও দৃষ্টি পৌছাতে পারে না। সে কি তার দিকে ঝুঁকে দেখেছে? তার কি সেই বিষয় জ্ঞান লাভ হয়েছে?

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ যে সমস্ত বস্তু মানুষের অনুভূতি এবং জ্ঞানের সীমার বাইরে রয়েছে তা আল্লাহ ব্যতীত আসমান জমিনের কেউ জানে না। –[সূরা নামল : ৬৫]

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ –[সূরা আলে ইমরান : ১৭৯] যে সমস্ত বস্তু তোমাদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না এবং যা তোমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের আওতায় নয়, সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করবেন না। এখানে غيب-এর অর্থ ওহীও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদের কাছে সরাসরি ওহী পাঠিয়ে তোমাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় অবহিত করবেন। اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ [সূরা মায়েদা : ১০৯] যা সত্য যা সন্দেহাতীত, মানুষের জ্ঞান যেখানে পৌছতেও পারে না, আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ [সূরা আন'আম : ৫৯] যে সমস্ত রহস্য তালাবদ্ধ রয়েছে, যে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান পৌছতে পারে না আল্লাহর কাছেই রয়েছে তা খোলার চাবি।

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ এর অর্থও তাই। رَجْمًا بِالْغَيْبِ –[সূরা কাহাফ : ২৩] যা তারা দেখেনি এবং যা তারা জানে না, সেটার প্রতি তারা তীর চালায়।

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ [সূরা বাকারা : ২] যার সঠিক জ্ঞান ওহী ব্যতীত লাভ হয় না, তার প্রতি তারা ঈমান আনে। অনুভূতিরও বুদ্ধি-জ্ঞান যেখানে পৌছায় না, নবীগণকে ওহী দ্বারা তার জ্ঞান দান করেন। যেমন, আল্লাহ আ'আলার জাত এবং সিফাত, হাশর-নশর, জান্নাত এবং বিশ্বাস করে। অথবা বলা যায়, যখন সে মুসলমানদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যায় সেই সময়ও এই সবের উপর বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তাঁর ঈমান খাঁটি।

لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ [সূরা আম্বিয়া : ৪৯] যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা তোমাদের অজ্ঞাত তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আল্লাহই তার খালিক, মালিক এবং তাতে হস্তক্ষেপকারী। حَافِظَاتٌ بِالْغَيْبِ [সূরা নিসা : ৩০] তারা [স্ত্রীরা] স্বামীদের অনুপস্থিতিতে নিজের ইজ্জত এবং স্বামীর মালের হেফাজত করে। এখানে غَيْبٌ এর অর্থ দেহের অঙ্গও হতে পারে, যা লোকদের সামনে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। مَنْ يَخَافُهٗ بِالْغَيْبِ [সূরা মায়েদা : ১৯৩] যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে। لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ [সূরা ইউসুফ : ৫২] তাঁর আযীযের অনুপস্থিতিতে তাঁর আমানতে খেয়ানত করিনি।

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا [সূরা জিন : ২৭] আল্লাহ ওহীর কথা নবী ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেন না। وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ [সূরা তাকরীম : ২৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ ওহীর ব্যাপারে কোনো প্রকার কৃপণতা করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ যে ওহী প্রেরণ করেন নবী ﷺ -এর উপর তিনি তা যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌছে দেন। তিনি তা গোপন রাখতেন না। ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ [সূরা আলে ইমরান : ৪৩] প্রাচীনকালের যেসব খবরসমূহ তোমাদের অজানা ছিল । সে সব গোপন খবরের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো। وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ [সূরা ইউসুফ : ৬১] আমরা অদৃশ্য বিপদ হতে বাঁচাতে পারতাম না। অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় غَيْبٌ শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) غَيْبٌ ঐ জিনিস যার নিকট অনুভূতি এবং আকলের হেদায়েত পৌঁছতে পারে না। নবীদের কথা ব্যতীত সেগুলো সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেও পারে না। (২) লোকদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যখন নিভৃতে সময় কাটায়। (৩) ওহী (৪) কোনো কোনো অতীতকালীন ঘটনা (৫) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ। (৬) গুপ্তাঙ্গ বা গুপ্ত বস্তু প্রকাশ করে দেওয়া।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য : আভিধানিক অর্থে কোনো বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের আধার হলো অন্তর। ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরিয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়। ظَاهِرًا তথা প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি ঈমান তথা অন্তরের বিশ্বাস না থাকে তবে কুরআনের ভাষায় এটাকে نِفَاقٌ (নেফাক) বলে। এটাকে কুফর হতেও জঘন্য অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।
ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ঈমান যেমন অন্তর থেকে শুরু হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য আমল থেকে শুরু হয় এবং অন্তরে পৌঁছে তা পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌঁছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপ প্রকাশ্য আমলও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছলে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাযালী (র.)-ও এ মত পোষণ করেন।
মোদ্দাকথা হলো, ইসলামি শরিয়তে ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

هِدَايَة-এর অর্থ : আয়াতে ব্যবহৃত هِدَايَة শব্দটি মাসদার। আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে هُدًى এমন পথ যা اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। গন্তব্যে না পৌঁছালে ঐ পথকে هِدَايَةٌ বলা হবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে হেদায়েতের বিপরীতে ضَلَالٌ বা ভ্রষ্টতা ব্যবহৃত হয়েছে।
আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, هِدَايَةٌ দু'প্রকার। যথা– (ক) পথ দেখানো। যা নবী রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে। আল্লাহর বাণী– وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আপনি সরল পথের দিকে আহ্বান করবেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা هِدَايَةٌ-এর অর্থ 'পথ দেখানো এবং রাস্তার দিকে আহ্বান করা বুঝিয়েছেন। (খ) هُدًى -এর দ্বিতীয় অর্থ– অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা বা চূড়ান্তভাবে সঠিক পথে আনয়ন করা। এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ আপনার পছন্দমতো আপনি কাউকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। অর্থাৎ কাউকে মুমিন বানিয়ে ফেলতে পারবেন না। –[ফাতহুল কাদীর]
মুত্তাকীদের পরিচয় : আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের কথা আলোচিত হয়েছে। তা হলো, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে তারাই মুত্তাকী।
হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, মুত্তাকী তারাই যারা হারাম কাজ হতে বিরত থাকে এবং ফরজ কাজসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।
কালবী (র.) বলেন, মুত্তাকী তারাই আয়াতে যাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।
মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুত্তাকী তারাই যারা ঈমান আনার পর شِرْك তথা অংশীদারিত্ব, كَبَائِرٌ তথা কবীরা গুনাহ, فَوَاحِشٌ তথা অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকেন এবং মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধাবলি যথাযথ মেনে চলেন।
একদা হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে মুত্তাকীদের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে দূরে রয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তারাই মুত্তাকী।
প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে মহানবী ﷺ -এর একটি হাদীস উদ্ধৃত আছে যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, কোনো বান্দা মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ সে 'অসুবিধা নেই এমন বস্তুকে ছেড়ে দেয় এই ভয়ে যে, অসুবিধা আছে এমন কোনো কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।

সূরার প্রথমে الم উল্লেখের কারণ : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে حُرُوْف مُقَطَّعَاتٌ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কিন্তু তাফসীরকারগণ এর কিছু কিছু হিকমত উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন–

- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রবল ক্ষমতাবান। এ ধরনের শব্দাবলির প্রকৃতার্থ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ না জানাটা তাঁর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, অতএব এতে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।
- الم অক্ষরগুলো মানুষের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সূরার প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

- দু'ধরনের বাক্য দিয়ে সবাই কথা বলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন– এতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, যদি সম্ভব হয় এমন করে বল।
- শ্রবণকারী কথাটার আওয়াজ শ্রবণ মাত্রই অনুধাবন করতে পারে যে, এর সমকক্ষ কোনো শব্দ দ্বারা তাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়।
- এ অক্ষরগুলো স্বয়ং মু'জিযা। এটা এমন নবীর মুখ থেকে নিঃসৃত, যিনি কস্মিনকালেও শিক্ষকের দ্বারস্থ হননি। তাঁর মুখ থেকে প্রকাশ পাওয়ার অর্থই হলো এগুলো তাঁর নিজের বানানো নয়, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে এসেছে।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ **বলার কারণ :** পবিত্র কুরআন একমাত্র মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতের উৎস স্বরূপ। মূলত এটা সমগ্র মানবজাতির জন্যই হেদায়েতের পথ দেখায়। কিন্তু যারা কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে না তারা খোদাভীরু নয়। খোদাভীরুগণই এটা থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে– যারা খোদাভীরু হতে চেয়েছেন তাদের জন্যই কুরআন পথপ্রদর্শক। শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত, প্রকৃতার্থে নয়।

নামাজ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য : ইকামাতে সালাত বলতে শুধু নামাজ আদায় করাকেই বুঝায় না; বরং নামাজকে তার আহকাম-আরকানসহ যথানিয়মে সঠিক সময়ে আদায় করার নাম ইকামাতে সালাত।

তাফসীরকারগণ ইকামাতে সালাতের কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথা–

- আহকাম আরকান সহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা।
- রীতিমতো একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করা।
- একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করার জন্য সার্বিক দিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তৈরি থাকা, যেন কোনো প্রকারে নামাজ ছুটে না যায়।

اِنْفَاقٌ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** اِنْفَاقٌ অর্থ– আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে ফরজ জাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সেসব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সাধারণত اِنْفَاقٌ শব্দ নফল দান-খয়রাতের অর্থেই ব্যবহৃত রয়েছে। যেখানে ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য সেখানে زَكٰوةٌ (যাকাত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগরিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহর দান ও আমানত। যদি এগুলো তার পথে ব্যয় করি তবেই মাত্র এ নিয়ামতের হক আদায় করা হবে।

শুধু সালাত ও ব্যয়কে উল্লেখ করার কারণ : আয়াতে কারীমাতে মূল ইবাদতসমূহের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল, শুধু নামাজ ও ব্যয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, যত রকমের আমল রয়েছে তা ফরজ হোক বা ওয়াজিব হোক সবই মানুষের দেহ বা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইবাদতে বদনী তথা শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নামাজের বর্ণনা এনেছেন এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই اِنْفَاقٌ -এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার ইবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ইবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

রিজিক বলতে যা বুঝায় : رِزْق অর্থ– অংশ, رِزْق বলা হয় ঐ অংশকে যা বান্দার জন্য নির্দিষ্ট হয়। কেউ বলেন, رزق ঐ বস্তুকে বলে যা ভক্ষণ করা হয় অথবা ব্যবহার করা হয়। আবার কেউ বলেন, যা মালিকানায় আছে তা-ই রিজিক। এ দু'টি মতোই ঠিক নয়। কেননা মালিকানায় নেই এমন বস্তুকেও রিজিক বলা হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ وَلَدًا صَالِحًا (হে আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান দান করো।) আর খাদ্যবস্তুকে এ জন্য রিজিক বলা ঠিক নয় যে, রিজিক খরচ করার জন্য বলা হয়েছে, আর ভক্ষিত বস্তু খরচ করা সম্ভব নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আলেমের মতে, যা দ্বারা কল্যাণ পাওয়া যায় তাই রিজিক, চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে মাখলুকের জন্য যা কিছু দেওয়া হয়েছে সব কিছুই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

يَقِيْن **-এর অর্থ :** يَقِيْن -এর অর্থ হলো সন্দেহের পর কোনো বিষয়ের এমন জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ কথা বলা যায় না যে, تَيَقَّنْتُ اَنَّ السَّمَاءَ فَوْقِىْ কেননা আকাশ যে উপরে এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তবে যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ না থাকা সত্ত্বেও কেউ সন্দেহ করে, তারপর বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে এর সত্যতা উদঘাটিত হয়, তাহলে يَقِيْن ব্যবহার করা যাবে। যেমন– تَيَقَّنْتُ اَنَّ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ

আখেরাত বলতে যা বুঝায় : আখেরাত শব্দের অর্থ হলো– পরে আগত বস্তু, পিছনে আসা। এ শব্দটি সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা اَلدُّنْيَا -এর বিপরীত শব্দ। পরিভাষায় আখেরাতের সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়– اَلْحَيَاةُ الْاُخْرَوِيَّةُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اٰخِرَةٌ অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন শেষ হবার পর পরবর্তী যে জীবন শুরু হয় তাকে তথা পরকাল বলা হয়।

وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -এর তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ বলে মুসলমানদের মর্যাদা দান করেছেন। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সাথীরা, তাদের মর্যাদা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এতে তাদের সম্মানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদ্দারা বাকি আহলে কিতাবদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমানের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন দ্বারা পূর্ব শরিয়তের উপর আমল করার প্রয়োজন নেই। কেননা اِيْمَانٌ শব্দের অর্থ تَصْدِيْق ; কিন্তু আমল করা স্বতন্ত্র বিষয়। পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনা ফরজ এবং এটা ঈমানের একটা মৌলিক শর্ত। এ প্রসঙ্গটিকে বুঝতে হবে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত কিতাবগুলো যে নাজিল করেছেন এটা বাস্তব সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বার্থপর এবং দুর্ভাগা লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে তা ভ্রান্তিপূর্ণ। আমলের ব্যাপারে বক্তব্য হলো– আমল শুধু কুরআনের আহকাম অনুযায়ী হবে। কেননা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের কিতাবসমূহের আহকাম مَنْسُوْخ বা রহিত হয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هُدًى : শব্দটি মাসদার, বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى এখানে هَادٍ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– পথপ্রদর্শক, হেদায়েতকারী।

يُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

يُقِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা প্রতিষ্ঠা করে।

اُنْزِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول فعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– নাজিলকৃত, অবতারিত।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

رَبِّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ارباب এটা اسم فاعل مبالغة অর্থ– প্রতিপালক।

اَلْمُفْلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْلَاحُ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা সফলকাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ : الٓمّٓ শব্দটি هذه মুবতাদা محذوف -এর খবর। আর ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বিতীয় খবর অথবা بدل (বদল)। অথবা الم হলো مبتدأ আর উহ্য معجزة বা متحدى খবর।

অথবা, এভাবে বলা হয় প্রথম الم مبتدأ আর ذلك দ্বিতীয় مبتدأ আর الكتاب খবর। অতঃপর বাক্যটি প্রথম মুবতাদার খবর।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : এখানে واو হলো حرف عطف আর اُولٰٓئِكَ হলো مبتدأ اول এবং هُمْ হলো مبتدأ ثانى আর اَلْمُفْلِحُوْنَ হলো উভয় মুবতাদার খবর। অতএব, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية অতঃপর এটা معطوف عليه ও معطوف মিলে جملة عاطفة হলো।

অনুবাদ	আরবি
অনুবাদ : (৫) তারাই রয়েছে তাদের প্রভু হতে প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম।	أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)
(৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়ে গেছে, তাদের জন্য উভয়ই সমান, আপনি তাদরেকে ভয় দেখান বা না দেখান। তারা ঈমান আনবে না।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)
(৭) আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর; এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা রয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)
(৮) আর মানুষের মধ্যে কতক এমন লোক রয়েছে যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (٨)
(৯) তারা চালবাজী করে আল্লাহ এবং মুমিনদের সাথে; বস্তুত তারা কারো সাথে চালবাজী করে না নিজের ব্যতীত, অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।	يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)
(১০) তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে কঠিন পীড়া, পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি, এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

(৫) أُولَٰئِكَ তারাই عَلَىٰ هُدًى রয়েছে হেদায়েতের উপর مِّن رَّبِّهِمْ তাদের প্রভু হতে প্রাপ্ত وَأُولَٰئِكَ هُمُ এবং তারাই الْمُفْلِحُونَ পূর্ণ সফলকাম।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ নিশ্চয় যারা كَفَرُوا কাফের হয়ে গেছে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ তাদের জন্য উভয়ই সমান أَأَنذَرْتَهُمْ আপনি তাদেরকে ভয় দেখান বা أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ না দেখান لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনবে না।

(৭) خَتَمَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহের উপর وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ও তাদের কর্ণসমূহের উপর وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর রয়েছে غِشَاوَةٌ পর্দা وَلَهُمْ আর তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ عَظِيمٌ গুরুতর শাস্তি।

(৮) وَمِنَ النَّاسِ আর মানুষের মধ্যে কতক এমন লোকও রয়েছে مَن يَقُولُ যারা বলে آمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِاللَّهِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং শেষ দিবসের প্রতি وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

(৯) يُخَادِعُونَ তারা চালবাজী করে اللَّهَ আল্লাহ وَالَّذِينَ آمَنُوا এবং মুমিনদের সাথে وَمَا يَخْدَعُونَ বস্তুত তারা কারো সাথে চালবাজী করে না إِلَّا أَنفُسَهُمْ নিজের ব্যতীত وَمَا يَشْعُرُونَ অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।

(১০) فِي قُلُوبِهِم তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে مَّرَضٌ কঠিন পীড়া, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন وَلَهُمْ আর তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ أَلِيمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না ভূপৃষ্ঠে, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু শান্তিই স্থাপনকারী।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (١١)
(১২) সাবধান! নিশ্চয়,এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।	اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٢)
(১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তদ্রূপ ঈমান আন যেরূপ ঈমান এনেছে অন্যান্য লোক, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব যেরূপ ঈমান এনেছে এ নির্বোধেরা? মনে রাখুন! তারাই নির্বোধ কিন্তু তারা বুঝতে পারতেছে না।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ (١٣)
(১৪) আর যখন মুনাফেকরা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা গোপনে মিলিত হয় নিজ দুষ্ট নেতাদের সাথে, বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা করে থাকি।	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ (١٤)
(১৫) আল্লাহই তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন, ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।	اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় لَا تُفْسِدُوْا তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে قَالُوْٓا তখন তারা বলে اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ আমরা তো শুধু শান্তিই স্থাপনকারী।

(১২) اَلَآ সাবধান! اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ নিশ্চয় তারাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী وَلٰكِنْ কিন্তু এ সম্বন্ধে لَّا يَشْعُرُوْنَ বোধই রাখে না।

(১৩) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, اٰمِنُوْا তদ্রূপ ঈমান আন كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ যেরূপ ঈমান এনেছে অন্যান্য লোক قَالُوْٓا তখন তারা বলে اَنُؤْمِنُ আমরা কি ঈমান আনব كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ যেরূপ ঈমান এনেছে এ নির্বোধেরা? اَلَآ মনে রাখুন! اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ তারাই নির্বোধ وَلٰكِنْ কিন্তু لَّا يَعْلَمُوْنَ তারা বুঝতে পারছে না।

(১৪) وَاِذَا لَقُوْا আর যখন মুনাফিকরা সাক্ষাৎ করে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদের সাথে قَالُوْٓا তখন তারা বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَاِذَا خَلَوْا আর যখন তারা গোপনে মিলিত হয় اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ নিজ দুষ্ট নেতাদের সাথে قَالُوْٓا বলে اِنَّا مَعَكُمْ নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি اِنَّمَا نَحْنُ আমরা তো শুধু مُسْتَهْزِءُوْنَ ঠাট্টা করে থাকি।

(১৫) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ আল্লাহই তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন وَيَمُدُّهُمْ এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন فِىْ طُغْيَانِهِمْ ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে يَعْمَهُوْنَ উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(٦)– اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি আবূ জাহল, আবূ লাহাব, উতবা, শাইবা এ ধরনের নির্দিষ্ট কিছু কাফেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইলম ছিল যে, তারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। তারা কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না, সবার ব্যাপারে নয়। কারণ এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও অনেক কাফের মুসলমান হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে। ইনশাআল্লাহ।

(৮)– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মুতাজির ইবনে কুশাইরকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহকে ভয় কর, নেফাক ছেড়ে দাও। উপরে একরকম ভিতরে অন্য রকম থাকা উচিত নয়। তখন তারা বলল, আশ্চর্য তো আপনি আমাদের মুসলমানদেরকে কাফের বলছেন, তাদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াত নাজিল করেন।

(১৪)– وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এবং তার অনুচরদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। ঘটনাটি হলো এই, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার অনুচররা দেখল, এক জায়গায় হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে আছেন। তখন সে তার অনুচরদেরকে বলল, দেখ আমি তাদের সাথে কিভাবে মজা করি। সে প্রত্যেকের হাত ধরে আলাদা আলাদা প্রশংসা করলো। সে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে লক্ষ্য করে বলল,

مَرْحَبًا لِلشَّيْخِ وَالصِّدِّيْقِ وَلِعُمَرَ مَرْحَبًا بِالْفَارُوْقِ الْقَوِيِّ فِيْ دِيْنِهٖ وَلِعَلِيٍّ يَا ابْنَ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ

"ধন্যবাদ হে প্রবীণ ও সিদ্দীক, হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, ধন্যবাদ হে ফারূক! আপনি ন্যায়ের পথে নিজ ধর্মে অটল, হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য কর বলল, ধন্যবাদ হে রাসূলের চাচাতো ভাই! তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, মুনাফেকী করো না। সে মুহূর্তে সে বলল, আপনি একি বললেন! আমার ঈমান তো আপনাদের ঈমানের অনুরূপই। পরে সে তার সাথীদেরকে বলল, দেখলে কিভাবে মজা করলাম। মুসলমানদেরকে দেখলে তোমরাও এরূপ মজা করবে। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ কে এ ঘটনাটি জানালেন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا **দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে كَفَرُوْا দ্বারা আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা, উতবা ও তাদের মতো মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

كُفْر -এর অর্থ : كُفْرٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ– আচ্ছাদন করা, আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া, গোপন করা। এর মর্মার্থ হলো, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা। অধর্ম ধর্মকে, অসত্য সত্যকে, অনাচার সদাচরকে, অকৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতাকে আচ্ছাদিত করে বলেই كُفْر কে كُفْر বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা, নবী-রাসূলগণ, ধর্মগ্রন্থসমূহ, বেহেশ্ত, দোজখ, পরকাল, ফেরেশ্তা, তাকদীর ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাস করে, তাকেই অবিশ্বাসী বা كَافِرٌ বলা হয়।

اَلْكُفْرُ -এর প্রকারভেদ : কুফর চার প্রকার। যথা–

(১) كُفْرُ الْاِنْكَارِ **(কুফরে ইনকার) :** মুখে এবং অন্তরে কোনো জিনিসকে ইনকার বা অস্বীকার করা।

(২) كُفْرُ الْجُحُوْدِ **(কুফরে জুহূদ) :** সত্যকে নিজের অন্তর দিয়ে বুঝা, কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন– ইবলিসের অস্বীকার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী– فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ

(৩) كُفْرُ الْمُعَانَدَةِ **(কুফরে মু'আনাদাহ) :** সত্যকে অন্তর দিয়ে বুঝা, মুখে বলা, কিন্তু গ্রহণ না করা এবং হককে দীন হিসেবে মেনে না নেওয়া। যেমন হযরতের চাচা আবূ তালেবের কুফরি।

(৪) كُفْرُ النِّفَاقِ **(কুফরে নেফাক্ব) :** মুখে বলা, কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করা।

ঈমান ও কুফরির পরিণতি : ঈমান ও ইসলামের দ্বারা ব্যক্তির মনে নূর বিচ্ছুরিত হয়। মানুষ দৈনন্দিন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই তার সকল নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে সকল মুমিন পরস্পরে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, একে অপরের কল্যাণকামী হয়। তাদের এই আত্মীক সম্পর্ককেই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেন, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের পরম শান্তি যা হবে– جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

অপরদিকে কুফরি হলো এক ভ্রান্ত মতবাদ। বিশ্বপ্রতিপালকের অস্বীকৃতিরূপ অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলে। পরিণতিতে সমস্ত অন্ধকার এবং দুর্বলতা তাদেরকে কাপুরুষে পরিণত করে। তখন সমসৃষ্ট মানুষও তাদের জন্য ভয়ের কারণ হয় ঈমানের ন্যায় মূল্যবান সম্পদকে অস্বীকার করার কারণে; একদিক তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে যায়। তাই পরকালে তারা নিক্ষিপ্ত হবে অন্ধকার আগুনে। অন্ধকার আত্মাকে অন্ধকার আগুন দিয়েই পুরস্কৃত করা হবে।

قوله سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ -এর ব্যাখ্যা : 'আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন, আর না-ই করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান'। এর দ্বারা রাসূল ﷺ -কে ভয় প্রদর্শন হতে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়নি। কেননা ইসলাম প্রচারের কাজে যদি কোনো পক্ষেরই উপকার না হতো, তবে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হতো। এখানে কাফেরদেরকে উপদেশ দিলে তাদের কোনো উপকার হোক বা না হোক রাসূল ﷺ তো দাওয়াতি কাজের ছওয়াব অবশ্যই পাবেন?। কাফেরদের হেদায়েত গ্রহণ একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। তা কোনো নবী অথবা পীরের হাতে নয়।

এনযার শব্দের অর্থ : 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর اِبْشَارٌ এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে এনযার বলতে ভয় প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 'নাযির' বা ভয় প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী রাসূলগণকে খাসভাবে নাযীর বলা হয়। কেননা তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা তাবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে– সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে শুনেও কুফরি ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে, অথবা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসু হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

পাপের শাস্তি পার্থিব সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : এ দুটি আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই, তবে কোনো কোনো পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষ নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে, যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন যে, পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয়।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোনো একটি গুনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে তওবা না করে , আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভালো মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী : এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নসিহত করা না করার সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর সাথে عَلَيْهِمْ-এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসূলের জন্য নয়, তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করা ছওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কুরআনের কোনো আয়াতেই এমনসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিষেধ করা হয়নি। এতে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসু হোক বা না হোক, সে এ কাজের ছওয়াব পাবেই।

একটি সন্দেহের নিরসন : এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফফিফীনের এক আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে যথা– كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে। তাতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দকাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের

দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে সীলমমোহর এঁটে দিয়েছেন, এবং গ্রহণ ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরি করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছে।

قوله خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ -এর ব্যাখ্যা : 'আল্লাহ তা'আলা তাদের (কাফেরদের) অন্তঃকরণে কুফরির মোহর মেরে দিয়েছেন। এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার কারণেই তারা ঈমান গ্রহণ করতে পারেনি; বরং এর অর্থ হলো, তারা যখন ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছে, তা থেকে তাদেরকে নিয়ে আসা যাবে না। কিন্তু যেহেতু মানুষের যাবতীয় কার্যসমূহ তাদের ইচ্ছাকৃত হলেও সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা, তাই তিনি আয়াতে নিজেকে উক্ত কার্যসমূহের স্রষ্টা বলে প্রকাশ করেছেন। যখন তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের কর্তা হলো এবং সেই সর্বনাশকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলাও এরূপ অবস্থায় তাদের অন্তর এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সৃষ্টি করে দিলেন। সুতরাং তাদের কৃতকর্মই অন্তরের উপর মোহরাঙ্কনের কারণ হলো।

অন্তঃকরণে মোহর মারার অর্থ : অন্তঃকরণে মোহর মারার অর্থ হলো, হক সম্পর্কে অনবহিত থাকা। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির উপর চিন্তা-গবেষণা না করা। বরং তাদের এমন অবস্থা প্রকাশিত হওয়া যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সত্য সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করে না। মনে হয় যেন তাদের অন্তঃকরণে সত্যের কোনো স্থানই নেই।

কানে মোহর মারার অর্থ : কানে মোহর মারার অর্থ হচ্ছে, তারা হক বা সত্য কথা শুনতে রাজি থাকে না। যদিও শোনে; কিন্তু আমল বা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চিন্তা করে না। পবিত্র কুরআনের আয়াত তাদের সামনে পঠিত হয় বটে; কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টাও করে না। সত্যের পথে ডাকা হলে কর্ণপাতও করে না। মনে হয়, তাদের কানে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে।

وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ -এর ব্যাখ্যা : 'এবং তাদের চক্ষুসমূহে আবরণ পড়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, যেন তারা সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকিয়ে স্রষ্টার খোঁজ করে। প্রত্যেকটি দৃষ্টি যেন হয় স্রষ্টার পরিচায়ক। কিন্তু নির্বোধ মুশরিক ও কাফেররা সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকায়, তবে শিক্ষার নিয়তে তাকায় না, হেদায়েতের আশায় দৃষ্টি দেয় না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টির অবস্থা এরূপ করে দিয়েছেন।

তিনটি ইন্দ্রিয়কে উল্লেখ করার কারণ : এ তিনটি ইন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানা অতি সহজ। কেননা অন্তর অনুধাবনযোগ্য, কান শ্রবণযোগ্য এবং চক্ষু দৃষ্টিযোগ্য। এ তিন স্তরের মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত পরিচয় ঘটে। তাই এগুলো আল্লাহকে চেনা ও জানার মাধ্যম।

اَنْذَرْتَهُمْ -এর কেরাত ঃ ءَاَنْذَرْتَهُمْ –এর এখানে পাঁচটি কেরাত রয়েছে– (১) উভয় همزه -কে ঠিক রেখে পড়া। (২) উক্ত দু'টো همزه -এর মধ্যখানে একটি الف যুক্ত করে পড়া। (৩) উভয় همزه -কে সহজ করে পড়া (تَسْهِيْل) (৪) تَسْهِيْل -এর মধ্যখানে الف যুক্ত করে পড়া। (৫) দ্বিতীয় همزه -কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া।

مِنَ النَّاسِ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে : প্রখ্যাত মুফাস্‌সির সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী আহলে কিতাব, যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, ইবনে কুশাইর এবং ইবনে কায়েস প্রমুখকে বুঝানো হয়েছে। অপর বর্ণনায় সাধারণ মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে।

اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ -এর অর্থ : اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ শেষদিন বা পরকাল। اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলতে ঐ সময়কে বুঝানো হয়েছে, যার কোনো সীমা নেই, যা অনন্ত, কোনো সময়েই তা শেষ হবার নয়।

কেউ কেউ বলেন, কবর থেকে উঠার পর হতে জান্নাতী জান্নাতে আর দোজখী দোজখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সময়কে اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলা যেতে পারে।

نِفَاقٌ -এর প্রকারভেদ : নিফাক দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) نِفَاق اِعْتِقَادِيٌّ (২) نِفَاق عَمَلِيٌّ

১. نِفَاق اِعْتِقَادِيٌّ হলো, বিশ্বাসের দিক থেকে নিফাক। কুরআনের ভাষায় এদের শাস্তি হলো– اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসী।

২. نفاق عملى হলো, আমলের দিক থেকে নিফাক, কার্যত এরাও প্রকৃত মুনাফিক। এটা কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত এদের কতিপয় নিদর্শন নিম্নরূপ– (১) اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হয় তারা খেয়ানত করে। (৩) اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ যখন অঙ্গীকার করে তখন তা পূর্ণ করে না। নিফাক প্রকটভাবে মদীনার যুগে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কেননা মদীনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল তাই তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুকূলে কথা বলতো, আর অলক্ষ্যে আগোচরে ইসলামের শত্রুদের সাথে শলা-পরামর্শে লিপ্ত হতো।

يَقُوْلُ -কে একবচন, আর مُؤْمِنِيْنَ বহুবচন ব্যবহারের কারণ : يَقُوْلُ ফে'লের পূর্বে مَنْ ইসমে মাওসূল রয়েছে, যা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন, আর শব্দের দিক দিয়ে একবচন। সুতরাং مَنْ -এর শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে يَقُوْلُ একবচন বলা হয়েছে, আর من -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে مُؤْمِنِيْن বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ -এর ব্যাখ্যা : তারা আল্লাহ তা'আলা ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে। এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিক হলো যারা মুখে যা বলে, অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস গোপন রাখে। তারা মুসলমানদের নিকট নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করতো, আবার কাফেরদের নিকটে গিয়ে মুসলমানদেরকে বোকা ও নির্বোধ বলে হাসি-তামাশা করতো। তারা মনে করত যে, তারা মুসলমান ও তাদের প্রভুকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের এ কপটতা ও প্রতারণা তাদের নিজেদেরই সাথে আত্মপ্রতারণায় পরিণত হয়। অথচ তারা নিজেদের এ আচরণ সম্পর্কে একটুও ভেবে দেখে না।

মুনাফেকরা কিভাবে আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয় : মুনাফেকরা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোকা দেয়। এখানে প্রশ্ন হয়, কিভাবে এরা ধোঁকা দেয়। আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। ধোঁকা তো ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, যে ঐ বিষয় সম্পর্ক জানে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোপন, অতীত ও ভবিষ্যৎ ভালোভাবে জানেন। তাঁকে ধোঁকা দেওয়া তো কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, (১) এখানে মুনাফেকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, তা নয়; বরং তারা রাসূল ﷺ-কে ধোঁকা দেয়। রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর স্থানে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, মুনাফেকরা যখন রাসূল ﷺ-কে ধোঁকা দেয়, প্রকারান্তরে তারা আল্লাহকেই ধোঁকা দেয়। (২) অথবা, তাদের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ধোকা দেয়। ধোকাবাজ যেমন স্বীয় বিশ্বাসকে গোপন করে অন্য বিষয়কে প্রকাশ করে, তেমনি মুনাফেকরা আল্লাহর সামনে ঈমান প্রকাশ করে কুফরি লুকিয়ে রাখে। তখন তারা মনে করে যে, আল্লাহকে ঈমানের মধ্যে ফাঁকি দিয়েছি। তাই আমরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মু'মিন ভেবে আহ্কাম নাজিল করেছেন।

قوله فَزَادَهُمُ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন– এ আয়াতের বিশ্লেষণ এই যে, তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তো দিন দিন তার দীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন।

مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যা : আয়াতে বর্ণিত مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–

- مَرَضٌ শব্দের অর্থ– রোগ-ব্যাধি।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে مَرَضٌ শব্দ দ্বারা সন্দেহ-দ্বিধা বুঝানো হয়েছে।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় مَرَضٌ -এর অর্থ– 'নিফাক করা হয়েছে।
- হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, এখানে مَرَضٌ দ্বারা দীনি রোগ বুঝানো হয়েছে, শারীরিক রোগ নয়। তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহের রোগ ছিল। তারা সর্বদাই মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তায় লিপ্ত থাকতো।

মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে রাসূল ﷺ -এর বিরত থাকার কারণ

নবী করীম ﷺ মুনাফেকদের সংখ্যা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবুও তিনি তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। এর কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো–

(১) নবী করীম ﷺ ছাড়া অন্য কেউ মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জানতো না। যেহেতু তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রধান কাজি, সেহেতু তিনি এর শাস্তির ফয়সালা দিতে পারেন না।

(২) আসহাবে শাফেয়ীর মতে তাদেরকে এজন্য হত্যা করেননি যে, কেননা সে ধর্মদ্রোহী যে কুফরি গোপন করে ঈমান প্রকাশ করে, তার কাছে এটার তওবা চাওয়া হবে, হত্যা করা যাবে না।

(৩) নবী করীম ﷺ -এর লক্ষ্য ছিল তাদের অন্তর জয় করে নেবেন। এরই আলোকে তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন, হে ওমর মানুষ বলবে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর অনুচরদের হত্যা করছে। এটি অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

فَسَادٌ -এর অর্থ : فَسَادٌ শব্দটি صَلَاحٌ -এর বিপরীত। অর্থ– ধ্বংস করা, নষ্ট করা। কল্যাণ ও সৎকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সহজ-সরল এবং গঠনমূলক কার্য থেকে বিমুখ হয়ে বিপরীত ভূমিকা রাখাই হচ্ছে ফ্যাসাদের বাস্তবরূপ। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টিও ফ্যাসাদের একটি রূপ। নবী করীম ﷺ ও কুরআনুল কারীমের উপর ঈমান আনা ছিল স্বভাবজাত চাহিদা। কিন্তু এটা থেকে বিমুখ হয়ে কুফরির মাধ্যমে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ বলে অভিহিত করেছেন। –[কুরতুবী]

قوله لَا تُفْسِدُوْا -এর ব্যাখ্যা : তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। মুনাফিকরা কিভাবে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো? পবিত্র কুরআনে لَا تُفْسِدُوْا শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, তারা দুনিয়াতে এমন কিছু কাজ আঞ্জাম দিতো যা মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হতো। যেমন তারা মুসলমানদের প্রতারিত করতো, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতো, মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের উসকানি দিতো, গোপনে মুসলমানদের তথ্য সংগ্রহ করতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল উভয় দলের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি করা। অথচ তারা বলতো আমরা তোমাদের দু' দলের মধ্যে মীমাংসাকারী।

اَلْأَرْضُ শব্দটির বিশ্লেষণ : أَرْض শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, اسم جنس বা জাতিবাচক বিশেষ্য। যে সকল مؤنث শব্দের শেষে تائی تانیث থাকে না তাদের বহুবচনের শেষে ت যুক্ত হয়। যেমন– اعَرَسَاتٌ। অতএব أَرْض -এর جمع হওয়ার দরকার ছিল أَرَضَاتٌ; কিন্তু তারা أَرَضُوْنَ বলেছে। কোনো কোনো সময় এর বহুবচন أُرُوْضٌ ও أَرَاضٌ ব্যবহৃত হয়। তবে أَرَاضِيْ ও নিয়মের বিপরীতে হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মুনাফিকরা নিজের দোষকে গুণ ও অপরের গুণকে দোষ মনে করে

قوله لَا يَشْعُرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো, আর প্রকাশ্যে তাদের কল্যাণ কামনার ভান করতো তাদের এ খবর ছিল না যে, নবী করীম ﷺ তাদের এ কাজ সম্পর্কে অবহিত।

অথবা, এ অর্থও করা যেতে পারে যে, তাদের ফিত্নামূলক কার্যক্রম তাদের নিকট ফিত্না বা ফ্যাসাদ মনে হতো না; বরং তারা কল্যাণ মনে করেই এগুলো করতো। অথচ এটাই ফ্যাসাদ। তাদের কাজকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নাফরমানিই প্রকাশ পেয়েছে, এটা তাদের জানা ছিল না।

১৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধারা হয়েছে– اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ অর্থাৎ অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তেমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন, অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়; অন্যথা তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বুঝা গেল যে সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের

কষ্টিপাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারদেরকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভালো কাজই হোক না কেন, আর তা যত নেক নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবীদেরকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি, ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদেরকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোনো শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলা হয়েছে।

মুনাফিকরা যাদের সাথে ঠাট্টা করতো : মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। সাধারণ মুমিনদের সামনে বড় বড় সাহাবীদের প্রশংসা করতো। আর বড় বড় সাহাবীদের মর্যাদা উল্লেখ করে সাধারণ মুমিনদের থেকে মর্যাদাবান বলে আলোচনা করতো, অথচ তাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য সামান্যতম মর্যাদাবোধও ছিল না; বরং হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর ছিল।

اِسْتِهْزَاء শব্দটির অর্থ : اِسْتِهْزَاء অর্থ– اِسْتِخْفَافٌ বা কাউকে তুচ্ছ সাব্যস্ত করা। سُخْرِيَّةٌ বা হাসি-ঠাট্টা করা। ইমাম গাযালীর (র.) -এর মতে اِسْتِهْزَاء অর্থ– অপমান করা, হালকা মনে করা, দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাস্য ভরে সম্বোধন করা। এটা ব্যক্তির কাজ বা কথার দ্বারাও হতে পারে আবার ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার ঠাট্টার ধরন : আল্লাহ তা'আলার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ মানায় না। তদুপরি আয়াতে উল্লেখ আছে হেতু মুফাস্‌সিরগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জবাব পাওয়া যায়। যেমন–

(১) আল্লাহ তাদের প্রতিফল দান করবেন।
(২) মুমিনদের সাথে ঠাট্টার প্রতিফল তাদের উপরই আপতিত হবে। তারা মুমিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
(৩) তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। এখানে ঠাট্টা হলো سَبَبٌ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা হলো مُسَبَّبٌ
(৪) আল্লাহ উভয় জাহানে তাদের সাথে ঠাট্টাকারীর ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করবেন। দুনিয়ার ঠাট্টার ধরন হলো, তারা নিফাক গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে তা উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন। পরকালের ঠাট্টা হবে এমন যে, মুনাফিকরা জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত পেয়ে তাতে প্রবেশের জন্য এগিয়ে আসবে; তখনি তাদের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আল্লাহ বিদ্রূপকারীর ন্যায় ব্যবহার করবেন।)
(৫) অথবা, আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন তিনি কিভাবে ঠাট্টা করবেন। আমরা বাহ্যিক শব্দের উপর ঈমান আনব, تَاوِيْل করার প্রয়োজন নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُخٰدِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُخَادَعَةُ মূলবর্ণ (خ ـ د ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা ধোঁকা দেয়।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) মাসদার اَلْاِيْمَانُ জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে/ বিশ্বাস করেছে।

مَايَخْدَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (خ ـ د ـ ع) মাসদার اَلْخَدْعُ জিনস صحيح অর্থ– তারা ধোঁকা দেয় না।

اَنْفُسَهُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَفْسٌ ; اَنْفُسَ মুযাফ هُمْ যমীর مضاف اليه অর্থ– তাদের আত্মাসমূহ, তাদের প্রাণ।

مَايَشْعُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ش ـ ع ـ ر) মাসদার اَلشُّعُوْرُ অর্থ– তাদের চেতনা নেই, তারা বুঝে না।

مُصْلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– সংশোধনকারীগণ।

اَلْمُفْسِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْسَادُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ د) জিনস صحيح অর্থ– দুষ্কৃতকারী, বিধ্বংসী।

لَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) মাসদার اَللِّقَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ– [যখন] তারা সাক্ষাৎ করে। যখন তারা মিলিত হয়। لَقُوْا মূলতঃ لَقِيُوْا ছিল তা'লীল হয়ে لَقُوْا হয়েছে।

قَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) মাসদার اَلْقَوْلُ জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলল।

يَسْتَهْزِئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, উপহাস করা।

يَمُدُّ : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে সুযোগ দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেতাদের ঔদ্ধতার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। يَمُدُّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঢিল দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْعَمَهُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা হয়রান ও পেরেশান হয় বা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله خَتَمَ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : এখানে خَتَمَ ফে'ল اللهُ হলো فاعل আর على হলো حرف جار এবং قُلُوْبِ হলো مضاف আর هِمْ হলো مضاف اليه অতএব مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হয়েছে। অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো خَتَمَ ফে'লের সাথে। ফে'ল ফায়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : এখানে وَّلَهُمْ -এর واو শব্দটি হলো حرف عطف আর ل শব্দটি حرف جار এবং هم শব্দটি مجرور অতএব جار এবং مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثابت শিবহে ফে'ল -এর সাথে। এখন শিবহে ফে'ল তার متعلق -কে নিয়ে شبه جملة হয়ে خَبَر مُقَدَّم হয়েছে। আর عَذَابٌ শব্দটি موصوف এবং عَظِيْمٌ শব্দটি صفت অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ হয়েছে। অতএব, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : এখানে ما পদটি مشبه بليس আর هم যমীর اسم ما আর بِمُؤْمِنِيْنَ হলো খবর।

قوله فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ এখানে فِيْ قُلُوْبِهِمْ হলো خبر مقدم আর مَّرَضٌ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قوله اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ : এখানে ان হলো حرف مشبه بالفعل আর هم যমীর ان-এর اسم আর هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ হলো خبر অতঃপর ان তার ইসম ও খবর নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

قوله فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا : এখানে زَادَ ফে'ল هُمُ যমীর اول مفعول به আর اَللّٰهُ হলো ফা'য়েল, مَرَضًا দ্বিতীয় মাফঊল। ফে'ল, ফা'য়েল এবং উভয় মাফঊল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة

قوله نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : এখানে نَحْنُ যমীর مبتدأ আর مُصْلِحُوْنَ হলো خبر;

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (١٦)

অনুবাদ : (১৬) তারা ঐ সমস্ত লোক যারা গ্রহণ করেছে গোমরাহী হেদায়েতের পরিবর্তে; সুতরাং তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা ঠিক পথে চলেনি।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (١٧)

(১৭) তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, যে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে অতঃপর যখন আগুন তার চারদিকের সবকিছু আলোকিত করল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিলেন তাদের আলো এবং তাদেরকে ফেললেন অন্ধকারে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (١٨)

(১৮) বধির, মূক, অন্ধ- কাজেই তারা আর ফিরবে না।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (١٩)

(১৯) অথবা এ মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ যেমন আসমান হতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়, তাতে অন্ধকারও আছে আর বজ্র ধ্বনি এবং বিদ্যুৎও আছে, এমতাবস্থায় যারা পথ চলে তারা গুজে দেয় নিজেদের অঙ্গুলিসমূহ নিজেদের কর্ণকূহরে, বজ্রনিনাদে মৃত্যুর ভয়ে; আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন কাফেরদেরকে সবদিক হতে।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٢٠)

অনুবাদ : (২০) মনে হয় যেন বিদ্যুৎ এখনই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়; যখনই তাদের উপর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হয়, তখন তার আলোকে তারা চলতে থাকে, আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তাদের কর্ণ ও চক্ষু সমস্তই কেড়ে নিতেন; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ তারা ঐ সমস্ত লোক যারা اشْتَرَوُا গ্রহণ করেছে الضَّلٰلَةَ গোমরাহী بِالْهُدٰى হেদায়েতের পরিবর্তে; فَمَا رَبِحَتْ সুতরাং লাভজনক হয়নি تِّجَارَتُهُمْ তাদের এই ব্যবসা وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ এবং তারা ঠিক পথে চলেনি।

(১৭) مَثَلُهُمْ তাদের অবস্থা كَمَثَلِ الَّذِى ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, اسْتَوْقَدَ نَارًا যে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে فَلَمَّآ اَضَآءَتْ অতঃপর যখন আগুন আলোকিত করল مَا حَوْلَهٗ তার চারদিকের সবকিছু ذَهَبَ اللّٰهُ এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিলেন بِنُوْرِهِمْ তাদের আলো وَتَرَكَهُمْ এবং তাদেরকে ফেললেন فِىْ ظُلُمٰتٍ অন্ধকারে لَّا يُبْصِرُوْنَ তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(১৮) صُمٌّ বধির بُكْمٌ মূক عُمْىٌ অন্ধ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ কাজেই তারা আর ফিরবে না।

(১৯) اَوْ অথবা এ মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ كَصَيِّبٍ যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে فِيْهِ ظُلُمٰتٌ তাতে অন্ধকারও আছে وَّرَعْدٌ আর বজ্র ধ্বনি وَّبَرْقٌ এবং বিদ্যুৎও আছে يَجْعَلُوْنَ এমতাবস্থায় যারা পথ চলে তারা গুজে দেয় اَصَابِعَهُمْ নিজেদের অঙ্গুলিসমূহ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ নিজেদের কর্ণকূহরে مِّنَ الصَّوَاعِقِ বজ্রনিনাদে حَذَرَ الْمَوْتِ মৃত্যুর ভয়ে; وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন সবদিক হতে بِالْكٰفِرِيْنَ কাফেরদেরকে।

(২০) يَكَادُ الْبَرْقُ মনে হয় যেন বিদ্যুৎ يَخْطَفُ এখনই তাদের কেড়ে নেয় اَبْصَارَهُمْ দৃষ্টিশক্তি كُلَّمَآ যখনই اَضَآءَ لَهُمْ তাদের উপর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হয়, مَّشَوْا فِيْهِ তখন তার আলোকে তারা চলতে থাকে وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে قَامُوْا তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন لَذَهَبَ তবে কেড়ে নিতেন بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ তাদের কর্ণ ও চক্ষু সমস্তই اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ সমস্ত বস্তুর উপর قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান।

(২১) হে মানবজাতি! তোমরা ইবাদত কর, তোমাদের প্রতিপালকের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, আশ্চর্য নয় তোমরা দোজখ হতে মুক্তি পাবে।	يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٢١)
(২২) তিনি এমন, যিনি করেছেন জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ, আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, উৎপন্ন করেছেন তা দ্বারা ফলসমূহ তোমাদের খাদ্যরূপে, অতএব, তোমরা কাউকেও আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করো না, তোমরা তো জান, বুঝ।	الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٢)
(২৩) আর যদি তোমরা সন্দিহান হও, আমার খাস বন্দার প্রতি অবতারিত কিতাবে, তবে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং ডেকে নাও, তোমাদের সাহায্যকারীদের, যারা আল্লাহ হতে পৃথক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٢٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) يَاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবজাতি! اعْبُدُوْا তোমরা ইবাদত কর, رَبَّكُمُ তোমাদের প্রতিপালকের الَّذِىْ خَلَقَكُمْ যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশ্চর্য নয় তোমরা দোজখ হতে মুক্তি পাবে।

(২২) الَّذِىْ جَعَلَ তিনি এমন, যিনি করেছেন لَكُمُ তোমাদের জন্য الْاَرْضَ জমিনকে فِرَاشًا বিছানাস্বরূপ وَّالسَّمَآءَ এবং আসমানকে بِنَآءً ছাদ স্বরূপ وَّاَنْزَلَ আর বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَاَخْرَجَ بِهٖ উৎপন্ন করেছেন তা দ্বারা مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলসমূহ رِزْقًا لَّكُمْ তোমাদের খাদ্যরূপে। فَلَا تَجْعَلُوْا অতএব তোমরা কাউকেও স্থির করো না لِلّٰهِ اَنْدَادًا আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ তোমরা তো জান, বুঝ।

(২৩) وَاِنْ كُنْتُمْ আর যদি তোমরা হও فِىْ رَيْبٍ সন্দিহান مِّمَّا نَزَّلْنَا অবতারিত কিতাবে عَلٰى عَبْدِنَا আমার খাস বন্দার প্রতি فَاْتُوْا তবে তোমরা রচনা কর بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ অনুরূপ একটি সূরা وَادْعُوْا এবং ডেকে নাও شُهَدَآءَكُمْ তোমাদের সাহায্যকারীদের مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ যারা আল্লাহ হতে পৃথক اِنْ كُنْتُمْ যদি তোমরা হও صٰدِقِيْنَ সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ الخ –১৯ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনা হতে দুজন মুনাফিক পলায়ন করে মক্কার দিকে চলে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টির বজ্র, গর্জন এবং বিদ্যুৎ তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উভয়ই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ চমকালে তারা কিছুদুর অগ্রসর হতো, আবার অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে যেতো। বজ্রের ভীষণ গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে কর্ণ-কুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাতো। অবশেষে ভীত হয়ে বলতে লাগল, যদি সকাল হয় এবং মেঘমালা চলে যায়, তবে আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুগত হয়ে যাব। কথামতো সকাল হতেই তারা হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের ঈমান নবায়ন করে নেয় এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। তাদের বর্ণনায় উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরিতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে-বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে জানানো হয়েছে যে, তাদের ব্যবসায়ের কোনো যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফর খরিদ করেছে।

১৭-২০ এই চার আয়াতে দুটি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণির লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণির লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছা করতো, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নাগালের ঊর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা–

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনো আছে : আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ পাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতি মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনো রয়েছে। যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবিদার, কিন্তু কার্যকলাপে তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য

আলোচ আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকিকতও প্রকাশ পায়। কেননা এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবি اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এবং কুরআনের পক্ষ হতে এই দাবির খণ্ডনে ঘোষিত وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে : যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কুরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণতঃ তারা ছিল ইহুদি। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্ম মতেও প্রমাণিত ছিল, তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর রিসালাত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি; বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও শেষবিচার দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কুরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোনো না কোনো প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা মুশরিকরাও তো কোনো না কোনো দিক দিয়ে আল্লাহকে মেনে নেয় এবং কোনো একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না; বরং একমাত্র সে ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যাতে আল্লাহর প্রতি তাঁর নিজের বর্ণনাকৃত সকল গুণাগুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনাকৃত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা

কুরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা বাকারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোনো ব্যক্তি কুরআনের বিষয়কে কুরআনের বর্ণনার বিপরীত পথে অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা– আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে নুবয়তে বিশ্বাস

করি, অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল ﷺ -এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করছে। তাই কুরআনের বর্ণনায় এদেরকেও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষকথা, যদি কোনা ব্যক্তি সাহাবীগণের ঈমানের পরিপন্থি কোনো বিশ্বাসের কোনো নতুন পথ ও মত তৈরি করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে, মুসলমানদের নামাজ রোজা ইত্যাদিতে শিরিকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের ভাষায় তাদেরকে মুমিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন : হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে কেবলা তাদেরকেই বলা হবে যারা দীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে স্বীকৃতি জানায়। কোনো একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখি হয়ে নামাজ পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ তারা সাহাবীগণের ন্যায় দীনের যাবতীয় জরুরিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানা মতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রোজ কিয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেত, কেননা এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ যা কোনো আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না– সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল : উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ এরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত; বরং তারা রাসূল ﷺ এবং মুমিনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহকেই ধোঁকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহর রাসূল বা কোনো ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহর সাথেই মন্দ আচরণ করে। প্রসঙ্গতঃ আল্লাহর রাসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহর সাথেই বে-আদবী করা হয়, এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাকই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যয়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই কুরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে ইরাশাদ করেছে– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ
অর্থাৎ মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর হেদায়েতকে মানা না মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কুরআনের মূল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে যাতে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তাওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

ناس [নাস] আরবি ভাষয় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণিই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে দূরে থাকা। –[রূহুল বয়ান পৃ. ৭৪] 'রব শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতঃপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে থেকে অন্য যে কোনো একটি ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবির সাথে দলিলও পেশ করা হয়েছে। কেননা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যতই মূর্খই হোক না কেন নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষকে এ অগণিত নিয়ামত না পাথর-নির্মিত কোনো মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোনো শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা আদৌ ইবাদতের যোগ্য নয়।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যটিতে لَعَلَّ শব্দ আশা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোনো কাজ হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কেনো কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না; বরং একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানিতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফিক হওয়া আল্লাহর মেহেরবানির নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন : ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদ বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদমাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা তাওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ। এ দুটি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোই হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারগতার আলোকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কুরআন নয়; বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদেরকে আরো সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে , যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু না, তা পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও যখন পারবে না। তখন দোজখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়; বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের ঊর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের ঊর্ধ্বে এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোজখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কুরআনুল কারীমকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা হিসেবে অভিহিত করে তাঁর রিসালাত ও সত্যবাদিতার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর মু'জিযার তো কোনো শেষ নেই এবং প্রত্যেকেটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কুরআন এবং মু'জিযা অন্যান্য নবী রাসূলগণের সাধারণ মু'জিযা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো তাঁদের জীবন কাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ : رَيْبٌ শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগেব ইসফাহানীর মতে رَيْبٌ এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কুরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও رَيْبٌ -এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা

অন্যান্য সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কুরআনের মু'জিযা রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতোই মু'জিযা সুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোনো জ্ঞানগুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কুরআনের সমতুল্য কোনো আয়াত ইতঃপূর্বেও কেউ তৈরি করতে পারেনি, এখনো কেউ পাবে না, আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরি করে দেখাও।

সুতরাং কুরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনোকালেই কোনো জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি চলমান দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। রাসূল ﷺ-এর যুগে যেমন এর নজির পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কুরআন : উপরিউক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কুরআনকে আর কি কারণে কুরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নজির পেশ করতে অপারগ?

দ্বিতীয়ত : মুসলমানদের এ দাবি যে, চৌদ্দশত বৎসরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কুরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোনো রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবির যথার্থতা কতটুকু এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

কুরআনের মু'জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণসমূহ : প্রথম কথা হচ্ছে যে, কুরআনকে মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নজির পেশ করতে অপারগ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব স্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হলো।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার মহান গ্রন্থটি কোন পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশ কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ নির্দেশ ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মতো কোনো সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যা দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলি থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা ওজর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল বাত্হা বা মক্কা নামে পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল এখানে কোনো কারিগরি শিল্প। আবহাওয়ায়ও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোনো বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোনো জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেত না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কেনো উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট ছাগল প্রতিপালন তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না। না ছিল কোনো স্কুল কলেজ, না ছিল কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মতো আবৃত হতো পথে প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক বিস্ময় আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোনো সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোনো মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোনো আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্ব ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে আমদানি-রপ্তানিই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহর পবিত্রতম কুরআন নাজিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতিম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে; মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ অসহায় এতিমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতো তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোনো সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে উম্মী তথা নিরক্ষর জাতি বলা হতো। কুরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালবধি যে কোনো ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কেনো জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সহচর্যে থেকে এমন কোনো জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কুরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্য সাধারণ মু'জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, তাই মামূলী একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোনো এলাকার লোকই কোনো না কোনো উপায়ে আয়ত্ব করতে পারে, তাও আয়ত্ব করার কোনো সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর উম্মী রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতে তিনি শিখেননি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনো দিন তিনি এধরনের কবি জলসায় শরিক হননি। জীবনেও কখনো একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চরিত্রমাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে আল-আমীন বলে অভিহিত করা হতো।

এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোনো দেশে ভ্রমণেও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন, তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুটি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোনো পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোনো মক্তবেও যাননি, কেনো কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কুরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করতো। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কুরআনের এ গুণগত মান মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়; বরং এ কুরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকেত, তবে এর নজির পেশ করে দেখাও।

একদিকে কুরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কুরআনকে অপরাজয়ের বলে বিবেচনা করতে যে কোনো সুস্থবিবেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোনো সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ : পবিত্র কুরআন ও কুরআনের নির্দেশাবলি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোনো জ্ঞান না থাকলেও ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারাবিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কুরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কুরআন যে আল্লাহর কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অর্ন্তগত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগুঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোনো অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার তা নয়; বরং রচনা শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশি উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে কোনো অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনো মতেই অসম্ভব হতো না; বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরি করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে,

কুরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবার নিশ্চুপ রয়ে গেল কয়েকটি বাক্যও তৈরি করতে পারল না।

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কুরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল ﷺ-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর প্রতি নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোমাদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার ওতবা ইবনে রাবী'আ সকলের প্রতিনিধিরূপে হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে রিবত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর উত্তরে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু কেউই কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না। তারা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি ছত্রও তৈরি করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্বের মাধ্যমে কুরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কুরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। এরূপ স্বীকৃতির পর কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী আবদে মুনাফের প্রতি বিদ্বেশবশতঃ কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরাইশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কুরআনকে অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নজির পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআন নাজিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ যখন মক্কায় আগমন করবে, তখন তারা রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্তায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশরা একটি বিশেষ পরামর্শসভার আয়োজন করলো। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সবাই তার নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। তারা বলল, এখন চারদিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বল যে, এ লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মতো প্রস্তাবে একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হওয়ার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কুরআনের অমীয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। – [খাসায়েসে কুবরা]

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে। কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহর কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহর কসম! তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ কোনো অবস্থাতেই তাদের মতো নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরো জেনে রেখ, আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা জাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোনো বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ব করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোনো সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনো কখনো তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন।

আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি। কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মতো কোনো লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবূ যর (রা.) বলেছেন, আমার ভাই আনীস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউ বা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিক্রম করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমি অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি। দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি। শেষ পর্যন্ত কা'বা প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে লোকের নিকট বললাম, আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক জাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর বাণীর মতো কোনো বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবূ জাহল, এবং আখনাস ইবনে শোরাইকা ও লোকচক্ষুর অগোচরে কুরআন শুনত, কুরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অন্যান্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবূ জাহল বলতো, তোমরা জান যে, বনী আবদে মুনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোনো কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর নিকট আল্লাহর বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করব, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনো তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা কুরআনের এ দাবি ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কুরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোনো না কোনো একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপরাগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কুরআন ও কুরআনের বাহক পয়গম্বরের বিরুদ্ধে জান মাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দুটি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি। এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণ্যবোধ ছিল। কুরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারল যে এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুয়েমীর মাধ্যমে কোনো বাক্য রচনা করে তা জনসমুক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। তারা জানত যে, আমরা যদি কোনো বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতিই চুপ করে ছিল। আর যারা কিছু ন্যায় পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহর কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রা.)-এর নিকট স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহর কালাম এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

তৃতীয় কারণ : তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন কিছুই গায়বি সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা– কুরআন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধ প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করল, এবং বাজীর

শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্য এ মাল গ্রহণ করেননি। কেননা এরূপ বাজী ধরা শরিয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ : চতুর্থ কারণ হচ্ছে, কুরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, শরিয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদি-খ্রিস্টানদের পণ্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল ﷺ -এর কোনো প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ছিল না। কোনো শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোনো কিতাব কোনোদিন স্পর্শও করেননি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরিয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহর কালাম ব্যতীত কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ : পঞ্চম কারণ হচ্ছে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব কথাই সত্য। এ কাজও আল্লাহ তা'আলারই কাজ, তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ষষ্ঠ কারণ : ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে, কুরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোনো সম্প্রদায় বা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয় তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে। وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا (তারা কখনো তা চাইবে না।)

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা কুরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কুরআনের ইরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। ইহুদিদের পক্ষে মৃত্যু কামনার [মোবাহালা] এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কুরআনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদি ও মুশরিকরা মুখে কুরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কুরআন সত্য, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি

সপ্তম কারণ : কুরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফের, সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুজুর ﷺ -কে মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তে শুনেন। হুজুর ﷺ যখন শেষ আয়াতে পৌছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা.) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কুরআন পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কুরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে–

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ - اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ

অর্থাৎ তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? কোনো কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি আমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ : অষ্টম কারণ হচ্ছে, কুরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতিই বেশি পাঠ করা যায়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভালো ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, বড় জোড় দু চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কুরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশি পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে।

নবম কারণ : নবম কারণ হচ্ছে, কুরআন ঘোষণা করেছে যে, কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কুরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাজিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘসময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী

পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে কুরআনের হাফেজ ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেম যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোনো ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কুরআনের মতো নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নজির স্থাপন করা তো অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অকে ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোনো ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কুরআনে যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের মুশরিকদের তুলায় কম ছিল এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কুরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এত প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কুরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ না করুন সারা বিশ্বে দাঁড়িয়ে থাকা কুরআনের লিখিত সবগুলো কপিও যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেজ একত্রে বসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল কুরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহর সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোনো সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোনো ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের ঊর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিযার পর কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়াতে কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণ : কুরআনে ইলম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোনো কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বপ্রকারের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়ও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এমনকি রাজীনিত, অর্থনীতিও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোনো আসমানি কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতঃদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সেসব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবন ধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোনো গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নজির আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেওয়ার নজিরও আর দ্বিতীয়টি নেই। সংক্ষেপে এই হচ্ছে কুরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোনো লোকই কুরআনের এ অনন্য সাধারণ মু'জিযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কুরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমন অনেক অমুসলিম লোকও কুরআনের এ নজিরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডা. মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কুরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন– 'নিশ্চয় কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনের যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আলাহর বাণী ব্যতীত অন্য কোনো বাণীতে তা থাকতে পারে না।

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কুরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খ্রিস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়নি।

মোটকথা, কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কুরআন আল্লাহরই কালাম এবং রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ– (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েতপ্রাপ্তগণ। সঠিক রাস্তায় চলে যারা। এটি كَانُوْا ফে'লের خبر হওয়াতে নসবের হালতে হয়েছে।

مَثَلُهُمْ : مَثَلُ মুযাফ هُمْ যমীর مضاف اليه শব্দটি একবচন, বহুবচন اَمْثَالٌ অর্থ– তাদের মতো।

اسْتَوْقَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْقَادُ মূলবর্ণ (و . ق . د) অর্থ– সে আগুন প্রজ্বলিত করল। সে আগুন জ্বালালো।

اَضَآءَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضَاءَةُ মূলবর্ণ (ض. و . ء) অর্থ তার চারপাশে আলোকিত করল। এটি লাযেম ও মুতা'আদ্দী উভয় অর্থে ব্যবহার হয়।

رَعْدٌ : গর্জন। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে رَعْدٌ এক ফেরেশতাদের নাম। যিনি মেঘকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান। [মাযহারী]।

بَرْقٌ : বিজলী, বিদ্যুৎ চমক। বহুবচন بُرُوْقٌ আসে। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মত হলো, আগুনের কড়ার চমক যার দ্বারা রা'দ ফেরেশতা মেঘমালা হাঁকায়। –[মাযহারী]

الصَّوَاعِقِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَاعِقَةٌ; অথ– গর্জন। বিজলীর শব্দ। বজ্রধ্বনি।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেষ্টনকারী।

الْكٰفِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ– কাফের।

يَكَادُ : এটি একটি فعل ناقص আর সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব كَادَ . يَكَادُ যা فعل يفعل -এর ওজন মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ (ك . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিকট হয়েছে।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و. ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা [জাহান্নাম] থেকে বেঁচে যাবে।

فَأْتُوْا : فَأْتُوْا -এর মধ্যে فاء টি حرف جزائية ; اِئْتُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– তোমরা নিয়ে আস। باء দ্বারা متعدى হওয়ার কারণে অর্থ হয়েছে নিয়ে আসা।

ادْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د . ع . و) অর্থ– ডাকা, আহবান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا الخ : এখানে مَثَلُهُمْ হলো مبتدأ আর كَمَثَلِ الخ হলো خبر আর لما হলো حرف شرط আর اَضَاءَتْ ফে'ল, ফায়েল, ও মাফঊল মিলে শর্ত।

قوله ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ : ذَهَبَ ফে'ল, اللهُ ফা'য়েল بِنُوْرِهِمْ হলো متعلق ফে'ল, ফায়েল ও متعلق মিলে جواب شرط হয়েছে।

قوله صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ : এখানে শব্দগুলো مرفوع হয়েছে। প্রত্যেকটি এক هُمْ উহ্য মুবতাদার তিন খবর হয়েছে। যথা– هُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ

قوله فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ : এখানে فاء টি عطف -এর জন্য আর هُمْ যমীর مبتدأ আর لَا يَرْجِعُوْنَ জুমলা হয়ে خبر, অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে معطوف হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللهَ হলো اسم ان আর عَلٰى হলো حرف جار আর كُلِّ شَىْءٍ হলো مجرور অতঃপর জার মাজরূর মিলে قَدِيْرٌ -এর متعلق আর قَدِيْرٌ হলো خبر এখানে اِنَّ তার اسم; خبر ও متعلق মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله حَذَرَ الْمَوْتِ : এটা يَجْعَلُوْنَ -এর مفعول له হয়েছে।

قوله يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ : এখানে يَكَادُ ফে'ল الْبَرْقُ হলো اسم আর يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ টি جمله হয়ে خبر অতঃপর جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَلَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ وَقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ ۚۖ اُعِدَّتۡ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۲۴﴾

অনুবাদ : (২৪) অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না, তবে তোমরা আত্মরক্ষা কর দোজখ হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, [তা] প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

وَبَشِّرِ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ؕ کُلَّمَا رُزِقُوۡا مِنۡهَا مِنۡ ثَمَرَةٍ رِّزۡقًا ۙ قَالُوۡا هٰذَا الَّذِیۡ رُزِقۡنَا مِنۡ قَبۡلُ ۙ وَاُتُوۡا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمۡ فِیۡهَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ٭ۙ وَّهُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۵﴾

(২৫) আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে তার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; যতবারই তাদেরকে উক্ত জান্নাত হতে কোনো ফল খেতে দেওয়া হবে, ততবারই তারা বলবে– এটা তো সেই খাদ্য যা ইতঃপূর্বে আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, বস্তুত প্রত্যেকবারই তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেওয়া হবে; আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-সাফ বিবিগণ। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسۡتَحۡیٖۤ اَنۡ یَّضۡرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوۡضَةً فَمَا فَوۡقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا فَیَعۡلَمُوۡنَ اَنَّهُ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ۚ وَاَمَّا الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فَیَقُوۡلُوۡنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ یُضِلُّ بِهٖ کَثِیۡرًا ۙ وَّیَهۡدِیۡ بِهٖ کَثِیۡرًا ؕ وَمَا یُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۲۶﴾

وقف لازم

(২৬) নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না যেকোনো উপমা বর্ণনা করতে- মশা-ই হোক বা তদপেক্ষা [ক্ষুদ্রতায়] অধিক হোক সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, যা-ই হোক না কেন তারা তো এটাই স্থির বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, আর যারা কাফের হয়েছে, সর্বাবস্থায় তারা এ কথাই বলবে, "এ সমস্ত নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর মতলবই বা কি?" তিনি বিপথগামী করে থাকেন এটা দ্বারা অনেককে এবং এটা দ্বারা হেদায়েত করেন অনেককে এবং এটা দ্বারা তিনি বিপথগামী করেন কেবল ফাসেকদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার। وَلَنۡ تَفۡعَلُوۡا এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না। فَاتَّقُوۡا তবে তোমরা আত্মরক্ষা কর النَّارَ দোজখ হতে الَّتِیۡ وَقُوۡدُهَا যার ইন্ধন হবে النَّاسُ মানুষ وَالۡحِجَارَةُ এবং পাথর اُعِدَّتۡ তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে لِلۡکٰفِرِیۡنَ কাফেরদের জন্য।

(২৫) وَبَشِّرِ আর আপনি সুসংবাদ দিন الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে اَنَّ لَهُمۡ নিশ্চয় তাদের জন্য جَنّٰتٍ এমন জান্নাত রয়েছে تَجۡرِیۡ প্রবাহিত হচ্ছে مِنۡ تَحۡتِهَا তার তলদেশ দিয়ে الۡاَنۡهٰرُ নহরসমূহ; کُلَّمَا যতবারই رُزِقُوۡا তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে مِنۡهَا উক্ত জান্নাত হতে مِنۡ ثَمَرَةٍ কোনো ফল। قَالُوۡا ততবারই তারা বলবে– هٰذَا الَّذِیۡ এটা তো সেই খাদ্য رُزِقۡنَا যা আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল مِنۡ قَبۡلُ ইতঃপূর্বে وَاُتُوۡا بِهٖ বস্তুত প্রত্যেকবারই তাদেরকে ফল দেওয়া হবে; مُتَشَابِهًا সাদৃশ্যপূর্ণ وَلَهُمۡ فِیۡهَاۤ আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে اَزۡوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ পাক-সাফ বিবিগণ। وَّهُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

(২৬) اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ لَا یَسۡتَحۡیٖۤ লজ্জাবোধ করেন না اَنۡ یَّضۡرِبَ বর্ণনা করতে مَثَلًا যে কোনো উপমা مَّا بَعُوۡضَةً মশা-ই হোক বা فَمَا فَوۡقَهَا তদপেক্ষা [ক্ষুদ্রতায়] অধিক হোক فَاَمَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا সুতরাং যারা ঈমান এনেছে فَیَعۡلَمُوۡنَ যা-ই হোক না কেন তারা তো এটাই স্থির বিশ্বাস করবে যে, اَنَّهُ الۡحَقُّ এ উপমা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে مِنۡ رَّبِّهِمۡ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। وَاَمَّا الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا আর যারা কাফের হয়েছে فَیَقُوۡلُوۡنَ সর্বাবস্থায় তারা এ কথাই বলবে مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ আল্লাহর মতলবই বা কি? بِهٰذَا مَثَلًا এ সমস্ত নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা یُضِلُّ بِهٖ তিনি বিপথগামী করে থাকেন এটা দ্বারা کَثِیۡرًا অনেককে وَیَهۡدِیۡ بِهٖ এবং এটা দ্বারা হেদায়েত করেন। کَثِیۡرًا অনেককে وَمَا یُضِلُّ بِهٖ এবং এটা দ্বারা তিনি বিপথগামী করেন না اِلَّا الۡفٰسِقِیۡنَ তবে কেবল ফাসেকদেরকে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ছিন্ন করে ঐ সব সম্বন্ধ যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে; তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।	الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٢٧)
(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহর না-শোকরী করছ অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন, শেষে তোমরা তাঁরই সমীপে নীত হবে।	كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٨)
(২৯) তিনি এমন যিনি তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করেছেন দুনিয়ার সবকিছু, অতঃপর মনঃসংযোগ করেন আসমানের প্রতি এবং তাকে যথাযথভাবে নির্মাণ করেন সাত আসমানরূপে; তিনি তো সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।	هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٩)

ع ٢ ٩

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) اَلَّذِيْنَ যারা يَنْقُضُوْنَ ভঙ্গ করে عَهْدَ اللّٰهِ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ তা দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর وَيَقْطَعُوْنَ এবং ছিন্ন করে ঐ সব সম্বন্ধ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ যা আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন اَنْ يُّوْصَلَ অবিচ্ছিন্ন রাখতে وَيُفْسِدُوْنَ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৮) كَيْفَ কেমন করে تَكْفُرُوْنَ তোমরা না-শোকরী করছ بِاللّٰهِ আল্লাহর وَكُنْتُمْ অথচ তোমরা ছিলে اَمْوَاتًا নির্জীব فَاَحْيَاكُمْ তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন ثُمَّ اِلَيْهِ শেষে তাঁরই সমীপে تُرْجَعُوْنَ তোমরা নীত হবে।

(২৯) هُوَ الَّذِيْ তিনি এমন যিনি خَلَقَ لَكُمْ তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করেছেন مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا দুনিয়ার সবকিছু ثُمَّ اسْتَوٰٓى অতঃপর মনঃসংযোগ করেন اِلَى السَّمَآءِ আসমানের প্রতি فَسَوّٰىهُنَّ এবং তাকে যথাযথভাবে নির্মাণ করেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানরূপে وَهُوَ তিনি তো بِكُلِّ شَيْءٍ সর্ববিষয়ে عَلِيْمٌ জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا الخ -٢٦ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত কাফেরদের একটি সন্দেহজনক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদে اَلنَّحْلُ (মধুমক্ষিকা), اَلْعَنْكَبُوْتُ (মাকড়সা), اَلنَّمْلُ (পিপীলিকা) ইত্যাদি সাধারণ নিকৃষ্ট প্রাণীর উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? কুরআন যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। আর আল্লাহ যেহেতু মহান, সেহেতু তাঁর উপমাগুলোও উঁচু মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনি সাধারণ দৃষ্টান্তসমূহ আল্লাহর পক্ষে দেওয়া যথোপযুক্ত হয়নি। এই ছিল কাফেরদের প্রশ্ন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ছোট বস্তুর উপমা কুরআনের বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করে না; বরং তা কালামের ফাসাহাত বা বাকশৈলীতাকে আরো বৃদ্ধি করে। তবে এ সকল উপমায় কাফেরদের সম্মানের ব্যাঘাত ঘটায় হেতু তারা বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নাবলি উত্থাপন করে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা.) বলেন, আয়াতে মূর্তিগুলোকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তা অবতীর্ণ হলে ইহুদিরা বলতে শুরু করল যে, এত ক্ষুদ্র জিনিস উপমার যোগ্য নয়। অপরদিকে اَلنَّاسُ ও اَلظُّلُمَاتُ اَلرَّعْدُ وَالْبَرْقُ এবং সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হলে আরবের মুশরিকরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করল। হযরত ইবনে মাসউদ ও কাতাদা (রা.) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। ফলকথা আলোচ্য আয়াতটি ইহুদি, কাফির এবং মুশরিকদের বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নোত্তরে অবতীর্ণ হয়। اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ দ্বারা ইহুদিদের চুক্তিভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাওহীদ এবং রিসালাতের সত্যতার উপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করা হয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ প্রেরিত হলে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا অথচ তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ এ ছাড়াও তারা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করত। يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যত্র আরো বলা হয়েছে যে, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ কিন্তু এ কাফেররা এসব ওয়াদা-অঙ্গীকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি; বরং উল্টো আল্লাহর জমিনে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করেছে।

আয়াতে বর্ণিত حِجَارَةٌ -এর অর্থ : حِجَارَةٌ শব্দের অর্থ পাথর। এখানে حِجَارَةٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে حِجَارَةٌ দ্বারা গন্ধকের কঠিন কালো বড় বড় দুর্গন্ধময় পাথর বুঝানো হয়েছে, যার আগুন তীব্র হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ পাথরগুলো আসমান-জমিন সৃষ্টির সাথে সাথে প্রথম আকাশে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রকার পাথর বুঝানো হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, حِجَارَةٌ দ্বারা সেসব মূর্তিকে বুঝায়, যেগুলো কাফেররা পূজা করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার উপাসনা কর, সেগুলো দোজখের ইন্ধন, আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে حِجَارَةٌ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য বুঝায়।

মানুষ ও পাথর উভয় দোজখের জ্বালানী হওয়ার কারণ : আয়াতে اَلنَّاسُ শব্দের অর্থ মানুষ। আর حِجَارَةٌ শব্দের অর্থ– পাথর। মানুষ ও পাথরের মাঝে পার্থক্য হলো, মানুষ বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন সচল প্রাণী, আর পাথর নির্জীব তথা জড় পদার্থ। এখন প্রশ্ন হলো মানুষের সাথে পাথরকে দোজখের জ্বালানী হিসেবে নির্দিষ্ট করার কারণ কি? এর জবাবে তাফসীরকারগণ বলেন–

১. যেহেতু মুশরিকরা পাথরকে নিজেদের পাশাপাশি রেখে ইবাদত করতো সেহেতু মানুষের সাথে পাথর উল্লিখিত হয়েছে।
২. মুশরিকরা পাথরের মূর্তি তৈরি করে প্রভু জ্ঞানে তার পূজা করতো। আর পাথর যে তাদেরকে আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না তা প্রমাণের জন্যই আল্লাহ ঐ সব মুশরিকের সাথে পাথরের মূর্তিও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।
৩. অথবা, পাথর জ্বলন্ত অগ্নিকে আরো প্রজ্বলিত ও দীর্ঘস্থায়ী করবে। তাই মানুষের সাথে পাথরকেও জাহান্নামে পাঠানো হবে।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পাথরের অগ্নির তীব্রতা বেশি, তাই কাফেরদের অধিক শাস্তির প্রতি দিক নির্দেশ করে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. অথবা, মুশরিকরা পাথরের তৈরিকৃত মূর্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতো, তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণের জন্য মানুষের সাথে পাথরের উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এতে পাথরের কোনো আজাব বা কষ্টও হবে না এবং পাথরের উপর অন্যায়ও করা হবে না।

حِجَارَةٌ -কে নির্দিষ্ট করণের কারণ : পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা তৈরি মাবুদকে এদের পূজারীদের সামনে জ্বালানীর মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এদের জ্বালানো হবে। অথবা, পাথরকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করলে আগুন অধিক প্রজ্বলিত হবে বিধায় তা করা হবে। আর এর দ্বারা পাথরের উপর অন্যায় করা হবে না।

بَشِّرْ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : بَشِّرْ হলো واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف এখানে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। অথবা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার মাধ্যমে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

تَبْشِيْر **অর্থ :** সুসংবাদ, এটা সাধারণত খুশির ব্যাপারে হয়ে থাকে, তবে কোনো কোনো সময় দুঃসংবাদের ক্ষেত্রেও تَبْشِيْر শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন– فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, খারাপের দিক সাথে সাথে উল্লেখ করতে হবে।

اَلْجَنَّة **-এর অর্থ :** اَلْجَنَّةُ একবচন; বহুবচন اَلْجَنَّاتُ ও اَلْجِنَانُ অর্থ– জান্নাত, উদ্যান। আরবদের মতে ঘন ছায়াদার খেজুর ও অন্যান্য বৃক্ষরাজির সমষ্টি যেখানে রয়েছে, তাকে جَنَّة বলে। اَلْجَنَّةُ শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে اَلسَّتْرُ ঢাকা বা আবৃত। তাই গাছপালা এবং লতাপাতা দ্বারা আবৃত স্থানকে اَلْجَنَّةُ বলে।

جنة **-এর শ্রেণিবিভাগ :** জান্নাত মোট আটটি (১) ফিরদাউস (২) আদ্‌ন (৩) জান্নাতুল মাওয়া (৪) জান্নাতুল খুল্‌দ (৫) দারুস সালাম (৬) দারুল মাকাম (৭) দারুল ক্বারার।

واتوا به متشابها **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ সাদৃশ্যপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবে। এর অর্থ এই যে, এদের প্রত্যেকটি বাহ্যত পূর্বটির অনুরূপ হবে এবং জান্নাতবাসীগণ মনে করবেন, এগুলো তো পূর্বেকার ফলের মতোই। বস্তুত জান্নাতীদের অত্যধিক স্বাদ ও তৃপ্তি পরিবর্তনের জন্যই এরূপ করা হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ফলসমূহের রস-স্বাদ পূর্ববর্তী ফলসমূহ হতে ভিন্ন রকমের হবে, যদিও সেগুলোর আকার-প্রকার একই ধরনের হবে। কাজেই এতে জান্নাতীদের জন্য নিত্য-নতুন উপভোগের আস্বাদ দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হবে।

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ **-এর মর্মার্থ :** اَزْوَاجٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন زَوْجٌ অর্থ– জোড়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের জন্যই এ শব্দ ব্যবহার হতে পারে। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী যাওজ এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামী যাওজ। জান্নাতে এ স্বামী-স্ত্রী পবিত্র সম্পর্কযুক্ত হবে, তবে উভয়কেই ঈমানদার ও সত্যবাদী হতে হবে। এ শব্দটি হুর-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

مُطَهَّر দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা মাসিক স্রাব, পায়খানা, প্রস্রাব, কফ ও থুথু ইত্যাদি হতে পবিত্রা। সাথে সাথে তারা এমন অবস্থা হতেও পবিত্র, যা স্ত্রীদের মধ্যে খারাপ ও দূষণীয় মনে করা হয়।

উপমার ক্ষেত্রে কোনো তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোনো নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোনো ক্রটি বা অপরাধ নয় কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থিও নয়। কুরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলিতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মিলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কুরআন হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ [আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে–] এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ [এবং আল্লাহ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে]। এতে বুঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরিয়ত আচ্ছন্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার উপরই নির্ভরশীল। এজন্য وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ [তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে] বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ হলো যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ। اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ [তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।] এ বাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লিখিত নির্দেশাবলি অমান্য করবে, তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় নয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অগণিত দয়া ও সুখ সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু

স্বীকার কতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা– প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অণুকণা, পরে তাতে আল্লাহ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যা দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

وَجْهُ نَصْبِ بَعُوْضَةً : بَعُوْضَةً নসববিশিষ্ট হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

(১) مَا অতিরিক্ত এবং بَعُوْضَةً বদল হয়েছে مَثَلًا হতে। (২) مَا টি نكره এটি مَثَلًا হতে বদল হয়ে মানসূব হয়েছে। (৩) আর بَعُوْضَةً পূর্ববর্তী مَا-এর সিফাত হওয়ায় মানসূব হয়েছে। (৪) يَضْرِبَ ক্রিয়াটি يَجْعَلَ -এর অর্থ দেয়। এমতাবস্থায় بَعُوْضَةً শব্দটি مفعول ثانى।

فَمَا-এর মধ্যকার مَا ও فَاء-এর অর্থ : فَاء টি এখানে اِلٰى অথবা حَتّٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ما এখানে অতিরিক্ত। অথবা, فَاء তারতীব অর্থে, আর مَا আতফ হয়েছে بَعُوْضَةً-এর উপর। তখন ইসম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অথবা, مَا কে موصولة বা موصوفة উভয় প্রকার বলা যায়।

فَمَا فَوْقَهَا-এর অর্থ : فَمَا فَوْقَهَا-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

ক. পরিমাণের দিক থেকে এর চেয়ে বড়। যেমন– মাছি, মাকড়সা। কেননা সমকালীন কাফেররা উক্ত বস্তুসমূহের উপমাকে অস্বীকার করেছিল।

খ. মশার চেয়ে অধিক ছোট। এ অর্থটি এখানে বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা উপমা উপস্থাপন দ্বারা প্রতিমাগুলোর অপমান উদ্দেশ্য। তাই مشبه به যত ছোট এবং নিকৃষ্ট হবে উদ্দেশ্য তত বেশি ফলপ্রসূ হবে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ-এর মর্মার্থ : فَتْحُ الْقَدِيْرِ গ্রন্থকারের মতে يُضِلُّ-এর অর্থ হলো يَخْذِلَ অর্থাৎ বিভিন্ন ছোট ছোট উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদেরকেই নিরাশ করেন বা পরিত্যাগ করেন।

কারো মতে ضَلَالٌ-এর অর্থ ঠিক থাকবে। তবে অর্থ হবে এভাবে, যেহেতু আল্লাহ প্রত্যেক কর্মের سبب সেহেতু ضَلَالٌ-এর নিসবত তার প্রতি করা হয়েছে। মূলত তিনি কাউকেও বিপথগামী করেন না; বরং তাদের হঠকারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহর নির্দেশের রীতিমতো লঙ্ঘনের দ্বারা সত্য উপলব্ধি ও তার গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে, ফলে তারা নিজেরাই ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে গেছে।

اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ-এর মর্মার্থ : اَلْفَاسِقِيْنَ শব্দটি فِسْقٌ থেকে নির্গত। শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْقَصْدِ মিতাচারিতা থেকে বের হয়ে যাওয়া। যেমন কবি রাউবাহ -এর উক্তি– فَوَسَقَا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرًا অর্থাৎ 'আলোচিত রমণীরা চরিত্রগত মিতাচারিতা-বহির্ভূত ও সীমালঙ্ঘনকারিণী।

শরিয়তের পরিভাষায় فَاسِقْ বলা হয়– اَلْخَارِجُ عَنْ اَمْرِ اللّٰهِ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তি। এর তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

(ক) دَرَجَةُ التَّغَابِىْ তথা কবীরা গুনাহকে মন্দ জেনে করতে থাকে, প্রায়ই তা করা।

(খ) دَرَجَةُ الْاِنْهِمَاكِ তথা বেপরোয়াভাবে কবীরা গুনাহ করতে থাকা।

(গ) دَرَجَةُ الْجُحُوْدِ তথা কবীরা গুনাহকে সঠিক জেনে তা করতে থাকা।

প্রথম দু'টি স্তরে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না। কিন্তু তৃতীয় স্তরে পৌঁছলে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় স্তরকেই বুঝানো হয়েছে, তাই এর তাফসীরে বলা হয়েছে– اَلْخَارِجُ عَنِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তিগণ। যেমন– আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের ব্যাপারে বলেছেন– اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

–বায়াযাবী

عَهْدَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : عَهْد শব্দের অর্থ হলো–দৃঢ় অঙ্গীকার। আয়াতে عَهْد দ্বারা কোন অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন–

১. এখানে عَهْد দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা গৃহীত অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। আর এ জ্ঞানলব্ধ অঙ্গীকার বান্দার উপর আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে প্রমাণ। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

২. অথবা, রাসূলগণের মাধ্যমে স্ব স্ব উম্মত থেকে গৃহীত সেই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তীতে তাদের নিকট যে কোনো নবী সত্য নিয়ে আগমন করবেন, তাঁকে যেন বিশ্বাস করে এবং তাঁর অনুসরণ করে। তবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

৩. কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার তিন প্রকার :

(ক) আলমে আরওয়াহে তথা আধ্যাত্মিক জগতে সমস্ত আদম সন্তান কর্তৃক আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের অঙ্গীকার। (খ) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবীদের থেকে দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গৃহীত অঙ্গীকার। (গ) আল্লাহ কর্তৃক ওলামায়ে কেরাম থেকে সত্যকে বর্ণনা করার এবং গোপন না করার ব্যাপারে গৃহীত অঙ্গীকার।

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহ যোগসূত্র রক্ষার আদেশ করেছেন। তা ছিন্ন করার অর্থ এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করা যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। যেমন– মানবতা ভিত্তিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব থেকে অনীহা পোষণ করা, নবীদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা, কিতাবসমূহের বিশ্বাসে পার্থক্য করা, মু'মিনদের দল ত্যাগ করা ইত্যাদি।

অথবা, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, এমন অন্যায়মূলক আচরণ করা যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করে।

مِيْثَاق দ্বারা উদ্দেশ্য : কসম সম্বলিত অঙ্গীকার বা সুদৃঢ় চুক্তি। مِيْثَاقٌ শব্দটি اَلْوَثَاقَةُ থেকে নির্গত। যার অর্থ–দৃঢ়ভাবে বাঁধা বা গিট দেওয়া। এখানে সুদৃঢ় অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন বস্তুর সাথে মিল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : নিম্নোক্ত বিষয়ে যোগসূত্র রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন– (১) আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা। (২) কথা ও কাজের মিল রাখা। তথাপিও তারা কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি; বরং তারা মুখে বলে বেড়াতো, কিন্তু কাজে বাস্তবায়িত করতো না। (৩) কারো মতে تصديق তথা সত্যায়ন করাকে সকল নবীদের সাথে মিলানোর নির্দেশ। কিন্তু তারা কিছু নবীর সত্যায়ন করে আর কিছু নবীকে অস্বীকার করেছে। (৪) কারো মতে এর দ্বারা আল্লাহর দীন এবং জমিনে তাঁর ইবাদত প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

خَاسِرِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, خُسْرَانٌ শব্দটি যখন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হবে কুফর। আর যখন মুসলমানের প্রতি নিসবত করা হয় তখন পাপ বা অন্যায় অর্থ গ্রহণ করা হয়। ইবনে জারীর বলেন, اَلْخَاسِرِيْنَ শব্দটি خَاسِرٌ-এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার মাধ্যমে যারা নিজেদের নফসের অধিকারকে নষ্ট করে ফেলে তাদেরকে اَلْخَاسِرُوْنَ বলা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে خَاسِرٌ বলা হয়। এমনিভাবে মুনাফিক এবং কাফের আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। –ইবনে কাছীর

مِيْثَاقٌ ও عَهْد -এর মধ্যকার পার্থক্য : কোনো বিষয়ে দু'পক্ষের পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে عهد বলে। আর এ কৃত চুক্তি যথাযথ পালনের মাধ্যমে সুদৃঢ় করাকে مِيْثَاقٌ বলে।

قوله وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ : এখানে তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে اَمْوَاتٌ শব্দটি مَيْتٌ-এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে مَيْتٌ বলা হয়। আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ সেসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

قوله ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ [অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।] অর্থাৎ যিনি তোমাদের ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অণুকণা সমন্বয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হলো তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের, নিস্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুতঃ তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই, মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোনো জীবন নয়; বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতোই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

قوله هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا: [তিনিই সে মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন] এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে, বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ-পত্র বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের্য্যর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের কোনো বস্তুই অহেতুক নয় : বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না।– তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসিরি মানুষের আহার ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে। অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোনো না কোনো দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তা দ্বারা তারা উপকৃত হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক, আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই যেসব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেসব বস্তুর অম্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ **তথা সপ্ত আকাশের নাম :** সপ্ত আকাশের সাতটি স্তরের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১। رَقِیْعٌ (রাকী') এটা সবুজ যমরুদ পাথর দ্বারা নির্মিত।
২। اَرْفَلُوْن (আরফালুন) এটা সাদা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত।
৩। قَیْدُوْم (কায়দূম) এটা লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরি।
৪। مَاعُوْن (মাউন) এটা সাদা রৌপ্যের তৈরি।
৫। رِبْقَاء (রাবকা) এটা লাল স্বর্ণের তৈরি।
৬। وَقْنَاء (ওয়াকানা) এটা হলুদ ইয়াকুত পাথরের তৈরি।
৭। عَرُوْبَاء (আরুবা) এটা উজ্জ্বল নূরের তৈরি।

خَلَقَ **ও** جَعَلَ **-এর পার্থক্য :** خَلَقَ শব্দের অর্থ : আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পৃথিবীর যে কোনো জিনিসের সৃষ্টি। সুতরাং خَلَقَ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে خَاصّ, আর جَعَلَ শব্দের অর্থ করা, সৃষ্টি করা। এ শব্দটি عَامّ কেননা خَلَقَ সৃষ্টিগত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে جَعَلَ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

اِسْتَوٰی **-এর অর্থ :** আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ অর্থাৎ অতঃপর তিনি মনোযোগ দেন আকাশের প্রতি। اِسْتَوٰی -এর আভিধানিক অর্থ হলো– اَلْاِعْتِدَالُ বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, اَلْاِسْتِقَامَةُ বা দৃঢ় থাকা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া এ শব্দটি اِرْتِفَاعٌ তথা উঁচু বা উর্ধ্বে তুলে ধরা, اَلْعُلُوُّ বা কোনো বস্তুর উপর আরোহণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কারো মতে, এ শব্দটি مُتَشَابِهَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের মতে, এ ধরনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়; বরং শুধু ঈমান রাখবে যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।–[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম মালেক (র.) বলেন, اِسْتِوَاء অর্থ তো জানা আছে, কিন্তু كَيْفِيَّتْ (ধরন বা প্রকার) জানা নেই। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা বিদ'আত। ঈমান আনা ওয়াজিব।

তবে কেউ বলেছেন, স্থানভেদে অর্থ পরিগ্রহণ করা হবে। অতএব কোথাও ইচ্ছা করা, কোথাও স্থান গ্রহণ করা কোথাও কায়েম হওয়া, কোথাও নিজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া, কেথাও কিছুর উপর আরোহণ করা ইত্যাদি অর্থ নিতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

مُتَشَابِهًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش ـ ب ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– অবিকল। যা সাদৃশ্য রাখে।

اَزْوَاجٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন زَوْجٌ; অর্থ স্ত্রীগণ زَوْج শব্দ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়।

مُّطَهَّرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْهِيْرُ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রত্যেক প্রকারের নারীসূলভ, দৈহিক এবং আত্মিক অপবিত্রতা হতে যাকে পবিত্র করা হয়েছে যাকে।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরস্থায়ীগণ, যারা সর্বদা বর্তমান।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা কুফরি করেছে।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলে, তারা বলবে, তারা বলত ইত্যাদি।

اَرَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) মাসদার اَلْاِرَادَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– সে চেয়েছে, ইচ্ছা করেছে।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضار معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– হেদায়েত করেন।

الْفٰسِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– নাফরমান লোকগণ, অবাধ্যতাকারী লোকজন।

يُّوْصَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ل) মাসদার اَلْاِيْصَالُ জিনস مثال واوى অর্থ– অক্ষুণ্ন রাখা হয়, যে সম্পর্ক জোড়া লাগানো হয়।

يُفْسِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ د) মাসদার اَلْاِفْسَادُ জিনস صحيح অর্থ– তারা সন্ত্রাস ছড়ায়, ধ্বংস ক্রিয়া চালায়।

يُمِيْتُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) মাসদার اَلْاِمَاتَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন।

يُحْيِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মূলবর্ণ (ح ـ ي ـ ي) মাসদার اَلْاِحْيَاءُ জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেন।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) মাসদার اَلرُّجُوْعُ জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

اسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– মনঃসংযোগ করেন।

سَوّٰهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْوِيَةُ মূলবর্ণ– (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি তাকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। যথাযথ সৃষ্টি করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে وَبَشِّرِ ফে'ল ফা'য়েল اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল اٰمَنُوْا ও عَمِلُوْا সিলাহ। موصول ও صله মিলে হলো مفعول -এর بَشِّرِ। ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ : এখানে وَلَهُمْ হলো خبر مقدم আর اَزْوَاجٌ হলো موصوف আর مُّطَهَّرَةٌ হলো صفة এবার صفة ও موصوف মিলে مبتدأ مؤخر হয়েছে। আর فِيْهَا উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, حال হয়েছে। এবার مبتدأ مؤخر ও خبر مقدم মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : এখানে هُمْ যমীর مبتدأ আর فِيْهَا হলো متعلق আর خَالِدُوْنَ হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً الخ : এখনে اِنَّ পদটি حرف مشبه بالفعل আর الله পদটি اسم ان আর لَا يَسْتَحْيٖٓ তার পরবর্তী অংশসহ খবর اِنَّ আর اَنْ يَّضْرِبَ বাক্য হয়ে يَسْتَحْيٖ এর مفعول به যদি তা সরাসরি متعدى হয়, আর যদি তা منصوب بنزع الخافض হয়, তাহলে مَثَلًا পদটি اَنْ يَّضْرِبَ-এর مفعول বিধায় মানসূব হয়েছে। مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً الخ আয়াতে প্রথম ما টি نكره ما এর পরবর্তী শব্দ দ্বারা তার صفة আনা হয়। তাবে পরবর্তী صفة কখনো جملة হয়ে থাকে। فَمَا فَوْقَهَا-কে- بَعُوْضَةً-এর উপর عطف করা হয়েছে। এই مَا টি موصوفة -ও হতে পারে আবার ما موصولة ও হতে পারে। এটা محلا منصوب হয়েছে।

قوله اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : এখানে اِلَيْهِ জার মাজরূর মিলে تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق مقدم অতঃপর تُرْجَعُوْنَ ফে'ল, ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ : এখানে فَا হলো حرف عطف আর سَوّٰى ফে'ল-ফা'য়েল, هُنَّ হলো مفسر, سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হলো তাফসীর। তাফসীর ও মুফাস্সার মিলে মাফউল। ফে'ল ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে। আর এ তারকীবটি এভাবেও করা যায়– سَوّٰى যদি خَلَقَ অর্থে হয়, তাহলে سَبْعَ سَمَاوَاتٍ হবে حال আর যদি صر অর্থে হয়, তাহলে হবে مفعول ثانى [اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ]

قوله وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : এখানে واو হরফে আত্ফ, هو হলো مبتدأ আর بِكُلِّ شَيْءٍ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম হলো عَلِيْمٌ শিবহে ফে'লের সাথে। عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে خبر অতঃপর মুবতাদা আর খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩০) আর যখন বললেন আপনার প্রভু ফেরেশতগণকে, নিশ্চয় আমি বানাব ভূপৃষ্ঠে একজন প্রতিনিধি; তারা বলল, আপনি কি সৃষ্টি করবেন জমিনে এমন লোক যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে ও রক্তারক্তি করবে? পরন্তু আমরা সর্বদা তাসবীহ পাঠ করছি আপনার প্রশংসার সাথে এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি; আল্লাহ বললেন, আমি তা জানি যা তোমরা জান না।	وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٠)
(৩১) আর আল্লাহ জ্ঞান দিলেন আদমকে সকল বস্তুর নামের। অনন্তর পেশ করলেন তা ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, তোমরা আমার নিকট এ সমস্ত বস্তুর নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (٣١)
(৩২) ফেরেশতারা বলল, আপনি অতি পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নেই, কেবল ততটুকুই আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী– বড় হিকমতময়।	قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (٣٢)
(৩৩) আল্লাহ বললেন, হে আদম! বলে দাও তাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিসের নাম, অনন্তর যখন আদম তাদেরকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি অবগত আছি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় আসমান ও জমিনের এবং জ্ঞাত আছি যা তোমরা ব্যক্ত কর আর যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।	قَالَ یٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَاِذْ قَالَ আর যখন বললেন رَبُّكَ আপনার প্রভু لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতগণকে اِنِّیْ جَاعِلٌ নিশ্চয় আমি বানাব فِی الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে خَلِیْفَةً একজন প্রতিনিধি قَالُوْٓا তারা বলল اَتَجْعَلُ আপনি কি সৃষ্টি করবেন فِیْهَا জমিনে مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا এমন লোক যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ও রক্তারক্তি করবে? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ পরন্তু আমরা সর্বদা তাসবীহ পাঠ করছি بِحَمْدِكَ আপনার প্রশংসার সাথে وَنُقَدِّسُ لَكَ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি قَالَ আল্লাহ বললেন اِنِّیْٓ اَعْلَمُ আমি জানি مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যা তোমরা জান না।

(৩১) وَعَلَّمَ আর আল্লাহ জ্ঞান দিলেন اٰدَمَ আদমকে الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا সকল বস্তুর নামের ثُمَّ عَرَضَهُمْ অনন্তর পেশ করলেন তা عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের সামনে فَقَالَ এবং বললেন اَنْۢبِـُٔوْنِیْ তোমরা আমার নিকট বল بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ এ সমস্ত বস্তুর নাম اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৩২) قَالُوْا ফেরেশতারা বলল سُبْحٰنَكَ আপনি অতি পবিত্র لَا عِلْمَ لَنَآ আমাদের জ্ঞান নেই اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا কেবল ততটুকুই আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী– الْحَكِیْمُ বড় হিকমতময়।

(৩৩) قَالَ আল্লাহ বললেন یٰٓاٰدَمُ হে আদম! اَنْۢبِئْهُمْ বলে দাও তাদেরকে بِاَسْمَآئِهِمْ ঐ সমস্ত জিনিসের নাম فَلَمَّآ অনন্তর যখন اَنْۢبَاَهُمْ আদম তাদেরকে বলে দিলেন بِاَسْمَآئِهِمْ সমস্ত জিনিসের নাম قَالَ তখন আল্লাহ বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে اِنِّیْٓ اَعْلَمُ নিশ্চয় আমি অবগত আছি غَیْبَ সমস্ত অদৃশ্য বিষয় السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَاَعْلَمُ এবং জ্ঞাত আছি مَا تُبْدُوْنَ যা তোমরা ব্যক্ত কর وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আর যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩৪) আর আমি যখন হুকুম দিলাম ফেরেশতাদেরকে সেজদায় পতিত হও আদমের সামনে, তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো ইবলীস ব্যতীত; সে অমান্য করল, অহংকৃত হলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٣٤)
(৩৫) আর হুকুম দিলাম, হে আদম! বাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে এবং খাও উভয়ে তা হতে স্বচ্ছন্দে ও যথেচ্ছা, আর যেও না এ বৃক্ষের কাছে, অন্যথা তোমরাও পরিগণিত হবে জালেমদের মধ্যে।	وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣٥)
(৩৬) অনন্তর পদস্খলিত করল শয়তান আদম ও হাওয়াকে ঐ বৃক্ষের কারণে, অতঃপর বহিষ্কৃত করে ছাড়ল তাদেরকে সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন, অনন্তর আমি বললাম, নিচে নেমে যাও, তোমাদের কতিপয় কতিপয়ের শত্রু থাকবে, আর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের কিছুকাল অবস্থান করতে হবে এবং ফায়েদা উঠাতে হবে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।	فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٣٦)
(৩৭) অতঃপর আদম (আ.) লাভ করলেন স্বীয় প্রভু হতে [ক্ষমা প্রার্থনাসূচক] কতিপয় বাক্য তখন আল্লাহ কৃপা-দৃষ্টি করলেন তার প্রতি; নিশ্চয় তিনি বড় তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।	فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٣٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَاِذْ قُلْنَا আর আমি যখন হুকুম দিলাম لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদেরকে اسْجُدُوْا সেজদায় পতিত হও لِاٰدَمَ আদমের সামনে, فَسَجَدُوْٓا তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اَبٰى সে অমান্য করল وَاسْتَكْبَرَ অহংকৃত হলো وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

(৩৫) وَقُلْنَا আর হুকুম দিলাম يٰٓاٰدَمُ হে আদম! اسْكُنْ বাস কর اَنْتَ তুমি وَزَوْجُكَ এবং তোমার স্ত্রী الْجَنَّةَ জান্নাতে وَكُلَا এবং খাও উভয়ে مِنْهَا তা হতে। رَغَدًا স্বচ্ছন্দে حَيْثُ شِئْتُمَا ও যথেচ্ছা, وَلَا تَقْرَبَا আর কাছে যেও না هٰذِهِ الشَّجَرَةَ এ বৃক্ষের فَتَكُوْنَا অন্যথা তোমরাও পরিগণিত হবে مِنَ الظّٰلِمِيْنَ জালেমদের মধ্যে।

(৩৬) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ অনন্তর পদস্খলিত করল শয়তান আদম ও হাওয়াকে عَنْهَا ঐ বৃক্ষের কারণে فَاَخْرَجَهُمَا অতঃপর বহিষ্কৃত করে ছাড়ল তাদেরকে مِمَّا كَانَا فِيْهِ সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন وَقُلْنَا অনন্তর আমি বললাম। اهْبِطُوْا নিচে নেমে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ তোমাদের কতিপয় কতিপয়ের থাকবে, عَدُوٌّ শত্রু وَلَكُمْ আর তোমাদের করতে হবে فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে مُسْتَقَرٌّ কিছুকাল অবস্থান وَّمَتَاعٌ এবং ফায়েদা উঠাতে হবে اِلٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

(৩৭) فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ অতঃপর আদম (আ.) লাভ করলেন مِنْ رَّبِّهٖ স্বীয় প্রভু হতে [ক্ষমা প্রার্থনাসূচক] كَلِمٰتٍ কতিপয় বাক্য فَتَابَ তখন আল্লাহ কৃপা-দৃষ্টি করলেন عَلَيْهِ তার প্রতি اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি هُوَ التَّوَّابُ বড় তওবা কবুলকারী الرَّحِيْمُ পরম দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ الخ -٣٤ আয়াতের শানে নুযূল : মহান রাব্বুল আ'লামীন তাঁর আহ্কাম কার্যকর করানোর জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মর্যাদা সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে ফেরেশ্তাদেরকে সেজদা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ সবাই সেজদা করলেও ইবলীস অহংকার করে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেনি। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত অবস্থায় বেহেশ্ত থেকে বের করে দিলেন। তখন থেকেই ইবলীস হযরত আদম (আ.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করার প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশতে থাকতে দেবে না। এমনকি সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ গ্রহণ করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং ইবলীস হযরত আদম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার জন্য কি পদ্ধতি নিল এবং ফল কি দাঁড়ালো ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ ও ইবলিসের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন সৃষ্টির পর পৃথিবীতে জিন জাতিকে বসবাস করতে দেন। ফেরেশতাকুলের আবাস নির্ধারিত হয় আসমানে। জিন জাতি হাজার হাজার বছর যাবৎ পৃথিবীতে বসবাস করে। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া, ফ্যাসাদ, কলহ আরম্ভ হয়। পরিণতিতে শুরু হয় রক্তপাত।

আল্লাহ তা'আলা ফেতনা সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার নিমিত্তে ইবলিসের নেতৃত্বে একদল ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। ইবলিস ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে জিন জাতিকে মেরে; পিটিয়ে সাগরে ও পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ফেরেশতারা বসবাস করতে শুরু করে।

যখন আদম সৃষ্টির কথা তারা অবগত হয়, তখন জিন জাতির অবস্থা অনুমান করে বলতে থাকে আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটাবে? আমরা তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার চারটি মৌলিক বস্তুর সমন্বয়ে (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) স্বীয় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতম আকৃতিতে আদম দেহ নির্মাণ করে তাতে আত্মার সঞ্চারিত করেন। এতে হযরত আদম (আ.) জীবিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.)-কে জাগতিক সকল জিনিসের নাম শিক্ষা প্রদান করতঃ উক্ত জিনিসগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং সেগুলোর নাম বলতে নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতাগণ লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক বললেন, হে প্রভু আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ঐ বস্তুগুলোর নাম বলতে আদেশ করলেন। হযরত আদম (আ.) সবগুলোর নাম বলে দিলেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাকে সম্মানসূচক সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করেন। একমাত্র ইবলিস ব্যতীত বাকি সবাই আল্লাহর আদেশ পালন করলেন।

আগুনের তৈরি ইবলিস মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করতে অহংকারের সাথে অস্বীকার করল এবং তা অমান্য করার কারণে অভিশপ্ত ও বিতারিত শয়তানে রূপান্তরিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সুখ শান্তি বর্ধনের জন্য তদীয় বাম পাঁজর থেকে বিবি হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে উভয়ের বিবাহ দেন। বেহেশতে শর্তসাপেক্ষে তাদের থাকার নির্দেশ জারি করেন। শর্ত হলো ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সুখ শান্তি দর্শনে ইবলিস তাদের পেছনে লেগে নানারকম প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করার ফন্দি আঁটে এবং আদম ও হাওয়া (আ.)-কে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে প্ররোচনা দেয়। শয়তানের দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে প্রথমে বিবি হাওয়া (আ.) প্ররোচিত হয়ে হযরত আদম (আ.)-কেও সে প্ররোচনায় জড়িয়ে ফেলেন। হযরত আদম (আ.) প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও পরে আল্লাহর কসম মিথ্যা হতে পারে না ভেবে ঐ ফল ভক্ষণ করেন। এ ভ্রমের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতী আবরণ থেকে মুক্ত করেন এবং শর্ত মোতাবেক দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীতে তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় অবস্থিতি এবং ভোগ সম্পদ নির্ধারিত করলেন। হযরত আদম (আ.) যারপর নাই অনুশোচনা ও অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে সদা অশ্রু বিসর্জনপূর্বক তার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। দয়াময় আল্লাহ তার অপার করুণায় আদম ও হাওয়া (আ.)-এর অপরাধ মার্জনা করে দেন; কিন্তু সে বেহেশতে আর স্থান দেওয়া হয় নি।

مَلَائِكَة দ্বারা উদ্দেশ্য : مَلَائِكَة শব্দটি বহুবচন, একবচন مَلَكٌ শব্দটির অর্থ– বাণীবাহক। শাব্দিক অর্থ হলো ফেরেশতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদি সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত চিরানুগত এক সম্প্রদায়। তারা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তাদের দেহাকৃতি উজ্জ্বল। বায়বীয় আহার, নিদ্রা অথবা শয়তানের প্ররোচনাজনিত কোনো ক্রোধ, লোভ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, সর্বদা মহান আল্লাহর প্রশংসা, কীর্তন ও বিশ্বজগত পরিচালনের তাঁর আদেশ নির্দেশের অনুসরণই তাদের কাজ।

خَلِيْفَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : খলীফা অর্থ নায়েব বা প্রতিনিধি। এখানে খলীফা দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তিনি আল্লাহর হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধি।

অথবা, خَلِيْفَة অর্থ– পরিবর্তন, যেহেতু হযরত আদম (আ.) জিন জাতির পরিবর্তে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

অথবা, আদম সন্তানরা একে অন্যের স্থলবর্তী হবে, এজন্য তাদেরকে খলীফা বলা হয়েছে। মূলকথা হলো যেহেতু আদম (আ.) শরিয়তের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা ও শাস্তি নির্ধারণে আল্লাহর প্রতিনিধি, সেহেতু তাকে خَلِيْفَة বলা হয়েছে।

خَلِيْفَة শব্দের তাৎপর্য : خَلِيْفَة তাকে বলা হয়, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা এখতিয়ার ব্যবহার করে। খলীফা কখনো মালিক হতে পারে না। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা ও বাসনা পূরণই তার কর্তব্য হয়। এমতাবস্থায় সে নিজে যদি মালিক হওয়ার দাবি করে বসে এবং মালিক প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের অপব্যবহার করতে শুরু করে, কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক মনে করে, আর তারই ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ ও আদর্শ বাস্তবায়নে তৎপর হয়, তবে তা হবে বিদ্রোহ এবং বিশ্বাস ঘাতকতামূলক পদক্ষেপ।

اٰدَمَ শব্দের অর্থ : শব্দটি اُدْمَةُ الْاَرْضِ অথবা اُدْمِى থেকে مشتق এর অর্থ ভূপৃষ্ঠ বা গন্ধম বর্ণ। হযরত আদম (আ.) গন্ধমবর্ণ মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট এবং গন্ধম বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি اٰدَم নামে অভিহিত হয়েছেন।

اَلْاَرْض দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে ব্যবহৃত اَلْاَرْضِ শব্দ দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা জমিনকেই বুঝানো হয়েছে। জমিনের কোনো অংশ বাদ নেই।

কারো মতে, শুধুমাত্র মক্কার ভূমিকেই বুঝানো হয়েছে।

قوله قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ **আয়াতাংশের তাৎপর্য :** আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র ফেরেশতাদের প্রশংসায় বলেছেন, لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ অথচ এখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা বানানোর প্রস্তাবের সাথে সাথে মন্তব্য করল– اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

এ জটিল সন্দেহের উত্তরে বলা হয় যে, যখন তারা খলীফা خَلِيْفَة শব্দ শুনতে পেয়েছে, তখনই তারা বুঝতে পেরেছে যে, খলীফার কাজ হলো তাদের মধ্যে একটি দল ফ্যাসাদে লিপ্ত হলে সে তার মীমাংসা করবে। কিন্তু বর্ণনার সময় তারা সাধারণভাবে সকলের প্রতি ফ্যাসাদ-এর নিসবত করে দিয়েছে। পরে আল্লাহ বর্ণনা দিলেন যে, তোমাদের এ ধারণা ভুল; বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক হবে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী আর কিছু সংখ্যক হবে অনুগত।

কারো মতে, ফেরেশতাগণ জিন জাতি কর্তৃক সৃষ্ট ফ্যাসাদ-বিপর্যয় ইত্যাদি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখেছিল। তাই তারা মানুষের ব্যাপারে এই মন্তব্য করেছেন।

ইবনে যায়েদ বলেন– আল্লাহ তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একজন খলীফা নিযুক্ত করব, যার বংশধরদের মধ্যে একদল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হবে, তখন তারা এই বক্তব্য পেশ করেছিল।

ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর পরামর্শের তাৎপর্য : আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী নন তবুও তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা প্রেরণের প্রাক্কালে ফেরেশতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিলেন কেন? এর তাৎপর্য বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বলেন–

- এখানে পরামর্শ নেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিষয়টি তাদেরকে অবহিতকরণই মূল উদ্দেশ্য।
- অথবা, এর দ্বারা বান্দাকে সকল সৎকর্মে পরামর্শ গ্রহণের নীতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য।
- অথবা, এখানে পরামর্শ নেওয়া মানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- অথবা, এর দ্বারা সৃষ্ট খলীফার মর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য।
- অথবা, ইবাদতের উপর عِلْم -এর প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য।

اَلْاَسْمَاءَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاَسْمَاءَ -এর অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও কাতাদা (রা.) প্রমুখের মতে, দুনিয়ার ছোট বড় সকল বস্তুর নাম আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।

২। আল্লামা তাহাবী (র.) বলেন– اَلْاَسْمَاءَ দ্বারা ফেরেশতাদের নাম উদ্দেশ্য।

৩। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন– اَلْاَسْمَاءَ বলতে সকল বংশধরদের নাম উদ্দেশ্য।

৪। রাবী ইবনে খাইসাম (র.) বলেন, এখানে বিশেষ করে ফেরেশতাদের নাম উদ্দেশ্য।

ফেরেশতাদের ছাড়া হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষাদানের কারণ : আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির আলোকে বুঝা যায়, বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও নাম শিক্ষা দেওয়ায় হযরত আদম (আ.) বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হতো তবে তারাও বিশেষভাবে জ্ঞানী এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করত।

এ প্রশ্নের আলোকে বলা যায় যে, মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে কিছু বিশেষ জ্ঞানের যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাদের সে যোগ্যতা প্রদান করা হয়নি। মনুষ্য প্রকৃতি বুঝতে হলে মানবসুলভ প্রকৃতির অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। আর তা হয়েছেও বটে। ফেরেশতাকুলের মধ্যে সে মানবিক গুণাবলি অনুপস্থিত। অতএব যে প্রকৃতির জন্য যেরূপ জ্ঞান উপযোগী হয় আল্লাহ তাকে সেরূপ জ্ঞানই দান করে থাকেন।

اَنْبِئُوْنِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, اَنْبِئُوْنِىْ তোমরা আমাকে বলে দাও বা খবর দাও, অথচ এ ব্যাপারে ফেরেশতাদের কোনো عِلْم ছিল না। মূলতঃ এটা তাদের শক্তির বাইরে تَكْلِيْف বা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা যে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও পরিকল্পনার সামনে সম্পূর্ণ অক্ষম তা বুঝানো উদ্দেশ্য। এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেলাফতের সকল কাজ পরিচালনা করতে হলে সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এ যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দেননি। একথা প্রমাণ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

ফেরেশতারা কি করে জানল যে, খলীফা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে : আলোচ্য আয়াতে মানুষ জমিনে ফেতনা ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে বলে ফেরেশতাদের মন্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এর কারণ, তারা ইতিপূর্বে জিন জাতির শাসনামল দেখেছে। তারা অবলোকন করেছে যে, ওরা করেনি এমন কোনো কাজ নেই। অতএব হয়তোবা মানুষও এমন করতে পারে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, মূলতঃ এখানে কিছু ইবারত উহ্য আছে। যেমন– اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً يَفْعَلُ كَذَا كَذَا এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বলেছিল– اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

ফেরেশতাদের তাসবীহ ও তাহমীদ : হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, তাসবীহ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য। কারো মতে, تَسْبِيْح অর্থ-উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তাদের تَسْبِيْح হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ

হযরত আব্দুর রহমান বিন কুরত বলেন, নবী করীম ﷺ মে'রাজের সময় উর্ধ্ব আকাশে তাসবীহ শুনেছিলেন, তা ছিল, سُبْحَانَهُ الْعُلٰى الْاَعْلٰى سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى আর তাহমীদ হলো উপযুক্ত গুণাবলির দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা। যেমন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَبِيْرِ الْعُلٰى الْعَزِيْزِ

قوله يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ বাক্যটি দ্বারা খলীফাদের উপর অপবাদ : যেহেতু ফেরেশতারা গায়েব জানে না সেহেতু ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আদম বা তার সন্তানদের উপর এটা বড় ধরনের অপবাদ। এ প্রেক্ষিতে এ কথাই বলা যায় যে, প্রশ্নকারীর এতটুকু অধিকার রয়েছে যে, সে যেন কোনো বিষয় ও ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। তাছাড়া ফেরেশতাগণ ইতিপূর্বে জিনদের অবস্থা দেখেছিল।

হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের আকৃতিগত বিভিন্নতার কারণ

তাফসীরকারদের বিভিন্ন আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.)-কে আগে ফেরেশতাদের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে ষাট রং ও প্রকারের মাটি একত্র করে এবং বিভিন্ন প্রকারের পানি মিশিয়ে নরম করতঃ তা দিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর অবয়ব তৈরি করেন। অবশ্য আদম সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হিসেবে আগুন এবং বায়ুও স্থান পায়। সে দেহাবয়বটিতে দীর্ঘ দিন পর প্রাণ সঞ্চারিত করা হয়। মৌলিক উপাদানের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আদম সন্তানের আকৃতিগত এবং চরিত্রগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ اٰدَمَ হযরত আদম (আ.) -এর নামকরণের কারণ : اٰدَمَ শব্দটি আনারবী নাম। যেমন কুরআনে উল্লিখিত اٰزَرَ নাম। কেউ কেউ শব্দটিকে আরবি আখ্যায়িত করে বলেন যে, اٰدَمَ শব্দটি اَدَمَةٌ (যবর যোগে) বা اَلْاُدْمَةُ (পেশ যোগে) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ اَلْاُسْوَةُ (আদর্শ)। অথবা اَدِيْمُ الْاَرْضِ থেকে নির্গত অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। অথবা الادمة ও الادم থেকে নির্গত। যার অর্থ اَلْاُلْفَةُ (ভালোবাসা)। তবে শব্দটি তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে উল্লিখিত "এডাম" শব্দের অপভ্রংশ রূপ। অনারবী হওয়াই বিশুদ্ধ। –[বায়যাবী]

ফেরেশতাদের উপর আদম (আ.)-এর সম্মান লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য জ্ঞাপক ধারণার সমাধান : যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যেভাবে হযরত আদম (আ.)-কে সমস্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও নামসমূহ শিক্ষা দেওয়ার ফলে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদি ফেরেশতাগণও এরূপ শিক্ষা পেতেন, তবে তারাও ঐ বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করতেন; এটা বাহ্যতঃ বৈষম্য আচরণ বুঝায়।

উত্তরে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) পার্থিব উপাদান থেকে সৃষ্ট বিধায় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞান ধারণ করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে স্বভাবগতভাবেই উপস্থিত ছিল। তাই সৃষ্টির অভিযাত্রাতেই তাকে নামগুলো শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বভাবগত জ্ঞানের মাধ্যমে ঐগুলো আয়ত্ত করে ফেলেন। এ বস্তুগুলো বহু পূর্ব থেকেই ফেরেশতাদের দেখা-শোনা বস্তু ছিল; কিন্তু তারা অতি প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিধায় এ প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের নামগুলো আয়ত্ত করতে পারেন নি। এ নামগুলো শিক্ষা দিলেও একই কারণে তাদের আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা-শোনার ভিত্তিতে তাদের কাছে নাম বলার প্রশ্ন রাখা হয়েছে। অতএব, এখানে বৈষম্যের ধারণা অবান্তর।

قوله اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের কয়েকটি বক্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। যথা–

১. আমি আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।
২. কেউ কেউ বলেন, এখানে غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। আর غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা আদম পুত্র কাবিল কতৃক হাবিলকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে।
৩. কেউ কেউ বলেন, غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা লওহে মাহফূযে রক্ষিত তাকদীর, আর غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা জিন ও মানব জাতির সংঘটিতব্য পার্থিব কার্যকলাপ বুঝানো হয়েছে।

قوله وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যা প্রকাশ করছ এবং যা গোপন করছ, সব কিছু সম্পর্কে আমি অবগত। এখানে প্রকাশিত বিষয় দ্বারা মানব জাতির প্রতি ফেরেশতাদের উক্তি "মানুষেরা দুনিয়াতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত করবে" এ মন্তব্যটি উদ্দেশ্য। আর গোপনকৃত বিষয় দ্বারা তাদের উক্তি نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ -এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিজেদের যোগ্যতার যে দাবি ছিল যে, আমাদের মতো অনুগত কোনো সৃষ্টি নেই।" এটাই তাদের গোপনকৃত মনোভাব।
কারো কারো মতে গোপনকৃত বিষয় দ্বারা ফেরেশতাদের আনুগত্য ও ইবলিসের নাফরমানিমূলক আচরণ উদ্দেশ্য। –[বায়যাবী]

হযরত আদম (আ.)-কে সেজদার নির্দেশের কারণ
আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো হযরত আদম (আ.)-কে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ মর্মে তাকে খেলাফতের যোগ্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ইলমও দান করলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তা প্রমাণও করলেন। তবে তার জ্ঞানের কোনো কোনো অংশ ফেরেশতাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু জিন জাতি সে সকল ইলমের নগণ্য অংশই লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জিন সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, এ মর্মে ফেরেশতা এবং জিনদের দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা করলেন, যদ্দ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বস্তুতঃ তিনিই তাদের উভয় দল থেকে শ্রেষ্ঠতর। এজন্য সেজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

سجدة -এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : সেজদার অর্থ হলো আনুগত্য করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ بِقَصْدِ الْعِبَادِ অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে জমিনের উপর কপাল রাখাকে সেজদা বলে। ইসলামের বিধান মোতাবেক সেজদা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও করা জায়েজ নয়। অতএব এখানে সেজদার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

১. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্য কাউকে সেজদা করতে বলা হবে তখন অর্থ হবে সেবা, আনুগত্য, আদেশ পালন, শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার প্রভৃতি। এটাই আধুনিক তাফসীরকারদের অভিমত।
২. কেউ কেউ বলেন, যদিও আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ নেই; কিন্তু এখানে আল্লাহই নির্দেশ করেছেন। এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়।

তাফসীরে ইবনে কাছীরের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো মানুষের সম্মানার্থে শির নত বা সেজদা করা পূর্ববর্তী উম্মদের জন্য জায়েজ ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার ভাইয়েরা সেজদা করেছিল। আমাদের শরিয়তে তা মানসূখ হয়ে গেছে। এখানে ফেরেশতাদেরকে সেজদার নির্দেশ এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যেন হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

সেজদার নির্দেশ কি জিনদের প্রতিও ছিল : এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এ কথা বলা হলো যে, ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সেজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতিই ছিল। সকল ফেরেশতাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তারাই ছিল তখন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদের হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হলো তাতে জিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল।

ইসলামে সেজদার বিধান : এ আয়াতে আদম (আ.)-কে সেজদা করতে ফেরেশতাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতা মাতা ও ভাইগণ মিসর পৌঁছার পর সেজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এ সেজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা শিরক ও কুফরি। কোনো কালে কোনো শরিয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোনো প্রমাণ নেই। প্রাচীনকালের সেজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল।

ইমাম জাস্সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তে বড়দের প্রতি সম্মানজনক সেজদা করা বৈধ ছিল। শরিয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। রুকূ'-সেজদা এবং নামাজের মতো করে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, سَجْدَة تَعْظِيْمِىْ রহিত হওয়ার দলিল কি? যেহেতু এর বৈধতার প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক متواتر ও মাশহুর হাদীস দ্বারা سَجْدَه تَعْظِيْمِىْ হারাম বলে প্রমাণিত হয়। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ মনে করতাম, তবে প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামীকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম। কিন্তু এ শরিয়তে سَجْدَه تَعْظِيْمِىْ সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সেজদা করা কারো পক্ষে জায়েজ নয়। (এ হাদীসটি বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত)।

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর।' 'সেজদা' শব্দের অর্থ নতশির হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা, বিশেষ প্রণিপাত ইত্যাদি। ইসলামি বিধান অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়। এ কারণেই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের প্রতি হযরত আদম (আ.)-কে যে সেজদা দানের আদেশ করেছিলেন, সেই সেজদা ইবাদত নয়; বরং তা ছিল سَجْدَة تَعْظِيْم বা সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

প্রাচীন মুফাস্সিরগণ বলেন, ফেরেশ্তা হযরত আদম (আ.)-কে 'কিবলা'স্বরূপ সম্মুখে রেখে মূলতঃ আল্লাহ তা'আলাকেই সেজদা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেছিলেন। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য যে, কোনো মানুষের সম্মানার্থে নতশির বা সেজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য বৈধ ছিল। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিলেন। আমাদের শরিয়তে এটা রহিত করা হয়েছে।

اِبْلِيْس শব্দটি اِبْلَاس থেকে নির্গত, যার অর্থ– দূরীভূত, নিরাশ অথবা বিতাড়িত। এ আয়াতে اِبْلِيْس দ্বারা অভিশপ্ত শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। اِبْلِيْس জিন ছিল, না ফেরেশ্তা ছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, শয়তান অগ্নি থেকে সৃষ্ট জিন সম্প্রদায়ের ইমাম ছিল। কিন্তু বহুকাল একাগ্র চিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে করতে সে ফেরেশতা পদে উন্নীত হয়। কথিত আছে যে, এ ধরাধামে ইবলীসের মতো কেউ-ই এতো ইবাদত

করতে পারেনি। কিন্তু সে অহংকার করে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ লজ্ঘনপূর্বক অভিশপ্ত শয়তান হয়ে যায়। ইবলীস ফেরেশ্‌তা ছিল না। যেহেতু সে ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে ছিল, সেহেতু مُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةِ পদে উন্নীত হওয়ার কারণে فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ বলা হয়েছে। মহান রাব্বুল্ আ'লামীন যখন হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্য ইবলীসকে আদেশ করলেন, তখন সে সরাসরি এ যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল যে, আমি হলাম আগুনের তৈরি আর আদম (আ.) হলো মাটির তৈরি। আগুনের ধর্ম হলো উপরের দিকে উঠা। আর মাটির ধর্ম হলো নিচের দিকে নামা। সুতরাং উপরের বস্তু নিচের বস্তুকে কিরূপ সেজদা করতে পারে। এটাই ছিল ইবলীসের হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করার কারণ। তাই আল্লাহ তাকে চির অভিশপ্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন।

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ -এর পরিচয় : নিষিদ্ধ বৃক্ষটির সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আঙ্গুর লতা। কেউ বলেন, ডুমুর গাছ। আবার কেউ বলেন, এ গাছের ফল ভক্ষণে মানবিক প্রয়োজন তথা প্রসাব-পায়খানা দেখা দিত, যা বেহেশতের অনুপযুক্ত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন।

اُسْكُنْ একবচন কিন্তু كُلَا দ্বিবচন ব্যবহারের কারণ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা اُسْكُنْ একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ তারপরে كُلَا দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর রহস্য বা হিকমত সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন, এ ভঙ্গিতে আয়াতের শব্দ চয়নের দ্বারা নারী-পুরুষের পরস্পরের অধিকার নির্ণয় করা উদ্দেশ্য। اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সংসার নির্বাহ ও পরিচালনার দিক হতে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান নয়; বরং নারী পুরুষের পরিচালনাধীন থাকবে। পরিচালনা ও নির্বাহের দায়িত্ব পুরুষের, এজন্য সম্বোধন সরাসরি اَنْتَ তথা আদমকে করা হয়েছে। আর তার পরেই স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।
তবে ভোগের ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোগ করবে এবং সমান সুযোগ প্রাপ্ত হবে। তাই كُلَا দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

رَغَدًا -এর অর্থ : আরবি অভিধানানুযায়ী সে সব নিয়ামত ও আহার্য বস্তুকে। رَغَدًا বলা হয়, যা লাভ করতে কোনো শ্রম বা সাধনার প্রয়োজন পড়ে না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। আদম ও হাওয়াকে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করতে থাক। এগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে এমন কোনো চিন্তাও করতে হবে না।

اسكن -এর অর্থ : সকল মুফাস্‌সিরের ঐকমত্যে শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে একমাত্র তার কুফরির কারণে। সে বেহেশত থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ আদমকে বলেন, اُسْكُنْ অর্থাৎ এখানে প্রশান্তিতে থাক। এটা প্রশান্তির স্থান। ইহা বাবে نَصَرَ থেকে। اَلسُّكُوْنُ বলা হয় যেখানে প্রশান্তি পাওয়া যায়, নড়া-চড়ার প্রয়োজন হয় না। اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ -এর মধ্যে اَنْتَ অতিরিক্ত নেওয়ার কারণ ঃ মূলতঃ اُسْكُنْ وَزَوْجُكَ বললেই হতো, মাঝখানে اَنْتَ নেওয়া হয়েছে তাকিদের জন্য। কেননা اسم ظاهر -কে ضمير مرفوع متصل -এর উপর عطف করা বৈধ নয়। ضمير مرفوع متصل -এর উপর عطف কাতে হলে সমার্থক একটি ضمير مرفوع منفصل -তাকিদ হিসেবে নিতে হয়।

আয়াতে لَا تَاكُلَا না বলে لَا تَقْرَبَا (নিকট বর্তী হয়ো না) বলার রহস্য : আলোচ্য আয়াতে لا تاكلا অর্থাৎ, 'তোমরা ভক্ষণ করো না' না বলে لَا تَقْرَبَا বলা হয়েছে। অথচ মূলতঃ নিষিদ্ধ হলো ভক্ষণ করা। আর ভক্ষণ করা, নিকটবর্তী হওয়া এক কথা নয়। তা সত্ত্বেও এরূপ বলার রহস্য হলো–পৃথিবীতে বসবাসের নির্দিষ্ট স্থানে খলিফা হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে তাদেরকে পরীক্ষা ও তাদের ঝোঁক প্রবণতা যাচাই করার নিমিত্তে কিছু সময়ের জন্য বেহেশতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু নিকটবর্তী হলেই যে বস্তুর উপর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ জাগা ও পরে তাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই مُقَدَّمَةُ الْقَبِيْحِ قَبِيْحٌ হিসেবে গাছের নিকটে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে ভক্ষণের আগ্রহ উদয় না হয়।

قوله الظّٰلِمِيْنَ -এর মর্মার্থ : ظَالِمِيْنَ শব্দটি ظَالِمٌ শব্দের বহুবচন। اَلظُّلْمُ ধাতু থেকে গঠিত। ظُلْم হচ্ছে وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ তথা বস্তুকে তার অপাত্রে প্রতিস্থাপন করা। সহজ ভাষায় অন্যের অধিকারের অস্বীকৃতিকে জুলুম বলে। আর অন্যের অধিকার অস্বীকারকারীকে ظَالِمٌ বলে ظُلْم -এর সর্বোর্ধ্ব স্তর হচ্ছে كُفْر। অত্র আয়াতে ظَالِمٌ দ্বারা আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা গাছটির ফল ভক্ষণ করলে আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের অন্ত র্ভুক্ত হবে এবং বেহেশতে অবস্থানের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় : وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ, 'এ গাছের ধারে কাছেও যেও না।' এ নিষেধাজ্ঞার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না এর দ্বারাই ফিকহশাস্ত্রের কারণ উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তু নিজ স্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোনো হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া আর ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একে ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া : এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ.)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা চুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ নবীগণ (আ.)-কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তাদের দ্বারা আল্লাহর পাকের ইচ্ছার পরিপন্থি ছোট বড় কোনো পাপ কাজ সম্পন্ন হতো, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলির উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দীন ও শরিয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কুরআন পাকের বহু আয়তে অনেক নবী (আ.) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাও এ শ্রেণিভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোনো ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে কোনো নবী (আ.) জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থি কোনো কাজ করেননি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরিয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনক ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরিয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে এ ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবার নবীগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কুরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলিকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. হযরত আদম (আ.)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও একখণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে ইরশাদ করলেন, এ বস্তু দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, যে দুটি হুজুর ﷺ -এর হাতে ছিল; বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেগুলো সে সময় তাঁর হাতে ছিল। অনুরূপভাবে যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মালো যে, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমাদেরকে এমন কোনো কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে সেটি অন্য গাছ।'

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করেছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে রবিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন; এখন সে বিধি-নিষেধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আ.)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলির বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নিয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কুরআন মাজীদে فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [অর্থাৎ আদম (আ.) ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে [সংকল্পের] দৃঢ়তা পাইনি।] আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

যাহোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আ.) বুঝে শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেননি; বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর শানে নবুয়ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কুরআন মাজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আ.)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

تَلَقّٰى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ.) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كَلِمٰتٍ তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাসসির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

تَوْبَةٌ – تَابَ [তওবা] এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি : ১. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। ৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির ভাব থাকলে তওবা হবেনা। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ তওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোনো কোনো মনীষীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেছিলেন رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ [হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,] হযরত ইউনুস (আ.) পদস্খলনের পর নিবেদন করেন– لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্রিস্টান ও ইহুদিগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তার মাফ দিলেই আল্লাহর নিকটে মাফ হয়ে যায়। বর্তমান বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোনো পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁর বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

তওবার অর্থ ঃ تَوْبَةٌ-এর প্রকৃত অর্থ ফিরে আসা। যখন তওবার নিসবত মানুষের দিকে হয় তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি। যথা–(১) কৃত পাপকে মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। (২) পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। (৩) ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা। এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির অভাব থাকলে তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে "তওবা" বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ - এর মধ্যে تَوْبَة-এর সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে হয়েছে-এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

তায়েব ও তাওয়াব-এর মধ্যে পার্থক্য : আল্লামা ইমাম কুরতুবীর মতে تَوْبَة শব্দের নিসবত মানুষের সঙ্গেও হতে পারে। যেমন– اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের পছন্দ করেন।

আবার আল্লাহর সাথেও হতে পারে। যেমন– هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ তিনিই মহান, তওবা কবুলকারী, অতীব দয়ালু। যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় পাপ থেকে পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় তওবা কবুল করা। অর্থাৎ- তওবাকারীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। সমার্থবোধক অপর تَائِبٌ -এর ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে জায়েজ নয়, যদিও আভিধানিক অর্থে ভুল নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শুধু গুণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহারই বৈধ, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য তার ব্যবহার বৈধ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَمْ اَقُلْ : সীগাহ لم اقل واحد متكلم বহছ نفى جحد بلم معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি কি বলিনি?

اَعْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– অধিক জ্ঞাত।

تُبْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ–(ب - د - ء) জিনস مهموز لام অর্থ তোমরা প্রকাশ কর।

تَكْتُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ–(ك - ت - م) মাসদার اَلْكَتْمُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা গোপন কর।

قُلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف ; বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনসে اجوف واوى অর্থ– আমরা হুকুম দিয়েছি।

اسْجُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س - ج - د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সেজদা কর।

فَسَجَدُوْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (س - ج - د) মাসদার اَلسُّجُوْدُ জিনস صحيح অর্থ– তারা সেজদা করল।

اِبْلِيْس : শয়তানের নাম; اِبْلَاسٌ হতে গঠিত। অর্থ, হতাশাগ্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যেহেতু সে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, এজন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে ইবলীস। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, এটা আরবি ভাষার শব্দ নয়। তাই غير منصرف। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, ইবলীসের সিংহাসন হলো মহাসাগরে। সে প্রত্যেহ তার সেনা পাঠায় মানুষকে কুকর্ম ও পাপে লিপ্ত করার জন্য। যে যত বেশি কুকর্ম করতে পারে, সে তার কাছে তত মর্যাদা পায়।

اَبٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ا - ب - ى) মাসদার إباء জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و ناقص يائى অর্থ– সে অস্বীকার করল।

اسْتَكْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ–(ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– সে অহংকার করল।

كُلَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ امر فعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ– (أ - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক।

شِئْتُمَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّيْءُ অর্থ– তোমরা দুজন চেয়েছিলে।

لَاتَقْرَبَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ– (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কাছে যেয়ো না।

اهْبِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه - ب - ط) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিচে নাম।

مُسْتَقَرٌّ : মাসদারে মীমী হলো অর্থ হবে, অবস্থান করা আর জরফ হলে অর্থ হবে, অবস্থানস্থল। বাব اِسْتِفْعَالٌ থেকে মাসদার اِسْتِقْرَاءٌ

مَتَاعٌ : উপকৃত হওয়া। উপকৃত হওয়ার সমাগ্রী। প্রত্যেক এমন সামগ্রী যার দ্বার সামান্য উপকৃত হওয়া যায়। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। মাসদার হিসেবে উপকৃত হওয়া কিংবা উপকৃত হওয়ার সামগ্রী। বহুবচন اَمْتِعَةٌ ;

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ : এখানে اِذْ উহ্য ফে'লের مفعول به, قَالَ ফে'ল, رَبُّكَ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে فاعل আর لِلْمَلَائِكَةِ হলো متعلق আর اِنِّىْ جَاعِلٌ বাক্যটি مفعول। অতএব, ফে'ল-ফা'য়েল مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ : এখানে نَحْنُ হলো مبتدأ, تَسْبِيْحٌ ফে'ল ফা'য়েল, আর بِحَمْدِكَ হলো متعلق অতএব ফে'ল ও ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে খবর এখন মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

قوله قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে قَالَ ফে'ল ফা'য়েল, আর اِنِّىْ اَعْلَمُ الخ হলো مفعول به مفعوله অতঃপর ফে'ল ফা'য়েল ও مفعول به মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا : এখানে عَلَّمَ ফেল ফা'য়েল, اٰدَمَ প্রথম مفعول আর اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا দ্বিতীয় مفعول অতএব, ফে'ল ফা'য়েল ও উভয় مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ : এখানে اُسْكُنْ ফে'ল فاعل আর اَنْتَ যমীরে تاكيد মা'তুফ আলাই, واو হলো حرف عطف আর زَوْجُكَ মুযাফ ও مضاف اليه মিলে معطوف এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে فاعل-এর تاكيد হয়েছে। আর اَلْجَنَّةَ হলো مفعول فيه অতঃপর ফে'ল ও ফাএল ও مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ : এখানে لَا تَقْرَبَا হলো فعل আর الف হলো فاعل আর هٰذِهِ الشَّجَرَةَ হলো مفعول অতঃপর ফে'ল ও فاعل ও মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ : এখানে فاء হলো حرف عطف আর تَلَقّٰى ফে'ল اٰدَمُ হলো ফা'য়েল مِنْ رَّبِّهٖ হলো تَلَقّٰى ফে'লের متعلق আর كَلِمَاتٍ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল, متعلق ও مفعول به মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّیْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) বললাম, নিচে নেমে যাও তোমরা সকলে জান্নাত হতে, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আসে আমার পক্ষ হতে কোনো হেদায়েত, তবে যারা অনুসরণ করবে আমার ঐ হেদায়েত, তাদের উপর কোনো ভয় আসবে না এবং তারা সন্তপ্তও হবে না ।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٩)

(৩৯) আর যারা কুফরি করবে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে আমার আহকামকে, তারা হবে দোজখী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে ।

يٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِیْۤ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّایَ فَارْهَبُوْنِ (٤٠)

(৪০) হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার সেই ইহসানগুলো যা আমি তোমাদের প্রতি করেছিলাম এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার অঙ্গীকার, আমি পূর্ণ করব তোমাদের অঙ্গীকার, আর শুধু আমাকেই ভয় কর ।

وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِیْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّایَ فَاتَّقُوْنِ (٤١)

(৪১) আর ঈমান আন ঐ কিতাবের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি এমনভাবে যে, তা সত্যতা প্রমাণকারী ঐ কিতাবের যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, আর হয়ো না তোমরা সকলের মধ্যে ঐ কুরআনের সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী, আর গ্রহণ করো না আমার আহকামের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় এবং আমাকেই পূর্ণরূপে ভয় কর ।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

(৪২) আর মিশ্রিত করো না সত্যকে অসত্যের সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে যখন তোমরা অবগতও আছ ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) قُلْنَا বললাম ।اهْبِطُوْا নিচে নেমে যাও তোমরা جَمِيْعًا সকলে مِنْهَا জান্নাত হতে فَاِمَّا অতঃপর যদি يَاْتِيَنَّكُمْ তোমাদের নিকট আসে مِّنِّیْ আমার পক্ষ হতে هُدًى কোনো হেদায়েত, فَمَنْ তবে যারা تَبِعَ অনুসরণ করবে هُدَایَ আমার ঐ হেদায়েত فَلَا خَوْفٌ কোনো ভয় আসবে না عَلَيْهِمْ তাদের উপর وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা সন্তপ্তও হবে না ।

(৩৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا। আর যারা কুফরি করবে ।وَكَذَّبُوْا এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে بِاٰيٰتِنَا আমার আহকামকে اُولٰٓئِكَ তারা হবে اَصْحٰبُ النَّارِ দোজখী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে ।

(৪০) يٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! ।اذْكُرُوْا স্মরণ কর نِعْمَتِیَ আমার সেই ইহসানগুলো الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ যা আমি করেছিলাম عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি ।وَاَوْفُوْا এবং তোমরা পূর্ণ কর بِعَهْدِیْۤ আমার অঙ্গীকার اُوْفِ আমি পূর্ণ করব بِعَهْدِكُمْ তোমাদের অঙ্গীকার وَاِيَّایَ আর শুধু আমাকেই فَارْهَبُوْنِ ভয় কর ।

(৪১) ।وَاٰمِنُوْا আর ঈমান আন ঐ কিতাবের প্রতি بِمَاۤ اَنْزَلْتُ যা আমি নাজিল করেছি এমনভাবে যে, مُصَدِّقًا তা সত্যতা প্রমাণকারী لِّمَا مَعَكُمْ ঐ কিতাবের যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে وَلَا تَكُوْنُوْۤا আর হয়ো না তোমরা اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ সকলের মধ্যে ঐ কুরআনের সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী ।وَلَا تَشْتَرُوْا আর গ্রহণ করো না بِاٰيٰتِیْ আমার আহকামের পরিবর্তে ثَمَنًا قَلِيْلًا তুচ্ছ বিনিময় وَاِيَّایَ فَاتَّقُوْنِ এবং আমাকেই পূর্ণরূপে ভয় কর ।

(৪২) ।وَلَا تَلْبِسُوا আর মিশ্রিত করো না الْحَقَّ সত্যকে بِالْبَاطِلِ অসত্যের সাথে ।وَتَكْتُمُوْا এবং গোপন করো না الْحَقَّ সত্যকে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যখন তোমরা অবগতও আছ ।

অনুবাদ : (৪৩) আর তোমরা কায়েম কর নামাজ এবং দাও জাকাত, আর বিনয় প্রকাশ কর বিনয়ীদের সাথে।	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣)
(৪৪) কি আশ্চর্য! আদেশ কর অন্যকে সৎকাজের আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর অথচ তোমরা কিতাব [তাওরাত] পাঠ করে থাক; তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٤٤)
(৪৫) আর সাহায্য নাও ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয় নামাজ কঠিন কাজ; কিন্তু খুশুওয়ালাদের [বিনয়ী লোকদের] জন্য নয়।	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (٤٥)
(৪৬) খুশুওয়ালা তারাই যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তারা সাক্ষাতকারী স্বীয় প্রভুর সাথে আর এটাও ধারণা করে যে, তারা আপন প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।	الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (٤٦)
(৪৭) হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর– তোমরা আমার ঐ নিয়ামত যা আমি তোমাদের পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছি আর এটাও যে, আমি তোমাদেরকে ফজিলত দান করেছি সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।	يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧)
(৪৮) আর সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো পক্ষ হতে কোনো দাবি পরিশোধ করতে পারবে না এবং কবুল হবে না কোনো ব্যক্তি হতে কোনো সুপারিশও এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তি হতে কোনো বিনিময়ও আর তাদের প্রতি চলতে পারবে না কোনো পক্ষপাতিত্বও।	وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـــًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٤٨)

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৩) وَاَقِيْمُوْا আর তোমরা কায়েম কর الصَّلٰوةَ নামাজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং দাও জাকাত وَارْكَعُوْا আর বিনয় প্রকাশ কর مَعَ الرّٰكِعِيْنَ বিনয়ীদের সাথে।

(৪৪) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ কি আশ্চর্য! আদেশ কর অন্যকে بِالْبِرِّ সৎকাজের وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর وَاَنْتُمْ অথচ তোমরা تَتْلُوْنَ পাঠ করে থাক الْكِتٰبَ কিতাব [তাওরাত] اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?

(৪৫) وَاسْتَعِيْنُوْا আর সাহায্য নাও بِالصَّبْرِ ধৈর্য وَالصَّلٰوةِ ও নামাজ দ্বারা وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ এবং নিশ্চয় নামাজ কঠিন কাজ; اِلَّا কিন্তু عَلَى الْخٰشِعِيْنَ খুশুওয়ালাদের [বিনয়ী লোকদের] জন্য নয়।

(৪৬) الَّذِيْنَ খুশুওয়ালা তারাই يَظُنُّوْنَ যারা ধারণা করে যে اَنَّهُمْ নিশ্চয় তারা مُّلٰقُوْا সাক্ষাতকারী رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর সাথে وَاَنَّهُمْ আর এটাও ধারণা করে যে, তারা اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আপন প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

(৪৭) يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর– তোমরা نِعْمَتِيَ আমার ঐ নিয়ামত الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ যা আমি তোমাদের পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছি وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ আর এটাও যে, আমি তোমাদেরকে ফজিলত দান করেছি عَلَى الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।

(৪৮) وَاتَّقُوْا يَوْمًا আর সে দিনকে ভয় কর যেদিন لَّا تَجْزِيْ পরিশোধ করতে পারবে না نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ কেউ কারো পক্ষ হতে شَيْـــًٔا কোনো দাবি وَّلَا يُقْبَلُ এবং কবুল হবে না مِنْهَا কোনো ব্যক্তি হতে شَفَاعَةٌ কোনো সুপারিশও وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তি হতে عَدْلٌ কোনো বিনিময়ও وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আর তাদের প্রতি চলতে পারবে না কোনো পক্ষপাতিত্বও। [তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৪- قوله اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইহুদিরা মানুষকে দান খয়রাত করার আদেশ করত; কিন্তু এ কাজ তারা নিজেরা করত না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বায়জাবী]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, ইহুদি আলেমগণ তাদের আত্মীয় মুসলমানদেরকে বলত, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মের উপর বহাল থাক। কারণ এটা সত্য ধর্ম। অথচ তারা ঈমান গ্রহণ করত না। তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি নিজ শ্বশুরকে বলেছিল কিংবা তার কোনো নিকট আত্মীয়কে বলেছিল যে, তোমরা যে ধর্ম মেনে চলছ তাতে অটল থেক এবং এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিবেন, তা অতি সত্য। তারা ঈমান গ্রহণ না করে অন্যদেরকে সৎ উপদেশ দান করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর– ১ : ৭৯]

আসবাবুননুযূল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল্লামা ওয়াহিদী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত ওলামায়ে ইয়াহুদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নিজেদের মুসলমান স্বজনদেরকে বলত যে, তোমরা দীনে মুহাম্মদীর উপর অটল থাক। তা অতি সত্যধর্ম। তাদের এহেন উপদেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে জালালাইন : ৯]
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, আমি মেরাজের রজনীতে একদল লোককে দেখতে পেলাম, আগুনের কেঁচি দ্বারা তাদের ঠোঁট কর্তন করা হচ্ছে। যখনই তাদের ঠোঁটগুলো কর্তন করা হয়, সাথে সাথেই তা পূর্বাবস্থায় হয়ে যায়। তখন আমি হযরত জিবরাঈল (আ.) -কে জিজ্ঞিস করলাম, ওরা কারা? হযরত জিবরাঈল জবাবে বললেন যে, ওরা হচ্ছে আপনার উম্মতের বক্তা বা ওয়ায়েজগণ। এরা মানুষদেরকে সদুপদেশ করেছিল, কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে তারা ছিল উদাসীন। সে আমলহীন বক্তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর– ১ : ৮০]

হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় : قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا [তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও।]-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেজন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ বিশেষ উদ্দেশ্যে নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণত সাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খেদায়ী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলীফা হিসেবে।

শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত : فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ [যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে; তাদের আশঙ্কা নেই এবং কোনো চিন্তাও করতে হবেনা।] এ আয়াতের আসমানি হেদায়েতের অনুসারীগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خَوْف আগত দুঃখ–কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حُزْن বলা হয়, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দুটি শব্দে যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই। অতঃপর এ দুটি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এর ন্যায় لَا حُزْنَ عَلَيْهِمْ না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন। যাঁরা আল্লাহর ওলীর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনসুরণকারী, তাঁরা ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোক, বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোক। কেননা এদের মধ্যে

কেউই এমন নয়, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহর ওলীগণ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোনো ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কুরআন মাজীদের অন্যত্র একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীগণের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহর সেসব নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

আয়াতে هُدًى-এর অর্থ ঃ আয়াতে هُدًى বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

(১) ইমাম সুদ্দী বলেন, هُدًى বলতে কিতাবুল্লাহ উদ্দেশ্য। (২) কেউ কেউ বলেন, هُدًى অর্থ হলো হেদায়েতের তাওফীক প্রদান করা। (৩) একদলের মতে هُدًى বলে সে দূতসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যে দূত আদমের কাছে ফেরেশতা এবং তাঁর সন্তানদের কাছে মানব হিসেবে আগমন করেছে। –[কুরতুবী]

خَوْف এবং حُزْن-এর মধ্যে পার্থক্য : জ্ঞাতব্য যে, অতীতের কোনো কাজ করার পরিণতির কথা ভেবে মনে ভবিষ্যতের জন্য যে দুর্বলতার সৃষ্টি এবং শাস্তি ভোগের চিন্তা হয় তাকে خَوْف বলা হয়। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে মনে যে চিন্তা ও অনুসূচনা হয় তাকে حُزْن বলা হয়।

اٰيَاتِ -এর অর্থ : اٰيَاتِ শব্দটি বহুবচন, একবচন اٰيَةٌ; এর অর্থ এমন চিহ্ন বা নিদর্শন যা বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে। কুরআনে এ শব্দটি চারটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–(১) কোথাও এর অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বা নিদর্শন। (২) কোথাও প্রাকৃতিক দিকদর্শনসমূহকে আল্লাহ তা'আলার আয়াত বলা হয়েছে। (৩) কোথাও নবীদের মু'জিযাসমূহকে আয়াত বলা হয়েছে। (৪) কোনো কোনো স্থানে কুরআনের বাণীখণ্ডকে আয়াত বলা হয়েছে। আয়াত অর্থ কোথায় কি নিতে হবে তা সর্বত্র প্রত্যেকটি ভাষণের পূর্বাপর অবস্থা হতে সহজেই বুঝা যায়। এখানে আসমানি সকল কিতাব এবং নবীদের মু'জিযার কথা বুঝানো হয়েছে।

হেদায়েত অনুসরণের প্রভাব : পৃথিবীতে মানব আগমনের সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা অনাগত ভবিষ্যতের মানবকুলকে এ কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তোমাদের নিকট যখন আমার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়েত আসবে, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। যারা অনুসরণ করবে ইহ-পরকালে তাদের কোনোই ভয়ভীতি ও দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। কিন্তু যারা আমাকে এবং নবী রাসূলকে অস্বীকার করবে বা আমার সাথে কাউকে শরিক করবে এবং আমার প্রদত্ত হেদায়েতের অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে তারা জঘন্যতর অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের শাস্তি হলো তারা চিরকাল আগুনের জ্বালাময়ী শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহর এ ঘোষণা চিরন্তন। এটা পৃথিবীতে মানুষের আগমন লগ্নের ঘোষণা।

اَصْحَابُ النَّارِ -এর পরিচয় : উপরিউক্ত আয়াতে চিরন্তন জাহান্নামী হওয়ার কথাটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের অন্তঃকরণে আদৌ ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না। তবে যেসব ঈমানদার লোকদের জাহান্নামে শাস্তি ভোগের কথা বলা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ ঘোষণা প্রযোজ্য নয়; বরং তারা নিজেদের অপরাধ মাফিক শাস্তি ভোগ করার পর অথবা নবী অলীদের সুপারিশে কিংবা আল্লাহর ক্ষমার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমানের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা চিরন্তন জাহান্নামী হবে না।

বনী ইসরাঈলের পরিচিতি : اِسْرَائِيْل শব্দটি হিব্রু ভাষার। এর অর্থ- عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা। এটা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম। তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন। ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর একাধিক নাম নেই। কেবল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দুটি নাম রয়েছে। ইয়াকূব এবং ইসরাঈল। আর তার বংশধরদেরকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ ক্ষেত্রে তাঁর বংশধরকে بَنِيْ يَعْقُوْب বলে সম্বোধন না করে بَنِيْ اِسْرَائِيْل ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন বুঝতে পারে তারা আব্দুল্লাহ –আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর বংশধর এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল 'ইয়াহুদ'। তার নামানুসারে বনী ইসরাঈল ইহুদি নামেও খ্যাত হতে থাকে। এই বংশে হযরত মূসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান (আ.) সহ আরো অসংখ্য নবী রাসূল জন্মগ্রহণ করেন। –[হাক্কানী, ইবনে কাছীর]

نِعْمَة দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ نِعْمَة দ্বারা পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি, উন্নতি, পারলৌকিক কল্যাণ, মর্যাদা ইত্যাদি বুঝায়। এগুলো সাধারণ নিয়ামত, সবার জন্যই উন্মুক্ত। তারা বিশেষ যে নিয়ামত পেয়েছিল। তা হলো, কঠিন মরু প্রান্তরে পাথরের মধ্য হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করা, মান্না ও সালওয়ার অবতারণ, ফেরাউনের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি। তাদের বংশ থেকে নবী রাসূল প্রেরণ। তাদেরকে রাজত্ব ও বাদশাহী প্রদান। চলার সময় মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি।

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার : এ আয়াতে বলা হয়েছে, وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ "এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" হযরত কাতাদাহ্ (র.) -এর মতে, তাওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝ থেকে (১২) বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলাম– (সূরা মায়েদাহ ৩য় রুকূ)। সকল রাসূলগণের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারও এর অন্ত র্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের নবী করীম ﷺ ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

এছাড়া নামাজ, জাকাত এবং অন্যান্য সদকা খায়রাতও এ অঙ্গীকারাভুক্ত। যার মূল মর্ম হলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর ঈমান ও তার পুরোপুরি অনুসরণ। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, অঙ্গীকারের মূল অর্থই হলো মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ।

اَلْعَهْدُ -এর হুকুম : এ আয়াতের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলি পালন করা আবশ্যক আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। আল্লাহ অন্যত্র বলেন– اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -তোমরা কৃত চুক্তি পূর্ণ কর। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বে এ শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী সকল মানবজাতি সমবেত হবে তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নির্দশন স্বরূপ একটা পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হবে তা ততো উঁচু হবে, এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

ثَمَنًا قَلِيْلًا -এর অর্থ ঃ ثَمَنًا قَلِيْلًا -এর অর্থ হচ্ছে সামান্য মূল্য। এর দ্বারা নগণ্য পার্থিব স্বার্থ ও সুবিধার কথা বলা হয়েছে যা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলার বিধি নিষেধ অমান্য ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ পার্থিব জগত ও রিপুর ইচ্ছা বাসনা হচ্ছে হীন তুচ্ছ।

হযরত হাসান (র.)-এর কাছে ثَمَنًا قَلِيْلًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা দুনিয়া এবং তার বস্তুসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন, بِاٰيٰتِيْ দ্বারা তাদের প্রতি নাজিলকৃত কিতাবসমূহ এবং ثَمَنًا قَلِيْلًا দ্বারা দুনিয়া ও রিপুর ইচ্ছা কামনা বাসনার কথা বুঝানো হয়েছ।

কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ : এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা? এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামি বায়তুলমাল [ইসলামি ধনভাণ্ডার] বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করতে পারে না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আজান, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দীন ও শরিয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মতো এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পরিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। –[দুররে মুখতার, শামী]

ঈসালে ছওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময় পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েজ : আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলিলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরিয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে বস্তুতঃ যে পড়েছে সেই যখন কোনো ছওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানো রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন, এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম : وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ [সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। অনুরূপভাবে কোনো ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

জ্ঞাতব্য : সাধারণ ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন– পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি যেগুলো শরিয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাজের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিন রাতে পাঁচবার করতে হয়। এ জন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু থেকে ধৈর্য ধারণ করার নাম নামাজ।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়, কোনো প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাজের সময়সূচির অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন এবং এসব প্রয়োজনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাজরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলন কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নামাজ সম্পর্কিত শর্তাবলি ও নিয়ামবলি পালন ও অনুসরণ করা নামাজ সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামাজ কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাজকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

নামাজ কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামাজ এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথা : নামাজের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলতঃ سُكُوْن قَلْب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামাজ সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব; বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়। তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য خُشُوْع বা বিনয়ে বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামাজ অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাজের নিয়মানুবর্তিতা দরুন গর্ব অহঙ্কার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

قوله وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ : صَلٰوة-এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদত, যাকে নামাজ বলা হয়। কুরআন কারীমে যতবার নামাজের তাকিদ দেওয়া হয়েছে– সাধারণতঃ اِقَامَتْ শব্দের মাধ্যমেই হয়েছে। এজন্য اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ [নামাজ প্রতিষ্ঠা]-এর ধর্ম অনুধাবন করা উচিত। اِقَامَتْ-এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য اِقَامَتْ স্থায়ী ও স্থিতিশীলতাকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় اِقَامَت صَلٰوة অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলি রক্ষা করে নামাজ আদায় করা। শুধু নামাজ পড়াকে اِقَامَت صَلٰوة বলা হয় না। নামাজের যত গুণাবলি, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই اِقَامَت صَلٰوة [নামাজ প্রতিষ্ঠা] -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন– কুরআন কারীমে আছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ [নিশ্চয় নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।]

নামাজের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটাবে, যখন নামাজ উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাজিকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা তারা নামাজ পড়েছে বটে; কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি।

قوله وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ: আভিধানিকভাবে জাকাতের অর্থ দু'রকম পবিত্র করা ও বর্ধিত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে জাকাত বলা হয়, যা শরিয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা এহং এবং শরিয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়।

যদিও এখানে সমসাময়িকভাবে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয়না যে, নামাজ ও জাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলদের উপরই ফরজ ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদায় বর্ণিতঃ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীতি করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ পাক বললেন, যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং জাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয় আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

قوله وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ : رُكُوْع রুকূর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা নামাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকূকারীগণের সাথে রুকূ কর।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাজের সমগ্র অঙ্গ প্রতঙ্গের মধ্যে রুকূকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে,এখানে নামাজে একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ [ফজর নামাজের কুরআনের পাঠ] বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাজকে বুঝানো হচ্ছে। তাছাড়া হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সেজদা শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকাত বা গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাজিগণের সাথে নামাজ পড়া। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকূ'র উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, ইহুদিদের নামাজে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ' ছিল না। রুকূ মুসলমানদের নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য رَاكِعِيْن শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকূও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণের সাথে নামাজ আদায় কর। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামাজ আদায় কর।

নামাজের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলি : নামাজের হুকুম এবং তা ফরজ হওয়া তো وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ [রুকূ'কারীদের সাথে] শব্দের দ্বারা নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রা.), তাবেয়ীন এবং ফকিহগণের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোনো কোনো সাহাবা (রা.) তো শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত জামাতহীন নামাজ জায়েজ নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাঁদের দলিল।

অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতে জামাত হলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকিদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী।

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা : أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
[তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস।] এ আয়াতে ইহুদি আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভৎর্সনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। [এ থেকে বুঝা যায়, ইহুদি আলেমগণ দীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত। নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, এ শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী– যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না। –[কুরতুবী]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কপিতপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে দোজখে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহর কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? দোজখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কিনা? উল্লিখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বুঝা না হয় যে, কেনো আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েজ নয় এবং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে রিবত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন, কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে অপরকেও নামাজ পড়তে বলতে পারবে না, এমন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে রোজাও রাখতে পারবে না, এমন কোনো কথা নেই। তেমনিভাবে কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিস্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দিবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোনো তাবলীগকারই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিস্পাপ? হযরত হাসান (র.) ইরশাদ করেছেন– শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূলকথা এই যে, أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?] আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশদানকারী [ওয়ায়েজকে] আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয় এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েজ নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েজ, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভূত মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোনো অপরাধ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

দুটি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার : সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দুটি মানসিক ব্যাধি যদ্দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিস্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এ যাবৎ যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লিখিত এ দুটি ব্যাধি থেকে।

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল :

১. অর্থগৃধ্নুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হলো এই যে, তার সম্পদ জাতির কোনো উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনো সু-নজরে দেখা হয় না।

২. **স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা :** তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থে জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া , মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারাণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের উপৎপত্তি হয়।

৩. এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন কোনো কথা মেনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদলাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ–খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষা, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত অমানবিক সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কুরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে– বলা হয়েছে– وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ [তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর] অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ় সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যমপন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচূর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দিবে।

আর নামাজ দ্বারা যশ–খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা নামাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও মান মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

বিনয়ের নিগুঢ় তত্ত্ব : اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ : [কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়] কুরআন ও সুন্নাহয় যেখানে خُشُوْع বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপরাগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইবাদত উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর (রা.) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে।'

হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خُشُوْع বা বিনয় অর্থ حَقّ বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর–ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ পাক তোমার উপর যা ফরজ করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেওয়া।

সারকথা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

জ্ঞাতব্য : خُشُوْع -এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ خُضُوْع ও ব্যবহৃত হয়। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় তা রয়েছে। এ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। কিন্তু خُشُوْع শব্দ মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়– যখন তা কৃত্রিম হবে না; বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতিস্বরূপ হবে। কুরআন কারীমে আছে– وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ [শব্দ নীচু হয়ে গেল] এবং خُضُوْع শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বুঝায়। কুরআন কারীমে আছে فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ [অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল।]

নামাজে বিনয়ের ফিকহগত মর্যাদা : নামাজে خُشُوْع বিনয়ের তাকিদ বার বার এসেছে। ইরশাদ হয়েছে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ [আমার স্মরণে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর]। এবং একথা স্পষ্ট যে, غَفْلَتْ অমনোযোগিতা স্মরণের পরিপন্থি। যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে غَافِلْ [অমনোযোগী] সে আল্লাহকে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ [এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।] রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নামাজ বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতাবোধ না থাকলে তা নামাজই নয়। অপর এক হাদীসে আছে যার নামাজ তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামাজ তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামাজ পড়ে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (র.) উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বুঝা যায়, خُشُوْع বা বিনয় নামাজের শর্ত এবং নামাজের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) সুফিয়ান ছাওরী ও হাসান বসরী (রা.) প্রমূখের অভিমত এই যে, খুশু বা বিনয় ব্যতীত নামাজ আদায় হয় না; বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে 'খুশু' নামাজের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাজের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেন যে, তাকবীরে তাহরীমরার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাজের অতটুকু অংশের ছওয়াব লাভ করবে না যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না। তবে ফিকহ অনুযায়ী তাকে নামাজ পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামাজ পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তিবিধানও করা যাবে না।

খুশুহীন নামাজও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় : সবশেষে 'খুশু' র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যে অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাজিও সম্পূর্ণভাবে নামাজ পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই হোক সে অন্ততঃ ফরজ আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ পাকের ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাজে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাজিদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কিয়ামতের দিন। দাবি আদায় করে দেওয়ার অর্থ– যেমন, কেউ নামাজ-রোজা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামাজ-রোজার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেওয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেওয়া। এ দুটির কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপরিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোনো সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনোটিই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَمِيْعًا : অর্থ– সকলে, সবাই। جَمْعٌ হতে مَجْمُوْعٌ অর্থে। جَمِيْعٌ এবং جَمِيْعًا উভয়ভাবে পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।

هُدًى : মাসদার। এখানে اسم فاعل তথা هَادٍ এর অর্থে এসেছে। হেদায়েতকারী, পথ প্রদর্শনকারী। বাব ضَرَبَ অর্থ– পথ প্রদর্শন করা।

يَحْزَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح ـ ز ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– না তারা চিন্তিত হবে, না তাদের কোনো ভয় থাকবে।

كَذَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك ـ ذ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করল, মিথ্যারোপ করল।

اَصْحٰبُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَاحِبٌ ; কখনো কখনো মালিককে صَاحِبٌ বলা হয়।

النَّارِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন نِيْرَانٌ অর্থ– আগুন।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরস্থায়ীগণ, যারা সর্বদা বর্তমান।

وَاَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) মাসদার اَلْاِيْفَاءُ জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পুরা কর।

عَهْدِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عُهُوْدٌ অর্থ– দৃঢ় অঙ্গীকার। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ارْهَبُوْن : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرَّهْبُ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اٰمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) মাসদার اَلْاِيْمَانُ জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ঈমান আন

اَنْزَلْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) মাসদার اَلْاِنْزَالُ জিনস صحيح অর্থ– আমি নাজিল করেছি।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– যে সত্য বলে, স্বীকৃতিদানকারী।

لَاتَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ তোমরা ক্রয় করো না।

اٰيٰتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اٰيَةٌ অর্থ– আয়াত, নিদর্শন, নিশান, আহকাম।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ– (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) মাসদার اَلْاِقَامَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কায়েম কর।

اٰتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) মাসদার اَلْاِيْتَاءُ জিনস مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা আদায় কর, দাও।

اِرْكَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মূলবর্ণ– (ر - ك - ع) মাসদার اَلرُّكُوْعُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা রুকূ কর, ঝুঁকে পড়, মাথা নত কর।

رٰكِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّكُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ك - ع) জিনস صحيح অর্থ– রুকূকারীগণ, কাকুতি-মিনতি কারীগণ।

اِسْتَعِيْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف فعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাহায্য কামনা কর।

لَكَبِيْرَةٌ : كَبِيْرَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন اكبر অর্থ– বড়, মহান।

يَظُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিশ্বাস রাখে।

مُلٰقُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাতকারীগণ

لَاتَجْزِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পরিশোধ করতে পারবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ : এখানে اَوْفُوْا ফে'ল فاعل আর بِعَهْدِىْ হলো متعلق অতঃপর ফে'ল فاعل ও متعلق মিলে جملة شرط আর اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ হলো جواب شرط অতঃপর উভয় মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قوله وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : এখানে اَقِيْمُوا ফে'ল ফা'য়েল আর الصَّلٰوةَ হলো مفعول অতঃপর ফে'ল فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে معطوف عليه , واو হলো حرف عطف আর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ হলো معطوف তৎপর معطوف عليه আর معطوف মিলে جُمْلَة عَاطِفَة

قوله وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে واو حاليه, اَنْتُمْ হলো مُبْتَدَأ, تَتْلُوْنَ হলো ফে'ল ও ফা'য়েল, আর اَلْكِتَابَ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল-ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়ে اَنْتُمْ -এর খবর مَحَلًّا مَنْصُوْب । অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ : এখানে اَنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل; هُمْ যমীর اسم ان, আর اِلَيْهِ হলো متعلق مقدم স্বীয় رَاجِعُوْنَ শিবহে ফে'লের। অতঃপর رَاجِعُوْنَ পরবর্তী مقدم متعلق মিলে اَنَّ خَبَر অতঃপর ان স্বীয় اسم ও خَبَر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٤٩)

অনুবাদ : (৪৯) আর যখন তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম ফেরাউনের দল হতে যারা তোমাদেরকে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়ার মানসে থাকত, হত্যা করত তোমাদের পুত্র-সন্তানদের এবং জীবিত রাখত তোমাদের মেয়ে-সন্তানদেরকে এবং এতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে অতি বড় পরীক্ষা ছিল।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٠)

(৫০) আর যখন আমি বিভক্ত করেছিল তোমাদের জন্য দরিয়া শূরকে [লোহিত সাগর] অনন্তর তোমাদেরকে উদ্ধার করলাম, আর ডুবিয়ে দিলাম ফেরাউনের দলকে আর তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٥١)

(৫১) আর যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে চল্লিশ রাত্রির, অনন্তর তোমরা স্থির করলে বাছুর-পূজা মূসার [তূরে যাওয়ার] পর, আর তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনে দৃঢ়।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٢)

(৫২) তবুও তোমাদের ক্ষমা করলাম এত বড় ব্যাপারের পরেও, যাতে তোমরা শোকর করবে।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (٥٣)

(৫৩) আর যখন আমি প্রদান করলাম মূসাকে কিতাব এবং মীমাংসার বস্তু, যাতে তোমরা ঠিক পথে চলবে।

শাব্দিক অনুবাদ

৪৯. وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ আর যখন তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের দল হতে يَسُوْمُوْنَكُمْ যারা তোমাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার মানসে থাকত سُوْٓءَ الْعَذَابِ কঠোর যন্ত্রণা يُذَبِّحُوْنَ হত্যা করত اَبْنَآءَكُمْ তোমাদের পুত্র-সন্তানদের وَيَسْتَحْيُوْنَ এবং জীবিত রাখত نِسَآءَكُمْ তোমাদের মেয়ে-সন্তানদেরকে وَفِيْ ذٰلِكُمْ এবং তোমাদের জন্য এতে ছিল بَلَآءٌ পরীক্ষা مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে عَظِيْمٌ অতি বড়।

৫০. وَاِذْ فَرَقْنَا আর যখন আমি বিভক্ত করেছিলাম بِكُمُ তোমাদের জন্য الْبَحْرَ দরিয়া শূরকে [লোহিত সাগর] فَاَنْجَيْنٰكُمْ অনন্তর তোমাদেরকে উদ্ধার করলাম وَاَغْرَقْنَآ আর ডুবিয়ে দিলাম اٰلَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের দলকে وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ আর তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫১. وَاِذْ وٰعَدْنَا আর যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম مُوْسٰٓى মূসার সাথে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً চল্লিশ রাত্রির ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ অনন্তর তোমরা স্থির করলে الْعِجْلَ বাছুর-পূজা مِنْۢ بَعْدِهٖ মূসার [তূরে যাওয়ার] পর وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ আর তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনে দৃঢ়।

৫২. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ তবুও তোমাদের ক্ষমা করলাম مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ এত বড় ব্যাপারের পরেও لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আশা ছিল তোমরা শোকর করবে।

৫৩. وَاِذْ اٰتَيْنَا আর যখন আমি প্রদান করলাম مُوْسَى মূসাকে الْكِتٰبَ কিতাব وَالْفُرْقَانَ এবং মীমাংসার বস্তু لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ আশা ছিল তোমরা ঠিক পথে চলবে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) আর যখন মূসা বলল, নিজ কওমকে, হে আমার কওম! নিশ্চয় তোমরা নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি করলে এই বাছুর [পূজা] সাব্যস্ত করণ দ্বারা, সুতরাং এখন তোমরা তওবা কর নিজেদের স্রষ্টার সমীপে, তৎপর তোমরা হত্যা কর একে অন্যকে; এটা তোমাদের জন্য হিতকর হবে তোমাদের স্রষ্টার সমীপে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কুবল করলেন; নিশ্চয় তিনি এরূপই যে, তওবা কবুল করে থাকেন এবং করুণা বর্ষণ করেন।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٥)

(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায়, যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই প্রকাশ্যে, অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল এবং তোমরা দেখছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٦)

(৫৬) অনন্তর তোমাদের জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর করবে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٥٧)

(৫৭) আর ছায়া স্বরূপ করলাম তোমাদের উপর মেঘকে এবং পাঠালাম তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া; তোমরা খাও, তার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে যা কিছু আমি তোমাদেরকে দান করেছি; আর তারা আমার কোনো অনিষ্ট করেনি পরন্তু নিজেদেরই অনিষ্ট করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

৫৪. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى আর যখন মূসা বলল لِقَوْمِهٖ নিজ কওমকে يٰقَوْمِ হে আমার কওম! اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ নিশ্চয় তোমরা ভয়ানক ক্ষতি করলে اَنْفُسَكُمْ নিজেদের بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ এই বাছুর [পূজা] সাব্যস্ত করণ দ্বারা فَتُوْبُوْٓا সুতরাং এখন তোমরা তওবা কর اِلٰى بَارِئِكُمْ নিজেদের স্রষ্টার সমীপে فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ তৎপর তোমরা হত্যা কর একে অন্যকে ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য হিতকর হবে عِنْدَ بَارِئِكُمْ তোমাদের স্রষ্টার সমীপে فَتَابَ عَلَيْكُمْ অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কুবল করলেন اِنَّهٗ নিশ্চয় هُوَ التَّوَّابُ তিনি এরূপই যে, তওবা কবুল করে থাকেন الرَّحِيْمُ এবং করুণা বর্ষণ করেন।

৫৫. وَاِذْ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা বললে, يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায় حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই جَهْرَةً প্রকাশ্যে فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এবং তোমরা দেখছিলে।

৫৬. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ অনন্তর তোমাদের জীবিত করলাম مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ তোমাদের মৃত্যুর পর لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আশা ছিল যে, তোমরা শোকর করবে।

৫৭. وَظَلَّلْنَا আর ছায়া স্বরূপ করলাম عَلَيْكُمُ তোমাদের উপর الْغَمَامَ মেঘকে وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ এবং পাঠালাম তোমাদের নিকট الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى মান্না ও সালওয়া كُلُوْا তোমরা খাও مِنْ طَيِّبٰتِ তার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে مَا رَزَقْنٰكُمْ যা কিছু আমি তোমাদেরকে দান করেছি; وَمَا ظَلَمُوْنَا আর তারা আমার কোনো অনিষ্ট করেনি وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু নিজেদেরই অনিষ্ট করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اٰلَ فِرْعَوْنَ -এর পরিচয় : আমালেকা বংশোদ্ভূত এককালীন মিসরীয় নৃপতিদের فِرْعَوْنَ উপাধি ছিল। যেমন রোমের বাদশার উপাধি কায়সার, পারস্যের বাদশার উপাধি কিসরা, ইয়েমেনের বাদশাহের উপাধি তুব্বা এবং হাবশার বাদশাহের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। দ্বিতীয় রেসিসিস ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফেরাউন। আরবীয়দের কাছে সে ওয়ালীদ ইবনে মাস'য়াব ইবনে রাইয়ান নামে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, সাম'য়াব ইবনে রাইয়ান। এখানে فِرْعَوْنَ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালীন ফেরাউনসহ তার প্রজাপুঞ্জকে বুঝানো হয়েছে। এখানে اٰلَ فِرْعَوْنَ উক্তিতে فِرْعَوْنَ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত। –[ইবনে কাছীর]

কেউ কেউ বলেন, اٰلَ فِرْعَوْنَ -এর অর্থ شَخْصِيَّة তথা ফিরাউনের নিজ ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে তার কথা উল্লেখের স্থলে তার অনুসারীদের উল্লেখ করণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ইসরাঈল বংশের চরম অবনতি ঘটেছিল। ফেরাউন গোষ্ঠী তাদেরকে দাসরূপে পরিণত করেছিল। তদুপরি একদা ফেরাউন স্বপ্নে দেখে যে, বায়তুল মাকদিসের দিক হতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে মিশরের প্রত্যেক কিবতীদের ঘরে প্রবেশ করছে কিন্তু ইসরাঈল বংশের কারো ঘরে তা প্রবেশ করছে না। তার স্বপ্নটির এরূপ তাবীর করা হয়েছিল যে, ইসরাঈল বংশে একে মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন যাঁর হাতে তার প্রভুত্ব ও অহংকারের অবসান ঘটবে। তিনি তার 'খোদা' দাবির উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। তাই অভিশপ্ত ফেরাউন অধ্যাদেশ জারি করে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেসব মহিলা গর্ভবতী হবে তাদের সরকারিভাবে দেখাশোনা করা হবে। যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করতে হবে। আর কন্যা সন্তান জন্মিলে তাকে জীবিত রাখতে হবে। তার আদেশ অনুসারে বনী ইসরাঈলের ১২০০ শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। ফেরাউনের এটাও আদেশ ছিল যে, বনী ইসরাঈলকে বিনা পারিশ্রমিকে কঠিন কাজে নিযুক্ত করতে হবে; দুঃসাধ্য কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে।

আল্লামা সুয়ূতীসহ আরো অনেকের মতে এমন মহান ব্যক্তিত্বের জন্মের সংবাদ ফেরাউনকে কতক জ্যোতিষী দিয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম : বনী ইসরাঈলদের ভীষণ দুর্দিনে হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইমরান ইবনে মা'ছান অথবা ইমরান ইবনে কামাত। মাতার নাম ইউকাবাদ। তাঁর বংশ পরম্পরা ৫ম পুরুষে গিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর সাথে মিলিত হয়। তাঁর জন্মের পর তিন মাস পর্যন্ত তিনি আপন মাতা কর্তৃক গোপনে লালিত পালিত হন। অতঃপর ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে একটি বাক্সে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেন। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় বাক্সটি স্রোতের তালে তাল মিলিয়ে ফেরাউনের প্রসাদ সম্মুখস্থ নদীর ঘাটে গিয়ে উপনীত হয়। ফেরাউনের স্ত্রী মহিয়সী আছিয়া বা তার পরিবারস্থ কেউ হযরত মূসা (আ.)-কে বাক্স থেকে উদ্ধার করে সযত্নে প্রতিপালন করেন। ঘটনাক্রমে হযরত মূসার মাতাই তাঁর ধাত্রী নিযুক্ত হন। ফেরাউনের প্রাসাদেই হযরত মূসা (আ.) প্রতিপালিত ও বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর অন্তরে স্বজাতি প্রীতি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। একদা মূসা জনৈক কিবতীকে কোনো এক ইসরাঈলীর প্রতি অত্যাচার করতে দেখে উত্তেজিত হয়ে কিবতীকে চপেটাঘাত করেন, এতে হতভাগ্য কিবতী মৃত্যুবরণ করে। আরেক দিন অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে হযরত মূসা ইসরাঈলী ব্যক্তিটিকে প্রথমে ভর্ৎসনা করে অতঃপর কিবতীর প্রতি হাত বাড়াতেই ইরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করল যে, মূসা হয়তো বিরক্ত হয়ে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তাই সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে যে, তুমি আমায় হত্যা করো না, যেমনটি কাল এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে। ফেরাউনের দরবারের এক শুভাকাঙ্ক্ষী পদস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে মূসা (আ.) তাঁর প্রাণ দণ্ডের আদেশ শুনে লোকটির পরামর্শ মোতাবেক মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ান শহরে হিজরত করেন। তথায় হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা হযরত সফুরাকে বিবাহ করে দশ বছর সেখানে অবস্থান করেন। –[কাসাসুল কুরআন]

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও পরবর্তী ঘটনা

হযরত মূসা (আ.) মাদইয়ান থেকে মিসর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তূরে সাইনা পর্বত চূড়ায় খোদায়ী জ্যোতি দর্শন পূর্বক আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী ও করুণা লাভ করে আপন সহোদর ভ্রাতা হারূনসহ নবুয়ত লাভ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরাউন গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে ইসরাঈল জাতির মুক্তির জন্য মিসর প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর ভ্রাতা হারূনকে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে সত্য ধর্মের দাওয়াত প্রদান করেন এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি প্রদানের দাবি পেশ করেন; কিন্তু তা গৃহীত না হওয়ায় তিনি আল্লাহর প্রত্যাদেশানুযায়ী নবুয়তের মু'জিযা স্বরূপ নিজ হাতের আলোক প্রতিফলনের অলৌকিক শক্তি এবং বিস্ময়কর শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতি প্রদর্শন করেন। ফেরাউন তা দর্শনে চমৎকৃত হয়ে এটাকে জাদুচক্র মনে করতঃ মিসরের প্রধান জাদুকরদেরকে একত্র করে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করার আহবান জানায়। হযরত মূসা (আ.) নবুয়তী শক্তির মাধ্যমে জাদুকরদের প্রদর্শিত খেলা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিলে সমস্ত জাদুকর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করে। এতে ফেরাউনের হিংসা ও আক্রোশ আরো বৃদ্ধি পায়। সে ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি আরো কঠোর হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) অলৌকিক শক্তি বলে ফেরাউনের সাথে অত্যাচারী মিসরিদের শাস্তি প্রদান করেন। সে শাস্তি ছিল অতি বিস্ময়কর। কখনো মিসরের নদ-নদী ও জলাশয়সমূহে রক্তস্রোত বয়ে যেত, কখনো ব্যাঙ, জোঁক, মশা, মাছি প্রভৃতি নানা জাতীয় ছোট জীব ও কীট পতঙ্গের উপদ্রবে দেশবাসী অস্থির হয়ে উঠত। কখনো নানা রোগ ব্যাধিতে মিসরের জনগণ আক্রান্ত হয়ে পড়ত। তথাপিও ফেরাউনের ধর্মদ্রোহীতা কমলো না। বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিতেও সে রাজি হলো না। তারপর আরো ভয়াবহ শাস্তি অবতীর্ণ হতে লাগল-বিষাক্ত ধূলিঝড়, গাঢ় অন্ধকার, বজ্র বিদ্যুৎ, শিলা বৃষ্টি, ব্যাপক হারে আকস্মিক মৃত্যু, সংক্রামক ব্যাধি পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তুলল। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ সকল বিপদ থেকে নিশ্চিতভাবে নিরাপদে ছিল। উপর্যুপরি বিপদে যখন মিসর রাজ্য ধ্বংসের-সম্মুখীন, তখন দেশবাসীর অভিযোগ ও ফরিয়াদে ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগ করার আদেশ জারি করে। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে কেনানের দিকে যাত্রা করলে ফেরাউনের অন্তরে প্রতি হিংসার দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং স্বসৈন্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

বনী ইসরাঈলের মুক্তি ও ফেরাউনের ধ্বংস : আমর ইবনে মাইমূন আওদী (র.) বলেন, যখন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে ফেরাউনের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য কিনানের উদ্দেশ্যে বের হন এবং এ সংবাদ ফেরাউন জানতে পারে, তখন সে ঘোষণা করে দেয় যে, প্রত্যুষে যখন মোরগ ডাকবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সকলে বের হয়ে তাদেরকে ধরে হত্যা করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেদিন ভোর পর্যন্ত মোরগ ডাকে নি। রাত্রি শেষে মোরগের আওয়াজ শোনার পর ফেরাউন একটি বকরি জবাই করে, ঘোষণা করল যে, আমার এ বকরির কলিজা খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে অস্ত্র-সজ্জিত ছয় লক্ষ্য কিবতী সৈন্য আমার নিকট উপস্থিত হওয়া চাই। কথামতো সৈন্য হাজির হয়। এ বিরাট বাহিনীসহ ফেরাউন শান-শওকতে বের হয়। তারা নীল নদ বা জর্দান নদীর তীরে বনী ইসরাঈলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের জন্য বিরাট সংকট। পশ্চাদপসরণ করলে ফিরাউনের তলোয়ারের আঘাতে মরতে হবে; সামনে অগ্রসর হলে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

তখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে আদশে এলো যে, তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা নদী পৃষ্ঠে আঘাত হান। লাঠি দ্বারা আঘাত হানা মাত্র নদীর তলদেশ দিয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরসহ সেই পথ ধরে পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাদেরকে পার হতে দেখল তারা সে পথে ঘোড়া চালিয়ে দিল। যখন তারা মাঝপথে আসল, আল্লাহ তা'আলা পানিকে মিলিত হয়ে যাওয়ার হুকুম করলেন, তখন সেখানে তাদের সবার সলিল-সমাধি ঘটলো। বনী ইসরাঈল আল্লাহর কুদরতের এ দৃশ্য কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হলো। আল্লাহ তা'আল্লার فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করে। –[হাক্কানী, ইবনে কাসীর]

قوله وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ **-এর ব্যাখ্যা :** পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা মহা হৃদয় বিদারক কাজ। এর মধ্যে রয়েছে বিরাট ধৈর্যের পরীক্ষা। পাশাপাশি যখন কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তখন তাতে থাকে ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার পরীক্ষা। বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে তারা তখন সতীত্ব রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর বিপদ-মসিবত থেকে মুক্তি দান মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ ও নিয়ামত। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরীক্ষা।

مَعْنَى الْبَلَاءِ (بَلَاءٌ -এর অর্থ) : بَلَاءٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَلَايَا । আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, بَلَاءٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, ইবনে আবূ আলিয়া এবং সুদ্দী (র.) বলেন, এ আয়াতে بَلَاءٌ শব্দের অর্থ নিয়ামত প্রদান, মেহেরবানি, অনুগ্রহ। আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন, ذٰلِكُمْ ইসমে ইশারা দ্বারা যদি ফেরাউন সম্প্রদায়ের নির্যাতনমূলক কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন তার অর্থ হবে পরীক্ষা। আর যদি نَجَاةٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন উহার অর্থ হবে নিয়ামত তথা অনুগ্রহ।

قوله وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিলেন, আর ফেরাউন বংশধরকে ডুবিয়ে মারলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশে স্বীয় দলসহ সাগরের পানি ফাঁকাকৃত রাস্তা দিয়ে পর হয়ে গেলেন। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফেরাউন তার দলসহ উক্ত পথে নেমে পড়লে উভয়দিক থেকে পানি এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দিল।

قوله وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً -এর ব্যাখ্যা : যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন সম্প্রদায়কে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে বনী ইসরাঈলকে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আসমানি গ্রন্থ তাওরাত দানের অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং এর জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করেন। তা ছিল পূর্ণ জিলকাদ মাস ও জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। মোট চল্লিশ দিন। অধিকাংশ তাফসীর বিশারদ وَاعَدْنَا শব্দকে বাব مُفَاعَلَةٌ থেকে পড়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, হযরত আর মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে তূর পাহাড়ে ৪০ দিন অবস্থানের অঙ্গীকার করেছিলেন।

আর আয়াতে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً দ্বারা পূর্ণ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উদ্দেশ্য। আরবি মাসের প্রারম্ভ রাত্রি হতে ধরা হয় এ কারণে اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا না বলে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে অবস্থান কালে সামেরী কতৃক গো-বৎস তৈরিকরণ ও জাতির পক্ষ থেকে উহার পূজা-অর্পণের ঘটনার প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করে। তবে এখানে সমস্ত বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য নয়, বরং হযরত হারুন (আ.)-এর বার হাজার সঙ্গী অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যে ৭০ জন তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্যান্য বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য। –[রুহুল মা'আনী]

গো-বৎসের ঘটনা : যখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) এক মাসের ওয়াদা করে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট স্বীয় ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে 'তূরে সীনা' যান। হযরত মূসা (আ.) এক মাসের মধ্যে ফিরে না আসায় ক্ষীণ বিশ্বাসী ইহুদিরা বিচলিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগ 'সামিরী' নামক জনৈক গো-বৎস পূজারী সুকৌশলে ইহুদিদের নিকট থেকে সোনা-গয়না সংগ্রহ করে সেগুলো দ্বারা সুদর্শনীয় গো-বৎস প্রতিমূর্তি তৈরি করে। সে একজন সুনিপুণ স্বর্ণকার হিসেবে এ কাজটি অনায়াসে ও চমৎকাররূপে সম্পাদন করে। কথিত আছে যে, উক্ত 'সামিরী' হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পদদলিত সামান্য মৃত্তিকা পূর্ব থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল। সেগুলো উক্ত গো-বৎস প্রতিমূর্তির ভেতর ঢুকিয়ে দিলে সেটা হাম্বা-হাম্বা ডাকতে থাকে। তখন সে ইহুদিদেরকে এই বলে প্ররোচিত করে যে, উক্ত গো-বৎসের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আবির্ভূত হয়েছেন। আর এদিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ পাননি এবং তিনি তথায় ইন্তেকাল করেছেন। ফলে ইহুদিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর বাধা উপেক্ষা করে গো-বৎস পূজা আরম্ভ করে দিল।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ দিন পর মহান রাব্বুল্ আলামীনের আদেশে 'তাওরাত' গ্রন্থ লাভ করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসেন। হযরত মূসা (আ.) নিজের সম্প্রদায়ের গো-বৎস পূজা দেখে রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি গো-বৎসটি আগুনে পুড়িয়ে সেটার ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেন। এতে বনী ইসরাঈল লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা ঘোষণা : হযরত মূসা (আ.) সমগ্র জাতির মধ্য হতে ৭০ ব্যক্তিকে বেছে নেন এবং বলেন, 'তোমরা গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নাও, আমি তোমাদেরসহ আল্লাহর নিকট যাব এবং তোমাদের আবেদন তাঁর নিকটই পেশ করব।' তারা হযরত মূসার সাথে তূর পর্বতে গমন করার পর তিনি আল্লাহর নিকট আরজ করেন– 'হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈলরা গো-বৎস পূজা হতে তওবা করেছে, আপনি তাদের ঐ গুনাহের শাস্তি ঠিক করে দিন।' হুকুম হলো–'একে অপরকে হত্যা করতে হবে।' গো-বৎস পূজারীগণ এবং যারা নীরব ছিল, তারা ঘর হতে বের হয়ে একটি মাঠে গর্দান পেতে দিল। যারা গো-পূজা হতে নিষেধ করেছিল তারা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু এতে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে একে অন্যকে হত্যা করতে পারছিল না।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্ধকার নেমে এলো, যাতে একে অন্যকে দেখতে না পায়। তখন পিতা পুত্রকে, ভাই ভাইকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার লোক নিহত হয়ে গেল। তখন বনী ইসরাঈলের বিবি, বাচ্চা এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সবাই ক্রন্দন করতে আরম্ভ করেন, আর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিহতদের ক্ষমা করে দেন এবং বাকিদের তওবা কবুল করে নেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قوله وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ -এর মধ্যকার ظُلْم দ্বারা উদ্দেশ্য : وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ বাক্যে ظُلْم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কেননা বনী ইসরাঈল গো-বৎস পূজার মাধ্যমে ইবাদতকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করেছিল। আর ظُلْم বলা হয় وَضْعُ الشَّيْئِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ তথা কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখা।

কারো মতে সামেরীর কাজে তাদের বাধা প্রদান না করাকেই আয়াতে ظُلْم বলা হয়েছে।

كِتَابْ ও فُرْقَانْ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে كِتَابْ দ্বারা তাওরাত কিতাব উদ্দেশ্য। আর فُرْقَانْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে তাফসীরবিশারদদের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, فُرْقَانْ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। তাওরাতকে কিতাব ও ফুরকান বলা হয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থ যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী উজ্জ্বল প্রমাণ।
২. ইবনে বারা বলেন, এর দ্বারা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী শরিয়ত উদ্দেশ্য।
৩. মুজাহিদ (র.) বলেন, فُرْقَانْ দ্বারা হক ও বাতিল অথবা কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ উদ্দেশ্য।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সাহায্য উদ্দেশ্য যদ্দ্বারা শত্রু এবং বন্ধুর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। এ জন্যই বদরের দিনকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ বলা হয়েছে।
৫. কেউ কেউ বলেন, কুরআন উদ্দেশ্য।
৬. কারো কারো মতে এখানে مُحَمَّدًا শব্দটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত ছিল এরূপ– اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَمُحَمَّدًا الْفُرْقَانَ

قوله فَتُوْبُوْآ اِلٰى بَارِئِكُمْ -এর ব্যাখ্যা : তওবা মৌলিকভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারেই হয়ে থাকে। তদুপরি اِلٰى بَارِئِكُمْ বলার কারণ হচ্ছে, তওবার মধ্যে একাগ্রতার সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা যে, তিনি তোমাদেরকে নিষ্কলুষভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং অবস্থা ও আকৃতির মধ্যে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা بَارِئْ শব্দটি بَرَاءْ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ নিষ্কলুষ করা, সুঠাম আকৃতিতে তৈরি করা। এ শব্দটি দ্বারা রিয়া তথা লৌকিকতার ভাব থেকে তওবাকে মুক্ত রাখার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তওবার মধ্যে রিয়া থাকা তওবার পরিপন্থি। –[বায়যাবী]

قوله فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈল গো-বৎস পূজা করে যে পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল তা থেকে তওবা প্রসঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসল যে, তোমরা নিজেদেরকে নিজেরই হত্যা করো। কেননা বনী ইসরাঈলের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে একে অপরকে হত্যা করাই ছিল তওবা।

কারো মতে এখানে বাস্তবিক হত্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমিত্ব নষ্ট করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া এবং কু প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, যারা গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়নি তাদেরকে পূজারীদের হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

كَيْفِيَّةُ الْقَتْلِ (হত্যার ধরন) : আল্লামা বায়যাবী বলেন, বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহর নির্দেশানুসারে পরস্পরকে হত্যা করার জন্য মাঠে একত্রিত হয়েছিল; কিন্তু একে অন্যকে দেখে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে হত্যা করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘনঘটার অন্ধকারে তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন, যেন তারা পরস্পরকে দেখতে না পায়। অতঃপর তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেল। অবশেষে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল এবং তাদের তওবা কবুল হলো। এদিন তাদের সত্তর হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তারা দু'সারিতে দাঁড়িয়ে এক সারি অন্য সারিকে হত্যা করা শুরু করেছিল।

কেউ কেউ বলেন,হযরত মূসা (আ.)-এর সত্তর জন সাথী তাদেরকে হত্যা করেছিল।

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ اَرْبَعِيْنَ وَثَلٰثِيْنَ (ত্রিশ ও চল্লিশের দ্বন্দ্ব নিরসন): وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً কালামটি প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম ওয়াদা চল্লিশ দিনের ছিল। অথচ সূরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে– وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا عَشْرًا এ ভাষ্যটি প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম ওয়াদা ছিল ত্রিশ দিনের, সুতরাং এ পরস্পর বিরোধ নিরসন হবে কিরূপে?

এর উত্তরে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, প্রাথমিকভাবে ওয়াদা মূলত ত্রিশ দিনেরই ছিল, পরে আবার দশ দিনের ওয়াদা করা হয়েছে। অতএব, উভয় ওয়াদা একত্রিতভাবে চল্লিশ দিনেরই হয়ে যায়। যেমন হয়েছে–

ثَلٰثِيْنَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

قوله لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً আয়াতের ঘটনা : হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বত হতে তাওরাত আনয়ন করে বনী ইসলাঈলের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 'এটা আল্লাহর অবতারিত কিতাব'। তাদের মধ্য হতে কোনো কোনো দুষ্টলোক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'যদি আল্লাহ স্বয়ং না বলে তাবে আমরা এটা মেনে নেব না, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বলেন, তোমরা তূর পর্বতে চল, তোমাদের এ বাসনাও পূর্ণ হবে। বনী ইসরাঈল এ কাজের জন্য ৭০ জন লোক নির্বাচন করে, তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পর্বতে পাঠায়। তারা তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে। কিন্তু তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলতে লাগল যে, আমাদের তো বাণী শ্রবণে তৃপ্তি লাভ হয় না, কে বলছে তা আমরা জানি না; যদি আল্লাহকে দেখতে পাই তবে নিঃসন্দেহে মেনে নেব।'

যেহেতু পার্থিব জগতের আল্লাহকে দেখার সামর্থ্য কারো নেই। কাজেই এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন– "হে আল্লাহ! আমি বনী ইসরাঈলের নিকট কি জবাব দেব? এরা তো তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, যদি আপনার এ ইচ্ছাই ছিল, তবে তাদের পূর্বে আমাকে ধ্বংস করতেন। হে আল্লাহ! আহমকদের অন্যায়ের কারণে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।" তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করা হয় এবং তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এরাও মূলত গো-বৎস পূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হয়ে গেল। তারপর তাদেরকে পরপর একের সামনে অপরকে জীবিত করলেন। এ ঘটনার প্রতিই উপরিউক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বায়ানুল কুরআন, ইবনে কাছীর)

বর্ণিত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটা গো-বৎস পূজাজনিত অপরাধের তওবায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের পূর্বেকার ঘটনা। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এটা কতলের পরবর্তী ঘটনা। অর্থাৎ যারা নিহত হয়নি তারাই আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল, ফলে হযরত মূসা (আ.) তাদের বিশেষ বিশেষ সত্তর জনকে তূর পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আয়াতে এমন কোনো নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই যে, ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল এবং উল্লিখিত সত্তর জন গো-বৎস পূজারী ছিল কি-না। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সত্তর জনের মৃত্যুর সাথে হযরত মূসা (আ.) -এর মৃত্যু হয়নি। দু'টি কারণে–

(১) আল্লাহ এবং মূসা (আ.)- মুখোমুখি কথাবার্তা হচ্ছিল। (২) মূসা (আ.) সম্পর্কে فَلَمَّآ اَفَاقَ বলা হয়েছে। আর ইফাকাহ অর্থ বক্তৃতা অবস্থা থেকে হুঁশে ফিরে আসা, মৃত্যুবরণ থেকে নয়।

اَلصَّاعِقَةُ -এর মর্মার্থ : صَاعِقَةٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে–

(১) হযরত ইবনে জারীর (র.) রবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, صَاعِقَةٌ অর্থ হচ্ছে– জিবরাঈল (আ.)-এর হুঙ্কার ধ্বনি।

(২) ইবনে জারীর (র.) সা'দী থেকে বর্ণনা করেন, আকাশ হতে যে অগ্নি অবতারিত হয়ে বনী ইসরাঈলের সত্তর জনকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল একেই صَاعِقَةٌ বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ এ কথা কারা কাকে বলেছিল? প্রসিদ্ধ মতানুসারে বাক্যটি ঐ সত্তরজন লোকের যারা তাওরাত গ্রহণের সময় মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর স্বগোত্রে ফিরে আসার পর, এমনকি গো-বৎস পূজকদের হত্যা ও গো-বৎসকে জ্বালিয়ে দেওয়ার পর কতিপয় ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল। কারো কারো মতে এ উক্তিকারকদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। কেউ কেউ বলেন, সকল বনী ইসরাঈলই এ উক্তি করেছিল। –[রূহুল মা'য়ানী]

قوله ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ -এর ব্যাখ্যা : এ উক্তিটির সরলার্থ হচ্ছে, "আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি।" এখানে مَوْتٌ শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। পুনরায় জীবিত করার ঘটনা এই যে, বনী ইসলাঈলের প্রেরিত ৭০ জন প্রতিনিধি বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করার পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন যে, "হে আল্লাহ! আমার জাতি এমনিতেই আমার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে আসছে। এখন তো তারা বলবে যে, আমি তাদের প্রতিনিধিদেরকে কোথাও নিয়ে কোনো উপায়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে তাদের এ অপবাদ হতে পরিত্রাণ প্রদান করুন।" আল্লাহ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাদেরকে এক এককে অপরের সামনে জীবিত করে দিলেন। এটাকেই আয়াতে بَعْثٌ বলা হয়েছে। এ উক্তি দ্বারা কিয়ামতের পুনরুত্থান উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো সময় بَعْثٌ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়াকেও বলা হয়। যেমন আসহাবে কাহফের ব্যাপারে নিদ্রোত্থিত হওয়াকে বলা হয়েছে।

سَبَبُ الصَّاعِقَةِ (বজ্রপাতের কারণ) : বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধি দল যখন হযরত মূসা (আ.) কে বলেছিল, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা ব্যতীত আপনার আনীত এ কিতাবকে বিশ্বাস করতে পারি না। অথচ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দেখা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অন্যদিকে মু'জিযা প্রদর্শনের পর বিশ্বাস করা ফরজ হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে অবতারিত অগ্নিবান অথবা জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়ংকর হুঙ্কার দ্বারা তাদেরকে সাময়িকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এ আয়াতটি দ্বারা তীহ প্রান্তরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের আদি বাস ছিল শাম, বর্তমান সিরিয়া অঞ্চল। এ সময় 'আমালেকা' নামক এক শক্তিশালী জাতি শাম অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ফেরাউনের থেকে মুক্তিদানের পর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের আদি নিবাস পবিত্র ভূমি শামকে আমালেকাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা শামের দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা যখন শামের উপকণ্ঠে পৌঁছে, তখন ১২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের কথা শ্রবণ করে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং জিহাদের অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা

এখানে অবস্থান করছি।" আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে তীহ প্রান্তরে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আত্মভোলা ও দিকভ্রান্ত অবস্থায় অতিবাহিত করার শাস্তি নাজিল করেন। তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। এ প্রান্তরে তাদের বিশোর্ধ্ব বয়সের সমস্ত লোক ইন্তেকাল করে। হযরত মূসা এবং হারূন (আ.) ও এখানেই ইন্তেকাল করেন। সেখানে কোনো ছায়া ছিল না। ফলে মেঘমালার দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে ছায়া দান করেছিলেন। وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ; দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

تِيْه-এর পরিচয় : তীহ শব্দের অর্থ– জ্ঞান বুদ্ধিহীন, দিশাহারা ও দিকভ্রম হওয়া। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় যে মরুপ্রান্তরে দিকভ্রম অবস্থায় পতিত হয়েছিল, উহাকেই তীহ প্রান্তর বলা হয়। তা সিরিয়া ও সিনাই অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ প্রান্তরে তারা প্রখর রৌদ্র-তাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ তা'আলা একটি হালকা মেঘ খণ্ড দ্বারা তাদেরকে ছায়া দানের ব্যবস্থা করেন। রাতের বেলায় অন্ধকারের অভিযোগ করলে আকাশ হতে একটি উজ্জ্বল অগ্নি পিণ্ড অন্ধকার দূর করার জন্য চলে আসত। এ প্রান্তরে তাদের পরিহিত বস্ত্র পুরাতন হয়নি; বরং সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ছিল।

অতঃপর তাদের ক্ষুধা অনুভূত হলে আল্লাহ তা'আলা লতা-পাতার উপর তুরঞ্জবীন (মান্না) উৎপন্ন করে দেন, যা সুবহে সাদেক থেকে ফজর পর্যন্ত বরফের মতো অবতরণ করত। তারা তা কুড়িয়ে আনত এবং ভরত (সালওয়া) পাখিসমূহ তাদের নিকট সমবেত হতো। এ দু'জাতীয় উৎকৃষ্ট খাদ্য তারা তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করত। তাদের প্রতি এ নির্দেশ ছিল যে, "তোমরা এগুলো প্রয়োজন মতো গ্রহণ করবে; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না।" কিন্তু তারা লোভের বশবর্তী হয়ে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে। ফলে সঞ্চিত গোশত পঁচতে থাকে। এ কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজেদের জন্য অনিষ্টকর বলে ঘোষণা করেন।

غَمَامٌ-এর অর্থ : غَمَامٌ শব্দটি غَمَامَةٌ -এর বহুবচন। মেঘ আকাশকে ঢেকে ফেলে বিধায় غَمَامٌ বলা হয়। আর غَمَامٌ সাদা মেঘকে বলা হয়। তীহ প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে এ মেঘ দ্বারা ছায়া দান করেছিলেন। অতএব তারা প্রখর রোদের তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। –[ইবনে কাসীর]

اَلْمَنّ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَنّ -এর অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে গাছের উপর বনী ইসরাঈলের জন্য মান্না অবতীর্ণ হতো এবং তারা তা নিয়ে ইচ্ছা মতো ভক্ষণ করতো তাকে اَلْمَنّ বলা হয়।

সুদ্দীর মতে বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল যে, এখানে আমরা কোথায় খাদ্য পাব? তখন তাদের জন্য আদা গাছের উপর مَنّ অবতীর্ণ করা হয়।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, মান্না তাদের ঘরের উপর বরফের ন্যায় পতিত হতো যা ছিল দুধের চেয়ে শুভ্র ও মধুর চেয়ে মিষ্টি। ভোর থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত তা নাজিল হতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনানুযায়ী আহরণ করতো। আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম বলেন, মান্না হলো মধু। মূলত মুফাসসিরীনদের বক্তব্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, কারো মতে মান্না এক প্রকার খাদ্য। কারো মতে পানীয়। তবে এটা এমন এক ঐশী নিয়ামত যা বিনা কষ্টে পাওয়া যেত। পানি ছাড়া ভক্ষণ করলে হতো খাদ্য, আর পানি মিশ্রিত করলে হতো পানীয়। –[ইবনে কাছীর]

সালওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা এক প্রকার পাখি যা তারা ভক্ষণ করত।

হযরত কাতাদাহ্ বলেন, লাল রং-এর পাখী। দক্ষিণা বাতাস এগুলোকে এনে তাদের কাছে একত্রিত করতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজন মতো তা জবাই করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতো, প্রয়োজনের বেশি নিতে চাইলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।

ইমাম সুদ্দী বলেন, বনী ইসরাঈল যখন তীহ প্রান্তরে গিয়েছিল তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল, এখানে আল্লাহ তা'আলা مَنّ অবতীর্ণ করেন, যা আদা গাছের উপর পড়ত। আর سَلْوٰى যা ছিল পাখীর ন্যায়, তারা উক্তি পাখী থেকে মোটাগুলো জবাই করতো।

ইবনে জুরাইজ বলেন, কোনো লোক যদি একদিনে দুই দিনের খাদ্য গ্রহণ করতো তাহলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। তবে শুধু শুক্রবারে দু'দিনের খাদ্য গ্রহণ করা হতো। কেননা শনিবার ইবাদতের দিন ছিল। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ

نَجَّيْنٰكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ অর্থ আমরা নাজাত দিয়েছি, আমরা রক্ষা করেছি। এখানে كُمْ টি ضمير منصوب متصل

اَبْنَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اِبْنٌ অর্থ সন্তানগণ।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা জীবিত ছেড়ে দিত।

نِسَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اِمْرَأَةٌ এ বহুবচনকে جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ বলে। অর্থ– নারীগণ, স্ত্রীগণ।

فَرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বিদীর্ণ করে দিলাম।

التَّوَّابُ : এটি فَعَّالٌ-এর ওজনে মোবালাগার সীগাহ। বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ث ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– অধিক তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল تَوَّابٌ আল্লাহর মোবারক নাম।

نَرَى : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– আমরা দেখতে পাব।

جَهْرَةً : শব্দটি বাব فَتَحَ এর মাসদার। অর্থ– প্রকাশ্য।

الصّٰعِقَةُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন صَوَاعِقُ অর্থ– বিজলী, বিদ্যুৎ।

تَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) মাসদার اَلنَّظْرُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দেখছ।

ظَلَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ظ ـ ل ـ ل) মাসদার اَلتَّظْلِيْلُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করে দিয়েছি।

الْغَمَامَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন غَمَامَةٌ অর্থ– মেঘ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ– (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ : এখানে نَجَّيْنَا ফে'ল এবং ফা'য়েল كُمْ যমীর مفعول আর مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ হলো متعلق অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল, مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ : এখানে بَلَاءٌ শব্দটি মওসূফ عَظِيْمٌ হলো তার صفت। অতঃপর مبتدأ مؤخر আর فِىْ ذٰلِكُمْ হলো خبر مقدم, অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية,

قوله فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ : এখানে تُوْبُوْا ফে'ল+ফা'য়েল, اِلٰى হলো حرف جار আর بَارِئِكُمْ হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো تُوْبُوْا এর সাথে। অতঃপর ফে'ল+ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ : এখানে واو হালিয়া, اَنْتُمْ হলো مبتدأ, আর ظٰلِمُوْنَ হলো خبر অতঃপর مبتدأ এবং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে। অতঃপর এ জুমলাটি اِتَّخَذْتُمْ হতে حال হয়ে محلا منصوب হয়েছে।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٨)

অনুবাদ : (৫৮) আর যখন আমি বললাম, প্রবেশ কর এই জনপদে অতঃপর খেতে থাক তা হতে স্বচ্ছন্দে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় এবং দ্বারদেশে প্রবেশ কর নতশিরে আর বলতে থাক, "তওবা", [ক্ষমা চাই] আমি মাফ করে দিব তোমাদের ভুল ভ্রান্তিসমূহ এবং অতিসত্বরই তদতিরিক্ত আরো দান করব আন্তরিকতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (٥٩)

(৫৯) অনন্তর পরিবর্তন করল এই জালেমরা তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি তার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা, অতএব আমি নাজিল করেছি সে জালেমদের প্রতি এক আসমানি বিপদ, এজন্য যে, তারা হুকুম অমান্য করছিল।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٦٠)

(৬০) আর যখন মূসা পানি প্রার্থনা করল নিজ কওমের জন্য, তখন আমি বললাম, আঘাত কর তোমার লাঠি দ্বারা অমুক পাথরটিতে; তখনই বের হলো তা হতে বারটি প্রস্রবণ; প্রত্যেকেই জেনে নিল নিজ নিজ পান করার স্থান; খাও এবং পান কর আল্লাহর রিজিক হতে এবং সীমালঙ্ঘন করো না দুনিয়াতে ফ্যাসাদ করে।

শাব্দিক অনুবাদ

৫৮. وَاِذْ قُلْنَا আর যখন আমি বললাম। اُدْخُلُوْا প্রবেশ কর هٰذِهِ الْقَرْيَةَ এই জনপদে فَكُلُوْا مِنْهَا অতঃপর খেতে থাক তা হতে حَيْثُ شِئْتُمْ যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয়। رَغَدًا স্বচ্ছন্দে। وَّادْخُلُوْا এবং প্রবেশ কর الْبَابَ দ্বারদেশে। سُجَّدًا নতশিরে وَّقُوْلُوْا আর বলতে থাক حِطَّةٌ "তওবা" [ক্ষমা চাই] نَّغْفِرْ لَكُمْ আমি মাফ করে দিব خَطٰيٰكُمْ তোমাদের ভুল ভ্রান্তিসমূহ وَسَنَزِيْدُ এবং অতিসত্বরই তদতিরিক্ত আরো দান করব الْمُحْسِنِيْنَ আন্তরিকতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে।

৫৯. فَبَدَّلَ অনন্তর পরিবর্তন করল। الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এই জালেমরা قَوْلًا তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ তার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা فَاَنْزَلْنَا অতএব আমি নাজিল করেছি। عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا সে জালেমদের প্রতি رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ এক আসমানি বিপদ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এজন্য যে, তারা হুকুম অমান্য করছিল।

৬০. وَاِذِ اسْتَسْقٰى আর যখন মূসা পানি প্রার্থনা করল لِقَوْمِهٖ নিজ কওমের জন্য فَقُلْنَا তখন আমি বললাম اضْرِبْ আঘাত কর بِّعَصَاكَ তোমার লাঠি দ্বারা الْحَجَرَ অমুক পাথরটিতে فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ তখনই বের হলো তা হতে اثْنَتَا عَشْرَةَ বারটি عَيْنًا প্রস্রবণ قَدْ عَلِمَ জেনে নিল كُلُّ اُنَاسٍ প্রত্যেকেই مَّشْرَبَهُمْ নিজ নিজ পান করার স্থান। كُلُوْا وَاشْرَبُوْا খাও এবং পান কর مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ আল্লাহর রিজিক হতে। وَلَا تَعْثَوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না فِى الْاَرْضِ দুনিয়াতে مُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদ করে।

অনুবাদ : (৬১) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই রকমের খাদ্যের উপর কখনো থাকব না আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন পয়দা করেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য যা জমিনে উৎপন্ন হয়– শাক, কাঁকুড়, গম, মসূর এবং পেঁয়াজ, তিনি বললেন, তোমরা কি নিতে চাও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের বদলে? অবতরণ কর কোনো শহরে, অবশ্য পাবে তোমরা তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো, আর স্থায়ী হলো তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অধঃপতন, আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা আল্লাহর গজবের; তা এজন্য যে, তারা অমান্য করে যাচ্ছিল আল্লাহর হুকুমসমূহ এবং হত্যা করেছিল নবীগণকে অন্যায়ভাবে; আর তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং বারংবার সীমালঙ্ঘন করেছিল।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٦١)

শাব্দিক অনুবাদ

৬১. وَاِذْ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা বললে يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَنْ نَّصْبِرَ আমরা কখনো থাকব না عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ একই রকমের খাদ্যের উপর فَادْعُ لَنَا আপনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُخْرِجْ لَنَا যেন পয়দা করেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ যা জমিনে উৎপন্ন হয়– مِنْۢ بَقْلِهَا শাক وَقِثَّآئِهَا কাঁকুড় وَفُوْمِهَا গম وَعَدَسِهَا মসূর وَبَصَلِهَا এবং পেঁয়াজ قَالَ তিনি বললেন اَتَسْتَبْدِلُوْنَ তোমরা কি নিতে চাও الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের বদলে? اِهْبِطُوْا অবতরণ কর مِصْرًا কোনো শহরে فَاِنَّ لَكُمْ অবশ্য পাবে তোমরা مَّا سَاَلْتُمْ তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো وَضُرِبَتْ আর স্থায়ী হলো عَلَيْهِمُ তাদের উপর الذِّلَّةُ লাঞ্ছনা وَالْمَسْكَنَةُ ও অধঃপতন وَبَآءُوْا আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর গজবের ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ তা এজন্য যে তারা كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ অমান্য করে যাচ্ছিল بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমসমূহ وَيَقْتُلُوْنَ এবং হত্যা করেছিল النَّبِيّٖنَ নবীগণকে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে ذٰلِكَ بِمَا আর তা এ কারণে যে عَصَوْا তারা অবাধ্য হয়েছিল وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এবং বারংবার সীমালঙ্ঘন করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য : শাহ আব্দুল কাদের (র.) -এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনা তীহ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী ইসরাঈলের একটানা 'মান্না ও সালওয়া' খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল, [যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে], তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হলো, যেখানে পানাহারে জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দুটি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ['তওবা তওবা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তককে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব]। এ প্রসঙ্গে বড় জোর একথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হতো, যখন কুরআন মাজীদের ঘটনাই মূখ্য উদ্দেশ্য হতো। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য, তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে এতে কোনো অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোনো দোষের কারণ নেই এবং কোনো আপত্তিরও কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يُوْشَعْ) (আ.) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'ছালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার [আদব] ও নির্দেশ পালন করেন, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য তো সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলি সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান : এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টামী করে সে শব্দের পরিবর্তে حِنْطَةٌ বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানি শাস্তি অবতীর্ণ হলো। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল– যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি; বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّةٌ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর حِنْطَةٌ অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের تَحْرِيْف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন।

এখন রইল এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, কোনো কোনো বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েজ নয়। যেমন, আজানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোনো শব্দ পাঠ করা জায়েজ নয়। অনুরূপবাবে নামাজের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, ছানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনূত, ও রুকূ-সেজদার তাসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোনো রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েজ নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কুরআন মাজীদের শব্দাবলিরও একই হুকুম। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলিতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কুরআন নাজিল হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এসব শব্দাবলির অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরিয়তের পরিভাষায় কুরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। কুরআন পাঠ করার জন্য যে ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ কুরআন শুধু অর্থের নাম নয়; বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলিতে তা নাজিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কুরআন। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যতঃ বুঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাতলে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরবর্তন করেছিল তা ছিল শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থি। কাজেই তারা আসমানি আজাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েজ। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (র.)-থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েজ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে– যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

উল্লিখিত ৬০ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বুঝা গেল যে, এস্তেস্কা [পানির জন্য প্রার্থনা]-এর মূল হলো দোয়া করা। এ দোয়া কোনো কোনো সময়ে ইস্তেস্কার নামাজের আকারেও করা হয়েছে। যেমন এস্তেস্কার নামাজের উদ্দেশ্যে হুজুর ﷺ -এর ঈদগাহতে তশরিফ নেওয়া এবং সেখানে

নামাজ, খুৎবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনো নামাজ বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ জুমার খুৎবায় পানির জন্য দোয়া করেন– ফলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

এ কথা সর্ববিধিসম্মত যে, এস্তেস্কা নামাজের আকারে হোক বা দোয়া রূপে হোক তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা, নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى এ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এ আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা 'তীহ' প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলরা যখন অত্যধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পানির জন্য আবেদন করে। তখন হযরত মূসা (আ.) এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) উক্ত পাথরে আঘাত করার সাথে সাথে বারোটি প্রস্রবণ সৃষ্টি হয়। বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক ঝরনা সৃষ্টি করা হয়। এটা মহান রাব্বুল 'আলামীনের অফুরন্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন্ত মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা। এরূপ ঘটনাকে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা বলে। এরূপ ঘটনাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। পর্যটকদের মুখ থেকে শোনা যায় যে, এ পাথরটি এখনো 'সিনাই' উপদ্বীপে রয়েছে। পাথরের গায়ে এখনো প্রস্রবণের উৎস মুখের গর্তগুলো পরিলক্ষিত হয়।

اَلْحَجَرُ-এর পরিচয় : اَلْحَجَرُ একবচন, বহুবচন اَلْاَحْجَارُ অর্থ– পাথর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা একটা চৌকোণা পাথর ছিল, যা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ছিল। হযরত মূসা (আ.) এর উপর মহান রাব্বুল আলমীনের হুকুমে আঘাত করেছিলেন। এটা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া ছিল। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, ঐ পাথর ছিল, যার উপর কাপড় রেখে হযরত মূসা (আ.) গোসল করতেন। অথবা যে কোনো পাথর।

আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, নির্দেশ ছিল যে কোনো একটি পাথরের উপর আঘাত করার। নির্দিষ্ট কোনো পাথরের উপর আঘাত করা নয়। কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, এ পাথরটি হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে সাথে করে করে নিয়ে এসেছিলেন। কালের পর কাল হাত পরিবর্তন হতে হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত এসে পৌছেছিল। অথবা হযরত মূসা (আ.) গোসল করার জন্য যে পাথরের উপর দিগম্বর হয়ে কাপড় রাখতেন। আর আল্লাহর নির্দেশ হযরত মূসা (আ.) প্রতি ইহুদিদের আরোপিত অণ্ডকোষ স্ফীতির অপবাদ দূর করার জন্য পাথরটি তার কাপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল এটা সেই পাথর।

قوله لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এখানেও বনী ইসরাঈলদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'তীহ' প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল। মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' ভক্ষণ করতে করতে ইহুদিরা যখন সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, তখন তারা নিজেদের প্রকৃতিগত অবাধ্যতা অবলম্বন করে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, একই প্রকার খাদ্যে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট বলুন, তিনি যেন আমাদের জন্য মিশরবাসীদের খাদ্যের ন্যায় নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদন করেন। উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বলেন, উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ যদি তোমাদের লোভনীয় হয়, তবে কোনো শহরে চলে যাও। সেখানে তোমাদের পার্থিব দ্রব্যসমূহ পাবে। অনন্তর ইহুদিরা সেখানে গিয়ে অবাধ্যতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবতীর্ণ হয়।

মান্না-সালওয়া এবং তাদের যাচিত বস্তুর মধ্যে মর্যাদার পর্যালোচনা :

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, مَنّ ও سَلْوٰى বনী ইসরাঈলদের যাচিত বস্তু থেকে অনেক উত্তম। কেননা কুরআনের ভাষ্যে বলা হয়েছে– اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ

নিম্নে মান্না ও সালওয়ার মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো–

(১) মান্না-সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন উত্তম নিয়ামত, যা লাভ করতে কোনো কষ্ট করতে হতো না। লাঙ্গল, জোয়াল চালানো, কৃষি কাজ ও শ্রমের প্রয়োজন ছিল না।

(২) এটা ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু।

(৩) মান্না-সালওয়াতে আল্লাহর নির্দেশ পালন হতো, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, যা পরকালের পুণ্য হিসেবে জমা হতো।

(৪) যেহেতু উহা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হতো, সেহেতু তা হালাল হওয়াল ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু চাষাবাদের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয়, তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। কেননা বীজ এবং জমিন ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। তাতে কিয়ৎ পরিমাণ হলেও হের-ফের থাকতে পারে। একে অন্যের নিকট হতে জবর দখলেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। –[কুরতুবী]

اَتَسْتَبْدِلُوْنَ কথাটি কাকে বলেছিলেন? এ বাক্যটি جملة مستانفة যা উহ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো "বনী ইসরাঈদের কৃষিজাত পণ্য সরবরাহের আবেদনের জবাবে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কি বললেন?" তখন উত্তরে বলা হলো اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الخ। এ বাক্যটির قَائِلْ তথা প্রবক্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে এ বক্তব্য পেশ করেন।

অথবা, হযরত মূসা (আ.) নিজেই এর প্রবক্তা। আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। [বায়যাবী]

مِصْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : مِصْر বলতে এখানে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো নগর বা লোকালয়কে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে ফেরাউনের মিসর অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ইহুদিদেরকে মিসরের অধিকারী করে দিয়েছেন। কেউ বলেন, এ অঞ্চলটির পূর্ব নাম ছিল مِصْرَاتَمْ (মিসরাতাম) আরবিতে একে مِصْر বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ -এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের চিরন্তন শাস্তি ইহকাল ও পরকালে তাঁর গজবের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ– তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোকনা কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যারা তাদের সংস্পর্শে আসবে, তারাই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবে।

اَلْمَسْكَنَةُ ও اَلذِّلَّةُ -এর অর্থ : اَلذِّلَّةُ শব্দের অর্থ– অপমান, লাঞ্ছনা। হযরত হাসান বসরী (র.) এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন– اَلذِّلَّةُ হলো জিযিয়া, কর নির্ধারণ। اَلْمَسْكَنَةُ শব্দের অর্থ– দরিদ্রতা। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, নম্রতা ও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করা। এটা اَلسُّكُوْنُ থেকে গৃহীত।

يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে اٰيَاتِ اللّٰهِ বলতে আল্লাহ তা'আলার কিতাব উদ্দেশ্য। অথবা, নবীগণের মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা উদ্দেশ্য। বনী ইসরাঈল বিভিন্নভাবে এগুলোর সাথে কুফরি করেছে– (১) মহান রাব্বুল্ আলামীন প্রদত্ত শিক্ষাবলি হতে যে বিষয়টি নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী পেয়েছে, তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। (২) কোনো বিষয় আল্লাহ তা'আলার বাণী জানার পরও পূর্ণ দাম্ভিকতা, নির্লজ্জতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কোনো পরোয়া করেনি। (৩) মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানা ও বুঝার পরও নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এতে পরিবর্তন করেছে।

قوله وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ দ্বারা উদ্দেশ্য : বনী ইসরাঈলরা কোনো এক সকালে তিনশত নবীকে হত্যা করেছিল এবং বিকেলে স্বাচ্ছন্দ্যে তরি-তরকারির হাট বাজার করেছিল। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন জঘন্যতম কাজের বর্ণনা দিয়ে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদিরা হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে অনর্থক অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। তা ছাড়া বনী ইসরাঈল একদিনে ৪০ জন নবীকে হত্যা করেছিল। পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইহুদিরা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী ও অভিশপ্ত জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে হাক্কানী, কাশ্শাফ]

بِغَيْرِ الْحَقِّ উল্লেখের ফায়দা : এ কথা নিশ্চিত পরিজ্ঞাত যে, নবীদেরকে হত্যা করা অন্যায়, তথাপি بِغَيْرِ الْحَقِّ বলার প্রয়োজন এজন্য যে, মানুষ কখনো না জেনে বা সন্দেহ হওয়ার কারণে অন্যায় করে বসে, আবার কখনো অন্যায় জেনেও তা করে থাকে। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক। নবীদের হত্যা করা জঘন্য অন্যায় এটা জেনেও তারা নবীদের হত্যা করেছে।

ইহুদিদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে, উদ্ভুত সন্দেহ ও তার উত্তর : উল্লিখিত আয়াতসমূহ ইহুদিদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে কাছীরের ভাষায় : "তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।"

বিশিষ্ট তাফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ– ইহুদিরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা 'আলে ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ "আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে।" আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কুরআনের আয়াতে مِنَ النَّاسِ বলা হয়েছে مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সারকথা, ইহুদিরা উপরিউক্ত দু অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। ১. আল্লাহর প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিংবা ২. শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে। কিংবা অন্যান্য মুসলিম জাতির সাথেও হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে ইমরানের' আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট– কেননা, ফিলিস্তীনে ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়; বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান শক্তি ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কুরআনের বাণী بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَسْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِسْقَاءُ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পানি চাইলেন। [তার জাতির জন্য]

انْفَجَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفِجَارُ মূলবর্ণ– (ف ـ ج ـ ر) জিনস صَحِيْحٌ অর্থ–পানি বের হলো।

مَشْرَبَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– পানি পানের স্থান।

وَلَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْعَثْىُ মূলবর্ণ– (ع ـ ث ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ফ্যাসাদ করো না।

لَنْ نَّصْبِرَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– আমরা কখনো ধৈর্যধারণ করব না।

وَاحِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَحْدَةُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– একক, একা।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি চাও, প্রার্থনা কর, দোয়া কর।

يُخْرِجْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ– (خ ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– সে বের করেছে।

تُنْبِتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبَاتُ মূলবর্ণ– (ن ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– সে উপৎন্ন করেছে।

بَقْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بُقُوْلٌ ; অর্থ– তরকারি।

قِثَّائِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِثَّاءَةٌ; অর্থ– কাকড়ি।

فُوْم : শব্দটি একবচন, বহুবচন فُوْمَانٌ ; অর্থ– গম।

عَدَس : শব্দটি বহুবচন, একবচন عَدَسَةٌ; অর্থ– ডাল, মসুরী।

بَصَل : শব্দটি একবচন, বহুবচন بُصُوْلٌ ; অর্থ– পেঁয়াজ।

تَسْتَبْدِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبْدَالُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পরিবর্তন করে নিবে।

اِهْبِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهُبُوْط মূলবর্ণ (ه ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নেমে যাও।

ضُرِبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّرْبُ মূলবর্ণ (ض. ر. ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপ করা হলো।

بَآءُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب . و . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى ও مهموز لام অর্থ– তারা ফিরল।

كَانُوْايَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করছিল।

كَانُوْايَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, ফা'য়েল, আর هٰذِهِ হলো اسم اشارة, আর اَلْقَرْيَةَ হলো مشار اليه অতঃপর اسم اشاره ও مشار اليه মিলে مفعول, অতঃপর ফে'ল, ফায়েল, ও مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا: এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, ضمير হচ্ছে ذو الحال ; اَلْبَابَ হলো مفعول আর سُجَّدًا হলো حال এখন ذو الحال ও حال মিলে হচ্ছে فاعل অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ : এখানে لَنْ نَّصْبِرَ ফে'ল ও ফা'য়েল عَلٰى হরফে জার, طَعَامٍ হলো موصوف আর واحد হলো صفة , অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مجرور , তারপর جار ও مجرور মিলে متعلق অতঃপর ফে'ল ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)

অনুবাদ : (৬২) সুনিশ্চিত যে, মুসলমান, ইহুদি, নাসারা এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর এবং কিয়ামতের প্রতি আর নেককাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কারও রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট, তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নেই, তারা শোকান্বিতও হবে না।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣)

(৬৩) আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম এবং তূর পাহাড়কে উঠিয়ে ধরলাম তোমাদের উপর [এবং বলেছিলাম] গ্রহণ কর যে কিতাবটি আমি তোমাদেরকে দান করেছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রাখ যে, সমস্ত হুকুম তাতে রয়েছে, আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ (٦٤)

(৬৪) অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে সেই অঙ্গীকারের পরেও, তখন যদি তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত না হতো, তবে অবশ্যই তোমরা বিনাশপ্রাপ্ত হতে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰسِئِينَ (٦٥)

(৬৫) আর তোমরা অবগতই আছ ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা যারা তোমাদের মধ্যে হতে শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ অমান্য করেছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে বলে দিলাম, তোমরা হয়ে যাও লাঞ্ছিত বানর।

শাব্দিক অনুবাদ

৬২. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا সুনিশ্চিত যে, মুসলমান وَالَّذِينَ هَادُوا ইহুদি وَالنَّصٰرٰى নাসারা وَالصّٰبِئِينَ এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং কিয়ামতের প্রতি وَعَمِلَ صَالِحًا আর নেককাজ করে فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ তাদের জন্য পুরস্কারও রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রভুর নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ তারা শোকান্বিতও হবে না।

৬৩. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম وَرَفَعْنَا এবং উঠিয়ে ধরলাম فَوْقَكُمُ তোমাদের উপর الطُّورَ তূর পাহাড়কে خُذُوا [এবং বলেছিলাম] গ্রহণ কর مَا آتَيْنٰكُمْ যে কিতাবটি আমি তোমাদেরকে দান করেছি بِقُوَّةٍ দৃঢ়ভাবে وَّاذْكُرُوا এবং স্মরণ রাখ مَا فِيهِ যে সমস্ত হুকুম তাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

৬৪. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ সেই অঙ্গীকারের পরেও فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ তখন যদি আল্লাহর দয়া না হতো عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর وَرَحْمَتُهُ ও তাঁর রহমত لَكُنْتُمْ তবে অবশ্যই তোমরা হতে مِنَ الْخٰسِرِينَ বিনাশপ্রাপ্ত।

৬৫. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ আর তোমরা অবগতই আছ الَّذِينَ اعْتَدَوْا ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা যারা অমান্য করেছিল مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে হতে فِي السَّبْتِ শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ فَقُلْنَا لَهُمْ সুতরাং আমি তাদেরকে বলে দিলাম كُونُوا তোমরা হয়ে যাও قِرَدَةً বানর خٰسِئِينَ লাঞ্ছিত।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٦٦)

(৬৬) অনন্তর আমি তাকে করলাম একটি শিক্ষণীয় বিষয় তৎকালীনদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও আর উপদেশ স্বরূপ করলাম মুত্তাকীদের জন্য ।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٦٧)

(৬৭) আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ আদেশ করতেছেন তোমাদের একটি বলদ জবাই কর; তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস্য বানাচ্ছেন? মূসা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ মুর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করা হতে ।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (٦٨)

(৬৮) তারা বলল, আপনি প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন তা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই; মূসা বললেন, আল্লাহ বলতেছেন যে, তা এমন বলদ হওয়া চাই যা একেবারে বৃদ্ধও নয় একেবারে বাচ্চাও নয়; এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান, অতএব, এখন আদেশ অনুযায়ী করে ফেল ।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ (٦٩)

(৬৯) তারা বলল, প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন তার রং কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, তা একটি হলদে রঙ্গের বলদ, তীব্র হলদে তার রং দর্শকদেরকে আনন্দ দেয় ।

শাব্দিক অনুবাদ

৬৬. فَجَعَلْنٰهَا অনন্তর আমি তাকে করলাম نَكَالًا একটি শিক্ষণীয় বিষয় لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا তৎকালীনদের জন্যও وَمَا خَلْفَهَا এবং পরবর্তীদের জন্যও وَمَوْعِظَةً আর উপদেশ স্বরূপ করলাম لِّلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য ।

৬৭. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى আর যখন মূসা বললেন لِقَوْمِهٖ স্বীয় সম্প্রদায়কে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ আল্লাহ আদেশ করতেছেন তোমাদের اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً একটি বলদ জবাই কর। قَالُوْا তারা বলল اَتَتَّخِذُنَا আপনি কি আমাদেরকে বানাচ্ছেন? هُزُوًا উপহাস্য قَالَ মূসা বললেন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ এরূপ মুর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করা হতে ।

৬৮. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا আপনি প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন مَا هِيَ তা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই قَالَ মূসা বললেন اِنَّهٗ يَقُوْلُ আল্লাহ বলতেছেন যে اِنَّهَا بَقَرَةٌ তা এমন বলদ হওয়া চাই لَّا فَارِضٌ যা একেবারে বৃদ্ধও নয় وَّلَا بِكْرٌ একেবারে বাচ্চাও নয় عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান। فَافْعَلُوْا অতএব, কাজ করে ফেল مَا تُؤْمَرُوْنَ আদেশ অনুযায়ী

৬৯. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন مَا لَوْنُهَا তার রং কি? قَالَ তিনি বললেন اِنَّهٗ يَقُوْلُ আল্লাহ বলেন اِنَّهَا بَقَرَةٌ তা একটি বলদ صَفْرَآءُ হলদে রঙ্গের فَاقِعٌ লَّوْنُهَا তীব্র হলদে তার রং تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ দর্শকদেরকে আনন্দ দেয় ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى الخ ٦٢ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বে যেসব দীনদারদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তাদের নামাজ-রোজা সম্পর্কে হুজুর ﷺ-এর নিকট বর্ণনার পর বলেছিলাম যে, এ সমস্ত নামাজি ও রোজাদারগণ আপনার আগমনের বিশ্বাসী। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তারা জাহান্নামী। এতে হযরত সালমান (রা.) দুঃখিত হন। তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।– [ইবনে কাছীর]

শানে নুযূল– ২ : হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা তিনি জনাব নবী করীম ﷺ-এর সাথে আলোচনা করছিলেন। এই মধ্যে যখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন তিনি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, তারা নামাজ আদায় করত, রোজা রাখত, আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাসও ছিল, এবং তারা সাক্ষী প্রদান করত যে, আপনি নবী হয়ে প্রেরিত হবেন। অতঃপর সালমান ফারসী (রা.) তাদের বৈশিষ্ট্যতা বর্ণনা করে শেষ করার পর নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, হে সালমান! তারা হাবে জাহান্নামী। একথা হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক অনুভব হলো এবং তার পদতল হতে মাটি সরে যাচ্ছিল বলে অনুভব করেছিলেন। তখন সে হতাশাগ্রস্থ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বললেন যে, এ আয়াত শুনে আমি বর্ণনাতীত আনন্দিত হলাম। -[ইবনে কাছীর– ১ :১০৩]

قوله وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ الخ -٦٥ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মূসা (আ.) ইবাদতের জন্য জুমার দিন নির্দিষ্ট করেন; কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁর বিরোধিতা করে এবং শনিবার দিন ইবাদতের জন্য পছন্দ করে। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলল, আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, শনিবার দিন কোনো কাজ করেননি। আমরাও ঐ দিন কোনো কাজ করব না। কাজেই তাদেরকে বলা হলো ঠিক আছে তোমরা ঐ দিন ইবাদত করবে, কোনো কাজ করবে না, এমনকি মাছও স্বীকার করবে না। ঐ সকল লোক যেহেতু ঈলা নামক চরের নদীর তীরে বাস করতো। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শনিবার দিন ঐ নদীর কিনারায় সকল প্রকার মাছ ভিড় করত। শেষ পর্যন্ত তারা কৌশল অবলম্বন করে, নদীর তীরে গর্ত খোদাই করে নদীর নালার সাথে নালা করে দেয়, এতে শনিবার মাছ একত্রিত হতো, আর রবিবার দিন তারা সে মাছ শিকার করতো। আর বলত আমরা শনিবার দিন মাছ শিকার করিনি। সে ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَهُوْدِىٌ , نَصَارٰى ও صَابِئِيْنَ -এর পরিচয় ঃ يَهُوْدِىٌ (ইহুদি) : 'ইহুদি' হচ্ছে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বড় পুত্র 'ইয়াহুদ'-এর বংশধর। আর এজন্যই এদেরকে 'ইহুদি' বলা হতো। কেউ কেউ বলেন, এসব লোক তাওরাত পড়ার সময় হেলত-দুলত, এজন্যই এদেরকে 'ইহুদি' বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, هَادُوْا শব্দের অর্থ– প্রত্যাবর্তন করল। যেহেতু ইহুদিরা গো-বৎস পূজা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, সেহেতু এদেরকে يَهُوْدِىْ বলা হয়।

نَصَارٰى (নাসারা) : যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সময় আসে, তখন বনী ইসরাঈলদের উপর তার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর আদেশের আনুগত্য ওয়াজিব হয়, তখন তাদের নাম نَصَارٰى (নাসারা) রাখা হয়। কেননা তারা পরস্পর সাহায্য-সযোগিতাও করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এসব লোক যে স্থানে বাস করতো, তার নাম ছিল নাসেরা, তাই তাদেরকে نَصَارٰى বলা হতো।

اَلصَّابِئِيْنَ (সাবি'য়ীন) : এটা বহুবচন, একবচন صَابِيَةٌ, অর্থ– যে নিজের দীন ত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে। তৎকালে প্রচলিত দীনসমূহ হতে তাদের পছন্দ মতো কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা তারকারাজি ও ফেরেশ্‌তাদের পূজা ও উপাসনা করতো। হযরত ওমর (রা.) এদের কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

قوله وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ -এর ব্যাখ্যা : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ প্রদত্ত 'তাওরাত' কিতাব 'তূর' পর্বত থেকে গ্রহণ করার সময় বনী ইসরাঈলদের ৭০ জন নির্বাচিত লোককে সাক্ষীরূপে নিয়েছিলেন। তারা সিরিয়া এসে কওমের নিকট সাক্ষ্য

প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, তোমরা যতটুকু পার, আমল করো এবং যা না পার, তা ক্ষমার যোগ্য। ইহুদিরা তাদের স্বভাবগত দুষ্টুমিবশত এবং নির্বাচিত লোকদের মিথ্যা সংযোগের কারণে সুযোগ পেয়ে পরিষ্কার বলে দিল, 'আমরা কিছুতেই এ কিতাব অনুযায়ী আমল করতে পারব না। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদেরকে 'তূর' পাহাড়ের একাংশ তাদের মাথার উপর ধরতে বলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা মেনে নিল। এটাই হলো 'তূর' পাহাড় উত্তোলনের ঘটনা।

يَوْمُ السَّبْتِ-এর ঘটনা : ইহুদি ধর্মে সপ্তাহের শনিবার দিন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এর অমান্যকারীর শাস্তি ছিল হত্যা। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী 'ঈলা' নামক স্থানের অধিবাসীরা এ দিনে মৎস শিকার করে আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘন করায় আল্লাহ তা'আলা এদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইহুদিদের ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিনকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। মূলত এ দিনে সমুদ্রে মৎস শিকার করা তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন শুরু করে তারা শনিবার দিন জালে মাছ আটকিয়ে পরদিন সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করতো এ ব্যাপারে ধার্মিক ও আল্লাহভীরু লোকদের বাঁধাদানে ভ্রুক্ষেপ করতো না। শেষ পর্যন্ত ধার্মিক লোকেরা তাদের এহেন আল্লাহদ্রোহী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সমাজচ্যুত করে বস্তির মধ্যখানে দেয়াল নির্মাণ করে তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বসবাস করতো এবং দেয়ালে একটি মাত্র ফটক রাখে। একদিন ভোরবেলায় আল্লাহভীরু লোকেরা লক্ষ্য করল, বেলা অনেক হয়ে গেছে, অথচ এরা এখনো দরজা খোলেনি। তখন তাঁরা দরজা খুলে দেখতে পেল যে, এরা সবাই বানরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদের প্রত্যেককে যথারীতি চেনা যাচ্ছে। এভাবে তিনদিন কেটে যাওয়ার পর এরা সবাই মৃত্যুবরণ করে। ঐশী আদেশ না মানার কারণে এভাবে এদের ধ্বংস হয়েছে।

قوله كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ দ্বারা যারা সম্বোধিত : বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলে সংঘটিত হয়। তারা ছিল আয়লা নগরীর অধিবাসী। আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবাধ্যতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের আকৃতি বিকৃতির শাস্তি প্রদান করেন। অতএব, كُوْنُوْا ফে'লে আমর দ্বারা আয়লা নগরীর অবৈধ মাছ শিকারিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قِرَدَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, قِرَدَةً দ্বারা প্রকৃত বানর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে রূপান্তরিত করেছেন। তাদের ধ্যান-ধারণা সব কিছু বানরের ধ্যান-ধারণায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদরেকে বানরের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমলবিহীন আলিমকে গাধার সাথে তুলনা দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে– كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا।

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে قِرَدَةً দ্বারা প্রকৃত বানরই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রকৃত বানরেই রূপান্তরিত করেছিলেন। তিন দিন পর এরা সবাই মৃত্যুবরণ করে।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে আর বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়েছিল। তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো। তাদের কাছে এসে অশ্রু বিসর্জন করতো। কাপড় নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকত। আত্মীয়রা বলত, পূর্বে কি আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? বানররা ও শূকররা তখন মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতো।

মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দল : পবিত্র কুরআনের আলোকে বুঝা যায় যে, ঐ ঘটনায় বনী ইসরাঈলরা তিন দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ লঙ্ঘন করে শনিবারে মাছ ধরেছিল। দ্বিতীয় দল যারা এ কাজে বাধা দিয়েছিল। এমনকি তৃতীয় দল দ্বিতীয় দলকে বলেছিল, এদেরকে নিষেধ করে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ এদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই করবেন।

এ তিন দলের মধ্যে দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ অতএব, তারা মুক্তি পেয়েছে। আর প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অতএব, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তৃতীয় দল সম্পর্কে কিছু বলা

হয়নি। যেহেতু তারা ভালো কাজ করেনি, যা দ্বারা প্রশংসারযোগ্য হতে পারে। আবার খারাপ কাজও করেনি যা দ্বারা তিরস্কারের যোগ্য হতে পারে। এতদসত্ত্বেও তৃতীয় দল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এরাও ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর কেউ কেউ বলেন, এরা ধ্বংস হয়নি।

قوله بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা উদ্দেশ্য : بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা চেহারা রূপান্তরিত লোকদের সমসাময়িক অন্যান্য পৃথিবীবাসী উদ্দেশ্য। আর وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা তাদের পরবর্তী সকল লোক উদ্দেশ্য।

অথবা, بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা আয়লা নগরীর অধিবাসী, যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তারা উদ্দেশ্য। আর وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা যারা উপস্থিত ছিল না, তারা উদ্দেশ্য।

অথবা, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে لِاَجَلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوْبِهِمْ وَمَا تَاَخَّرَ مِنْهَا অর্থাৎ তাদের পূর্বাপর গুনাহসমূহের কারণে এ শাস্তিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

মুত্তাকীন দ্বারা উদ্দেশ্য ও তাদেরকে বিশেষিত করার কারণ : অত্র আয়াতে مُتَّقِيْنَ তথা খোদাভীরু বলতে চেহারা রূপান্তরিতদের গোত্রীয় মুত্তাকীগণকে বুঝানো হয়েছে। অথবা যে সমস্ত মুত্তাকীরা এ ঘটনা শ্রবণ করেছেন, তারা উদ্দেশ্য। –[বায়যাভী]

উপদেশকে মুত্তাকীদের সাথে খাস করার কারণ সম্পর্কে ইমাম মাওয়ারদী বলেন, যেহেতু উপদেশ গ্রহণে মুত্তাকীরাই এগিয়ে আসে, সেহেতু তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

فَجَعَلْنٰهَا -এর মধ্যকার هَا এর مَرْجِعٌ : (১) هَا সর্বনাম قِرَدَةً -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ, আমি ঐ বানরকে নসিহতের দৃষ্টান্ত বানিয়েছি। (২) অথবা, তা حِيْتَانٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ মাছগুলো। (৩) অথবা, তা عُقُوْبَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ শাস্তিকে। (৪) অথবা, তা قَرْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ বস্তিকে আমি তাদের সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছি। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, هَا সর্বনামকে قَرْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত করাই সহীহ।

বনী ইসরাঈল ও ইহুদির মাঝে পার্থক্য : এ যাবৎ আলোচনা চলে আসছিল বনী ইসরাঈল নামের এক বিশেষ বংশ-গোষ্ঠী সম্পর্কে। তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন তাদের ধর্মমত এবং আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো اَلَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল একটা বংশগত নাম। একটি গোত্র-বংশ বা একটি জাতির নাম। উচ্চ বংশ মর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতো। নিজেদের পূর্বপুরুষ সাধু-সজ্জন ছিল বলে তারা মহা আনন্দিত ছিল। ইতিহাস পুনরাবৃত্তিকালে এ বংশগত নাম নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন তাদের ধর্মমত ও তাদের বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এখন এমন নাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণ-পরিচয় প্রকাশ পায় যাতে বংশ গোত্র পরিবারের পরিবর্তে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। اَلَّذِيْنَ هَادُوْا সে প্রয়োজন পূরণ করছে। কুরআনে আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ অসংখ্য-অগণিত। সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রায় কাছাকাছি কিন্তু একে অপর থেকে ভিন্ন অর্থের জন্য কুরআন মাজীদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখে।

আরবে এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা জন্মগত এবং বংশগতভাবে ইহুদি ছিল না; বরং তারা ছিল আরব বা বনী ইসমাঈল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। কিন্তু ইহুদিদের সংসর্গ-সান্নিধ্যে প্রভাবিত এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে তারা প্রথমে ওদের আচার-আচরণ এবং পরে আকিদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে নেয়। আর এভাবে ধীরে ধীরে তারাও ইহুদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। اَلْيَهُوْدُ না বলে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا বলার একটা সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, এতে তাদের আকিদা-বিশ্বাস যে মৌলিক নয়; বরং পরবর্তীকালে গ্রহণ করা, সে কথা ভালোভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ النَّصَارٰى : বহুবচন, একবচন نَصْرَانِىٌّ শাম দেশে বর্তমান ফিলিস্তীনে Nazareth বা নাছেরা নামে একটা গোত্র আছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৭০ মাইল উত্তরে রোম সাগরের ২০ মাইল পূর্বে গ্যালিলী অঞ্চলে। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিবাস এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে তাকে ইয়াসূ নাছেরী বলা হয়। আরবি উচ্চারণে নাসেরাকে নাসরানও বলা হয়। এ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নাসরানী বলা হয়।

ইমাম রাগেব (র.) (رَاغِبْ) سُمُّوا بِذَالِكَ اِنْتِسَابًا اِلٰى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও নাসারাদের নামকরণের কারণ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

سُمِّيَتِ النَّصَارٰى لِاَنَّ قَرْيَةَ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ كَانَتْ تُسَمّٰى نَاصِرَةَ وَكَانَ اَصْحَابُ يُسَمُّوْنَ النَّاصِرِيْنَ (اِبْنِ حَجَرٌ)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন– سُمُّوا بِذَالِكَ الْقَرْيَةِ تُسَمّٰى نُصْرَةَ كَانَ يَنْزِلُهَا عِيْسٰى فَلَمَّا يُنْسَبُ اَصْحَابُهٗ اِلَيْهِ قِيْلَ النَّصَارٰى (قُرْطُبِيْ)

কেউ কেউ একে আরবি শব্দ মনে করে তা نَصَرْتُ থেকে নিষ্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, যেহেতু তারা বলেছিল– نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিই ঠিক। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ الصَّابِئِيْنَ : সাবী-এর শাব্দিক অর্থ হলো– যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে অপরের দীন গ্রহণ করে, বা অপরের দীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় صَابِئُوْنَ [Sabians] নামে একটা ধর্মীয় ফেরকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। কারণ মূলত আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহইয়া বলতো। যেমন এরা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মত। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ খলিফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবেয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত ওমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ هُمْ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقَالَ عُمَرُ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ مِثْلَ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكِتٰبِ (مَعَالِمْ)

বেশ বড় বড় কয়েকজন তাবেয়ীও তাদেরকে আহলে কিতাব বা তাওহীদবাদী মনে করতেন। যেমন ইবনে জারীর (র.) বলেন– هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (اِبْنُ جَرِيْر عَنِ السُّدِّيْ)

ইবনে যায়েদ (র.) তাদেরকে তাওহীদবাদী মনে করতেন। হযরত কাতাদাহ এবং হাসান বসরী (র.) থেকে তো এও বর্ণিত আছে যে, তারা কিতাবধারী এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতো –[ইবনে জারীর]। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজেও ছিলেন ইরাকী। এ কারণে সাবেয়ীদের সম্পর্কে সরাসরি জানার তার সুযোগ ছিল। তার ফতোয়া এই যে, তাদের হাতে জবাই করা পশু হালাল এবং এদের নারীদের সাথে বিয়েও জায়েজ।

গাভী জবাইয়ের ঘটনা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যার বর্ণনায় উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার বিবরণ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'আদিল' নামে বিপুল সম্পদের অধিকারী ও ধনী ব্যক্তি ছিল। তার কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা ও এক ভাতিজা ছিল। ভাতিজা স্বত্ব পাওয়ার লালসায় এবং একমাত্র কন্যাকে বিয়ের উদ্দেশ্য তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে এবং হত্যার রক্তপণ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই একদিন সুযোগ মতো চাচাকে হত্যা করে রাস্তার মোড়ে রেখে আসে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলল যে, কে তাদের চাচাকে হত্যা করেছে, তারা জানে না। অথবা, মৃতদেহের নিকটস্থদের নিকট থেকে রক্তমূল্য দাবি করে। তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে আদেশ দিলেন এবং জবাইকৃত গরুর একাংশ মতান্তরে লেজ বা মেরুদণ্ড কিংবা রান মৃত ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে বলে দেবে, কে তাকে হত্যা করেছে। তারা যে কোনো একটি গরুকে জবাই করে সেটার অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যেতো। কিন্তু তাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী নানাপ্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা শর্ত করে দিলেন যে, নিখুঁত, নির্মল, কাজে অব্যবহৃত, গাঢ় রংয়ের একটি মধ্যবয়সী গরু জবাই করতে

হবে। অবশেষে তারা এরূপ একটি গরু বহুমূল্যে ক্রয় করে জবাই করে তার একাংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে বলে দিল যে, তার ভাতিজা ধন-সম্পদের লোভে বা কন্যাকে বিয়ের লালসায় তাকে হত্যা করেছে। এতটুকু বলে সে আবার মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ফলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও এড়ানো সম্ভব হলো।

গাভী জবাইয়ের ঘটনাটি বর্ণনার কারণ : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে গাভী জবাইয়ের এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দু'টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

১. এ ঘটনাটি পরলোক অবিশ্বাসীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত এ ঘটনাটি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করণের উপর একটি ঐতিহাসিক সাক্ষী রূপে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তখন মৃতদেরকে জীবিত করে যেভাবে নিজের কুদরত প্রদর্শন করেছেন, তোমরা বুঝে লও যে, কেয়ামতের দিনও এরূপে মৃতকে তিনি জীবিত করবেন। وَكَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى

২. এ ঘটনার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এত অধিক সংখ্যায় স্বীয় কুদরত প্রদর্শন করেছেন যে, যদি অন্য কোনো কাওমের সম্মুখে এসব কুদরত প্রদর্শন করা হতো, তবে তারা চিরতরে আল্লাহ তা'আলার ফরমাবরদার হয়ে যেতো। তাদের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর নাফরমানির কল্পনা উদিত হতো না। কিন্তু তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে তো এর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আর যদি হয়েই থাকে তাহলে তা নিতান্ত অস্থায়ী ও নিষ্ক্রিয়ই প্রমাণিত হয়েছে। আজও যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা করো, তবে তা হবে তোমাদের জন্মগত ও স্বভাবগত একগুয়েমী এবং মুর্খতারই ফল।

গাভীটি নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট : কারো কারো মতে নির্দিষ্ট গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। তবে তা ছিল অস্পষ্ট। আবার কারো মতে গাভী নির্দিষ্ট ছিল না, যে কোনো একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। অনুরূপ কারণেই তারা প্রকৃত ব্যাপার জানতে পারতো; কিন্তু তারা হঠকারিতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ পাক তাদের উপর কাঠিন্য আরোপ করেন।

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا বলার কারণ : বনী ইসরাঈল মূসা (আ.)-এর নিকট নিহত ব্যক্তির হন্তা নির্ধারণের আবেদন করেছিল, এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের নিবেদিত বিষয় আর গরু জবাইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় তারা ধারণা করেছিল যে, তিনি তাদের সাথে বিদ্রূপাচরণ করছেন। অথচ গাভী জবাই করে উহার কিছু অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর কথা বলে দেবে এ কথা তিনি তাদেরকে বলেননি। তাই তারা ধরে নিয়েছিল যে, এ আদেশটি বিদ্রূপাত্মক।

অথবা, মূল কথাটি বলার পরেও তা তাদের অতি আশ্চর্যের বিষয় মনে হওয়ায় তারা এ মন্তব্য করে।

قوله اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ -এর মর্মার্থ : হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে গাভী জবাইয়ের আদেশ দিলে তারা তাকে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? তখন তাদের জবাবে মূসা (আ.) বললেন, উপহাস করা মূর্খদের কাজ, আমি উপহাস করে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। বিদ্রূপ করা মূর্খতা বলেই মূসা مِنَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ না বলে مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলেছেন। অথবা কখনো কখনো স্বয়ং বিদ্রূপকেই মূর্খতা বলা হয়। তাই তিনি مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ইহুদি হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে ইহুদি বলা হয়।

وَالنَّصٰرٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَصْرَانِىٌّ বা نَصْرَانٌ অর্থ– নাসারা। হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে নাসারা বলা হয়।

وَالصّٰبِئِيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَابِيَةٌ অর্থ– এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারী। ইবনে খাত্তাব ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صَابِئِيْنَ আহলে কিতাবের একটি গোত্র। হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, صَابِئِيْنَ বলা হয়, যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করেন, যাবূর তেলাওয়াত করে এবং কেবলামুখি হয়ে নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ– (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা লও। তোমরা ধর।

اذْكُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ– (ذ ـ ك ـ ر)জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর, তোমরা ভয় করতে থাক, তোমরা বিরত থাক।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তোমরা বিমুখ হয়েছ।

اعْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করল।

قِرَدَةً : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قِرْدٌ অর্থ– বানর।

الْخٰسِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَسْىُ মূলবর্ণ (خ ـ س أ) জিনস مهموز لام অর্থ– লাঞ্ছিত।

مُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পরহেজগারগণ, মুত্তাকীগণ।

تَذْبَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّبْحُ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জবাই কর।

بَقَرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بَقَرَاتٌ অর্থ– গরু।

تَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– আপনি আমাদের সাথে উপহাস করছেন।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ– (د - ع - و)জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি চাও, প্রার্থনা কর, দোয়া কর।

يُبَيِّنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্টভাবে বিবৃত করে।

فَارِضٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فَوَارِضُ অর্থ– বৃদ্ধ।

بِكْرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَبْكَارٌ ; অর্থ– কুমারী।

عَوَانٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عون ; অর্থ– মধ্য বয়স্ক, বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়স।

تُؤْمَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول ; বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ: এখানে فاء টি হরফে আতফ, قُلْنَا ফে'ল তার نَحْنُ যমীর ফা'য়েল, لَهُمْ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; অতঃপর فعل ও فاعل এবং متعلق মিলে জুমলা হয়ে قول আর كُوْنُوْا ফে'লে নাকিস, اَنْتُمْ যমীরে ইসমে নাকিস, قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ শব্দদ্বয় صفت ও موصوف মিলে خبر হয়েছে। তৎপর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে জুমলা হয়ে مقولة হয়েছে। এক্ষণে قول ও مقولة মিলে جملة فعلية قولية গঠিত হয়েছে।

قوله فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا: এখানে جَعَلْنَا ফে'ল, যমীরে نَحْنُ তার ফা'য়েল, هَا যমীরটি مفعول اول আর نَكَالًا শব্দটি مفعول ثانى অতঃপর فعل ও فاعل এবং উভয় مفعول মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قوله وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ : এখানে رَفَعْنَا ফে'ল, ফা'য়েল, فَوْقَكُمْ হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে ظرف, আর اَلطُّوْرَ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল, ظرف এবং مفعول মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قوله اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ : এখানে اَعُوْذُ ফে'ল, ফা'য়েল, بِاللّٰهِ হলো متعلق , আর اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ, جملة হয়ে مفعول হয়েছে, অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল, متعلق মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠)

অনুবাদ : (৭০) তারা বলল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন বলে দেন তা কি কি গুণসম্পন্ন হওয়া চাই, কেননা এ বলদ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় হচ্ছে; এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ ঠিক বুঝতে পারব।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١)

(৭১) মূসা বললেন, আল্লাহ বলেন, তা এমন বলদ যা না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না কৃষি ক্ষেতে পানি সেচনে, নিখুঁত, তাতে কোনো দাগ থাকবে না, তারা বলল, এখন আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন, অনন্তর তা জবাই করল; কিন্তু করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

ع ٨

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢)

(৭২) আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে খুন করলে এবং তার জন্য একে অন্যকে দায়ী করতে লাগলে আর আল্লাহ এই বিষয়টি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন যা তোমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)

(৭৩) অনন্তর আমি বললাম, তাকে এর কোনো একে টুকরা দ্বারা স্পর্শ কর, এরূপেই আল্লাহ জীবিত করবেন মৃতকে এবং তোমাদেরকে দেখান স্বীয় নিদর্শন এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

৭০. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَنَا তিনি যেন বলে দেন مَا هِيَ তা কি কি গুণসম্পন্ন হওয়া চাই إِنَّ الْبَقَرَ কেননা এ বলদ সম্বন্ধে تَشَابَهَ عَلَيْنَا আমাদের সংশয় হচ্ছে; وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ لَمُهْتَدُوْنَ ঠিক বুঝতে পারব।

৭১. قَالَ মূসা বললেন إِنَّهُ يَقُوْلُ আল্লাহ বলেন إِنَّهَا بَقَرَةٌ তা এমন বলদ لَا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ যা না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয় وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ না কৃষি ক্ষেতে পানি সেচনে مُسَلَّمَةٌ নিখুঁত لَا شِيَةَ فِيْهَا তাতে কোনো দাগ থাকবে না। قَالُوْا তারা বলল الْاٰنَ এখন جِئْتَ بِالْحَقِّ আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন فَذَبَحُوْهَا অনন্তর তা জবাই করল وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ কিন্তু করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৭২. وَإِذْ قَتَلْتُمْ আর যখন তোমরা খুন করলে نَفْسًا এক ব্যক্তিকে فَادّٰرَأْتُمْ فِيْهَا এবং তার জন্য একে অন্যকে দায়ী করতে লাগলে وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ আর আল্লাহ এই বিষয়টি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ যা তোমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলে।

৭৩. فَقُلْنَا অনন্তর আমি বললাম اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا তাকে এর কোনো একে টুকরা দ্বারা স্পর্শ কর كَذٰلِكَ এরূপেই يُحْيِي اللّٰهُ আল্লাহ জীবিত করবেন الْمَوْتٰى মৃতকে وَيُرِيْكُمْ এবং তোমাদেরকে দেখান اٰيٰتِهٖ স্বীয় নিদর্শন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوۡبُكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ فَهِیَ كَالۡحِجَارَةِ اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنۡهُ الۡاَنۡهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخۡرُجُ مِنۡهُ الۡمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنۡهَا لَمَا یَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡیَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ (٧٤)

অনুবাদ : (৭৪) এমন এমন ঘটনার পর তোমাদের হৃদয় তবুও শক্তই রয়ে গেল, তার দৃষ্টান্ত পাথরের ন্যায় বা আরো বেশি কঠিন, আর কতক পাথর তো এমন আছে, যা হতে নহরসমূহ উথলিয়ে প্রবাহিত হয়, আর তার মধ্যে কতক এমনও আছে যা ফেটে যায় এবং তা হতে পানি বের হয়, আর তাদের কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর হতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে; এবং আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কার্য সম্বন্ধে।

اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمۡ یَسۡمَعُوۡنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ یُحَرِّفُوۡنَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوۡهُ وَهُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ (٧٥)

(৭৫) তোমরা কি এখনো আশা রাখ যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে কতক এমন লোকও গত হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনত, অতঃপর তাকে বিকৃত করত তাকে বুঝবার পর অথচ তারা জানত।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ قَالُوۡۤا اَتُحَدِّثُوۡنَهُمۡ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیۡكُمۡ لِیُحَآجُّوۡكُمۡ بِهٖ عِنۡدَ رَبِّكُمۡ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ (٧٦)

(৭৬) আর যখন তারা মিলিত হয় মুমিনদের সাথে, বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন গোপনে যায় তাদের কেউ ইহুদির নিকট, তখন তারা বলে, তোমরা কি মুসলমানদের বলে দাও আল্লাহ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন, পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে [এই বলে] যে, এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট [হতে তোমাদের কিতাবে] রয়েছে; তোমরা কি বুঝ না?

শাব্দিক অনুবাদ

৭৪. ثُمَّ قَسَتۡ তবুও শক্তই রয়ে গেল, قُلُوۡبُكُمۡ তোমাদের হৃদয় مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ এমন এমন ঘটনার পর فَهِیَ كَالۡحِجَارَةِ তার দৃষ্টান্ত পাথরের ন্যায় اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَةً বা আরো বেশি কঠিন وَاِنَّ مِنَ الۡحِجَارَةِ আর কতক পাথর তো এমন আছে لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنۡهُ الۡاَنۡهٰرُ যা হতে নহরসমূহ উথলিয়ে প্রবাহিত হয় وَاِنَّ مِنۡهَا আর তার মধ্যে কতক এমনও আছে لَمَا یَشَّقَّقُ যা ফেটে যায় فَیَخۡرُجُ مِنۡهُ الۡمَآءُ এবং তা হতে পানি বের হয় وَاِنَّ مِنۡهَا আর তাদের কতক এমনও আছে لَمَا یَهۡبِطُ যা উপর হতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে مِنۡ خَشۡیَةِ اللّٰهِ আল্লাহর ভয়ে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ এবং আল্লাহ বে-খবর নন عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ তোমাদের কার্য সম্বন্ধে।

৭৫. اَفَتَطۡمَعُوۡنَ তোমরা কি এখনো আশা রাখ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا لَكُمۡ যে তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে وَقَدۡ كَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمۡ অথচ তাদের মধ্যে কতক এমন লোকও গত হয়েছে یَسۡمَعُوۡنَ যারা শুনত كَلٰمَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার কালাম ثُمَّ یُحَرِّفُوۡنَهٗ অতঃপর তাকে বিকৃত করত مِنۡۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوۡهُ তাকে বুঝবার পর وَهُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ অথচ তারা জানত।

৭৬. وَاِذَا لَقُوۡا আর যখন তারা মিলিত হয় الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا মুমিনদের সাথে قَالُوۡا বলে– اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَاِذَا خَلَا আর যখন গোপনে যায় بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ তাদের কেউ ইহুদির নিকট قَالُوۡا তখন তারা বলে اَتُحَدِّثُوۡنَهُمۡ তোমরা কি মুসলমানদের বলে দাও بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیۡكُمۡ আল্লাহ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন لِیُحَآجُّوۡكُمۡ بِهٖ পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে [এই বলে] যে, عِنۡدَ رَبِّكُمۡ এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট [হতে তোমাদের কিতাবে] রয়েছে; اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ তোমরা কি বুঝ না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭৫- قوله أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামগণ আশা করতেন যে, ইহুদিরা মহানবী (সা.)-এর উপদেশ শুনে সত্যধর্ম গ্রহণ করবে, কিন্তু বাস্তবে হেদায়েত হলো আল্লাহর হাতে, আল্লাহ-ই ভালো জানেন কার তাকদীরে হেদায়েত আছে আর কার তাকদীরে নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিরাশ করে বলছেন– যখন তারা এরূপ বড় বড় নিদর্শন দেখে নিজেদের অন্তঃকরণ কঠিন পাথরের মতো করে নিয়েছে, আল্লাহর কালাম শুনে বুঝে তাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃত করেছে তাদের কাছে তোমরা কি আশা করতে পার? এ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল– ২ : যে সকল আনসারী সাহাবী ইহুদিদের বন্ধু ছিল এবং তাদের পরস্পরের মাঝে দুগ্ধতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আর তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি অভিলাষীও ছিলেন।

শানে নুযূল–৩ : আবার কেউ কেউ বলেন যে, নবী করীম ﷺ ও মুমিনগণের সাথে যে সকল ইহুদি সন্তান-সন্ততি চলাফেরা করতো, তারা ঈমান গ্রহণ করে নিক। তাই ছিল সাহাবাগণের কামনা। কারণ তারা ছিল পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব ও শরিয়তের অধিকারী। তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত। আর মুসলমানেরা তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বতাশূলভ আচরণ করত একমাত্র তাদের ঈমান গ্রহণ করার কামনা করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–৪ : কারো মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যে সত্তর জন ইহুদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার জন্য তূর পাহাড়ে ছিল, তাদের যে সকল বংশধর নবী করীম ﷺ-এর সময়ে ছিল। অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুম মান্য করেনি; বরং তাদের গোত্রের প্রতি অর্পিত নির্দেশে তারা পরিবর্তন করে বলেছিল যে, আমরা শুনতে পেয়েছি, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যদি সামর্থবান হও, তাহলে এ সকল দায়িত্ব পালন করবেন। আর যদি ইচ্ছা কর, তাহরে তা পালন না-ও করতে পার। তাদের এহেন হঠকারী ও মিথ্যাচারী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–৫ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ওলামায়ে ইহুদি সম্পর্কে। যারা নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় তাওরাত বিকৃত করে ফেলেছিল, হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল বলে প্রকাশ করেছে। নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ তাদের ঈমানের কামনা করেছিলেন, তাদের ঈমান কামনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–৬ : কারো মতে নবী করীম ﷺ ঘোষণা দিলেন যে, আমাদের মদিনা নগরীতে মুমিন ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পাবে না। তখন কা'ব বিন আশরাফ ও ওহাব বিন ইহুযা এবং অন্যান্য নেতারা বলল যে, তোমরা গিয়ে যারা মুমিন তাদের তথ্যানুসন্ধান কর। আর তাদেরকে তোমরা বলবে যে, আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি আর যখন ফিরে আসবে তখন কুফরি করবে। আল্লাহর বাণী বিকৃতকারী ইহুদি চক্রের বিভ্রান্তিকর এ কার্য-কলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–৭ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে সে সকল ইহুদিদের সম্পর্কে, যারা কোনো কোনো মুমিনকে লক্ষ্য করে বলত যে, আমরা ঈমান আনব এ মর্মে যে, তিনি [মুহাম্মদ ﷺ] নিশ্চয় নবী, কিন্তু তিনি আমাদের নবী নন। তিনি নবী হলেন একমাত্র তোমাদের। অতঃপর তারা যখন ফিরে যেত, তখন একে অপরকে বলত যে, তোমরা কি তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে স্বীকার করে নিয়েছ? অথচ আমরা পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যস্থতায় বিজয় কামনা করে আসছিলাম, সুতরাং তিনি হলেন সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ইলম দ্বারা প্রাধান্যতা দান করেছেন। তারা সত্যকে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৮ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে ঐ সকল ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা ওহী শ্রবণ করত অতঃপর তা বুঝে নেওয়ার পর তাকে বিকৃত করে দিত। তাদের কর্তৃক আল্লাহর কালাম বিকৃত করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহতি– ১ : ৪৩৮]

٧٦- قوله وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : কোনো কোনো মুনাফিক ইহুদি মুসলমানদের খবরাখবর পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য কপটভাবে ইসলাম গ্রহণ করত। তারা সকালে ইসলামের দাবি করার পর মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির মানসে তাওরাত খুলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা দেখাত। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এলে মনুষ্য শয়তান ইহুদি নেতা উবাই, কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখদের নিকট বসত। তখন তারা তাদেরকে নিন্দা করে বলত, আহমকের দল! তোমরা কেন নিজেদের জ্ঞান ও কিতাব দ্বারা মুসলমানদের প্রমাণ দিচ্ছ? এগুলো দ্বারা মুসলমানগণ কিয়ামত দিবসে ঝগড়া করবে যে, তারা আমাদের নবীর প্রশংসা তাওরাতে দেখিয়েছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কাবীর]

শানে নুযূল– ২ : একবার রাসূল ﷺ কুরাইজা দুর্গ অবরোধকালে দুর্গের নিচে দাঁড়িয়ে ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বানরের সন্তানেরা! যেহেতু কোনো এক সময় ইহুদিরা বানর হয়ে গিয়েছিল। আর এই ইহুদিরা ছিল তাদেরই বংশধর। তাই রাসূল ﷺ তাদেরকে বানরের সন্তান বলেছেন। নবীজির মুখে এরকম গালি শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের পূর্ব পুরুষের এই কলংকের খবর কেউ জানে না, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ জানলো কি করে? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ এই গোপন তথ্য গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। তাই তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল তোমরা এই ঘনাটি বলে দিচ্ছ নাকি? তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

গাভীর যে অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল : নিহত ব্যক্তিকে গরুর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, নিহত ব্যক্তিকে গরুর জিহবা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। কেউ বলেন, গরুর রান দ্বারা আর কেউ বলেন মেরুদণ্ড দ্বারা, আবার কেউ কেউ বলেন, গরুর কোনো একটি অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, গরুর কোন অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

قوله وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ -এর বিশ্লেষণ : মহান রাব্বুল আ'লামীন এ আয়াতে জড় পদার্থ পাথরের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন– (১) পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া (২) পাথর বিদীর্ণ হয়ে উহা হতে স্বল্প পানি নির্গত হওয়া। (৩) আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় অবস্থাটি কারো কারো অজানা থাকতে পারে। কারণ পাথরের কোনোরূপ জ্ঞান অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু প্রাণ নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনা শক্তি অনুভব করতে পারে না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণা প্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনি আয়াতের যৌক্তিকতা কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়।

قوله فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বনী ইরাঈলীদের অন্তরকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা পাথর কোনো কথা শুনেনা, তার উপর কোনো কিছুর প্রভাব পড়ে না। কারো আনুগত্য তার মধ্যে নেই। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলীদের অন্তর এত কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, কোনো হক বা সত্য তারা গ্রহণ করতে পারে না; কোনো উপদেশ-ধমক তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের অন্তরকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন।

اِدّٰرَئْتُمْ-এর অর্থ : اِدّٰرَأْتُمْ শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

(১) তোমরা নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ ও ঝগড়া করছিলে। (২) তোমাদের প্রত্যেকেই হত্যার ব্যাপারে নিজেকে মুক্ত রেখে অন্যকে দোষারোপ করছিলে। (৩) তোমরা একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ করছিলে।

قوله وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা এখানে বনী ইসরাঈলের হঠকারিতা কঠিন অন্তরের অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। পাথর শক্ত ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও মানুষের উপকার করে। এটা থেকে ঝর্ণা ধারার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইসরাঈলীদের অন্তর এমন যে, তারা না সত্য গ্রহণ করে, না তাদের অন্তর একটু বিগলিত হয়, না তাদের দ্বারা মানবকুলের কোনো উপকার সাধিত হয়।

قوله وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈল জাতির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, তাদের অন্তরগুলো কিছুমাত্রও বিগলিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ উপদেশে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব সৃষ্টি করে না। অথচ কঠিন প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায় এবং তা হতে পানি প্রবাহিত হয়। তারা পাথরের চেয়ে নিকৃষ্টতর।

قوله وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : বনী ইসরাঈল যে পাথরের চেয়ে কঠিন এবং সত্য পরিত্যাগে অনড় এখানে তার বর্ণনা রয়েছে। অনেক পাথর এমন আছে যে, আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। জড় পদার্থ হলেও আল্লাহর ভয় তাদের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু বনী ইসরাঈল বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা পাথরের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং অবাধ্য।

পাথর কর্তৃক আল্লাহভীতির ধরন : প্রস্তর মহান আল্লাহর এক কঠিন সৃষ্টি। তাদের জ্ঞান নেই, অনুভূতি নেই, নেই তাদের ভাব প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতা। কিভাবে সে আল্লাহকে ভয় করে? এর উত্তরে বলা যায়, ভয় করতে কোনো জ্ঞানের দরকার হয় না। বিবেকহীন জ্ঞানহীন প্রাণীর মধ্যেও সাধারণ ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তবে ভয় করার জন্য অনুভূতির প্রয়োজন রয়েছে। আর অনুভূতির জন্য জীবনের প্রয়োজন। অতএব এমনও হতে পারে যে, পাথরের মধ্যে বৃক্ষরাজির ন্যায় এক সূক্ষ্ম জীবন রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণিবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাদ্দারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশি শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরিউক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহর ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরিউক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

اَفَتَطْمَعُوْنَ দ্বারা সম্বোধন : تَطْمَعُوْنَ দ্বারা সেসব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ঈমানদার। মূলতঃ আয়াতটি এভাবে ছিল : اَفَتَطْمَعُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ -হে মুমিনগণ তোমরা কি আশা কর? কারো মতে, সকল সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, রাসূল ﷺ -এবং তাঁর সকল সাথী উদ্দেশ্য।

يُحَرِّفُوْنَ-এর অর্থ : تَحْرِيْف অর্থ- বিকৃত করা। এর দ্বারা আয়াতে উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে তাওরাতের হুকুম আহকাম পরিবর্তন করা। অর্থাৎ কোনো কোনো বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে ইহুদিরা পরিবর্তন করেছিল। পরিবর্তনের ধরন এমনও হতে পারে– স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ তা'আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন, তোমরা যে সব আদশে নিষেধ পালন ও বর্জন করতে সমর্থ না হও তবে তা মাফ।

অথবা, নিজেদের ইচ্ছামত হালাল হারাম ও বৈধ অবৈধের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিকৃত করেছে। যেমন মুহাম্মদ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিগুলো এবং তাদের মধ্যে বড় লোকদের উপর থেকে শাস্তির আইন রহিতকরণ উল্লেখযোগ্য।

قوله لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা কারা উদ্দেশ্য : এখানে ইহুদিদের ঐ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য, যারা নবী করীম (সা.)-এর যুগে অবস্থান করছিল। কারো মতে, ইহুদিদের মধ্য হতে যারা মুনাফিক ছিল তারাই উদ্দেশ্য।

قوله لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ দ্বারা কারা উদ্দেশ্য : يُحَاجُّوْكُمْ -এর অর্থ হলো– তাহলে তারা এটা নিয়ে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বিতর্ক করবে। অর্থাৎ ইহুদি নেতারা কপট বিশ্বাসীদের বলছে যে, তোমরা তাওরাত খুলে মুসলমানদের সুযোগ করে দিচ্ছ। মুসলমানরা তোমাদেরকে বলবে যে, মুহাম্মদ ও তার আনীত দীনকে সত্য বলে জেনেও তোমরা কুফরি করছ। –[কুরতুবী]

অথবা, তারা বলে যে, আমাদের মহান গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত যে সব আয়াত ও হেদায়েতের দ্বারা আমাদের বর্তমান ভূমিকার দোষ প্রমাণিত হয় তা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ কর না। অন্যথায় তারা তোমাদের আল্লাহর নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে এসব কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

عِنْدَ رَبِّكُمْ -এর অর্থ : এর অর্থ–তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। এটা হবে কিয়ামত দিবসে। যেমন অন্য আয়াতে আছে– ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ কেউ কেউ বলেন– عِنْدَ رَبِّكُمْ অর্থ– عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালকের কথা স্মরণ করার সময়। কারো মতে, عِنْدَ অর্থ فِىْ অর্থাৎ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ তাহলে তারা তোমাদের রবের ব্যাপারে বিতর্ক করবে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَسْقِى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْىُ মূলবর্ণ– (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পানি সেচে।

مُسَلَّمَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْلِيْمُ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সুস্থ,সবল।

لَاشِيَةَ : এর মধ্যে لا হচ্ছে لائى نفى جنس ; شَيْئَةٌ তার ইসম। অর্থ নিষ্কলঙ্ক।

مَاكَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব كَرُمَ আর كَادَ يَكَادُ যা فَعُلَ يَفْعُلُ এর ওজনে, মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ– (ك ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– না করতে পারার নিকটবর্তী হয়েছিল, তারা নিকটবর্তী হয়নি।

فَادّٰرَءْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) মাসদার اَلتَّدَارُءَةُ জিনস مهموز لام অর্থ– অতঃপর তোমরা একে অপরের উপর অপবাদ দিতে লাগলে। একে অপরকে অভিযুক্ত করলে। فَادّٰرَءْتُمْ মূলতঃ تَدَارَءْتُمْ ছিল। ت কে د দিয়ে পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে এবং শুরুতে একটি همزة وصل যুক্ত করা হয়েছে।

يُحْيِى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) মাসদার اَلْاِحْيَاءُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা জীবিত করবেন।

وَيُرِيكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) মাসদার اَلْاِرَاءَةُ জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা দেখান।

يَشَّقَّقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّشَقُّقُ মূলবর্ণ–(ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে [পাথর] ফেটে বিদীর্ণ হয়।

لَقُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللِّقَاءُ মূলবর্ণ–(ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মোলাকাত করে। সাক্ষাৎ করে।

خَلَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوَةُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পরস্পরে নিভৃতে মিলিত হয়।

لِيُحَاجُّوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা যুক্তি দিয়ে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : এখানে ثم হলো حرف عطف আর قَسَتْ ফে'ল আর قُلُوْبُكُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে فاعل অতঃপর بَعْدَ ذٰلِكَ হলো ظرف সুতরাং ফে'ল, ফা'য়েল ও ظرف মিলে قَسَتْ ফে'য়েলের جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ : এখানে اَللّٰهُ হলো مبتدأ আর مُخْرِجٌ مَّا الخ হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية এ বাক্যটি এখানে جملة معترضة হয়েছে।

قوله وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ : এখানে مَا হলো لَيْسَ এর অর্থে اَللّٰهُ হলো مَا এর اسم আর بِغَافِلٍ এর হরফে জার অতিরিক্ত। متعلق, غَافِلٍ-এর সাথে হয়ে جملة এটা عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আর خبر مَا হলো غافل অতঃপর স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

اَوَلَا يَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ (٧٧)

অনুবাদ : (৭৭) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ সবই অবগত আছেন যা তারা গুপ্ত রাখে এবং তাও যা প্রকাশ করে।

وَمِنۡهُمۡ اُمِّيُّوۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَاِنۡ هُمۡ اِلَّا يَظُنُّوۡنَ • (٧٨)

(৭৮) আর তাদের মধ্যে বহু মূর্খ আছে যারা মনভুলানো কথা ভিন্ন কিতাবের আর কিছুরই জ্ঞান রাখে না, তারা আর কিছুই নয়– শুধু অলীক কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

النصف

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَيۡدِيۡهِمۡ ۗ ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ (٧٩)

(৭৯) অতএব, অত্যন্ত অমঙ্গল হবে তাদের যারা লিখে নেয় কিতাব নিজেদের হাতে, অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর তরফ হতে , উদ্দেশ্য এটা দ্বারা সামান্য অর্থ উপার্জন করবে, সুতরাং তাদের ভীষণ সর্বনাশ হবে তাদের হাত যাকিছু লিখে নিত তদ্দরুন, তাদের আরো ভীষণ সর্বনাশ হবে যা কিছু তারা উপার্জন করত তদ্দরুন।

وَقَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدَةً ؕ قُلۡ اَتَّخَذۡتُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ عَهۡدًا فَلَنۡ يُّخۡلِفَ اللّٰهُ عَهۡدَهٗۤ اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ (٨٠)

(৮০) আর ইহুদিরা বলল, কখনো অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না গণনীয় কয়েক দিন ব্যতীত; আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ হতে কোনো ওয়াদা নিয়েছ? যাতে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করবেন না। অথবা আল্লাহর উপর এমন বাক্য আরোপ করছ যার কোনো জ্ঞান-প্রসূত প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

بَلٰى مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ (٨١)

অনুবাদ : (৮১) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে, বস্তুত এরূপ লোকই দোজখী হয়, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ

৭৭. اَوَلَا يَعۡلَمُوۡنَ তারা কি জানে না যে, اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ আল্লাহ সবই অবগত আছেন مَا يُسِرُّوۡنَ যা তারা গুপ্ত রাখে وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ এবং তাও যা প্রকাশ করে।

৭৮. وَمِنۡهُمۡ اُمِّيُّوۡنَ আর তাদের মধ্যে বহু মূর্খ আছে لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ যারা কিতাবের কিছুরই জ্ঞান রাখে না اِلَّاۤ اَمَانِيَّ মনভুলানো কথা ভিন্ন وَاِنۡ هُمۡ তারা আর কিছুই নয়– اِلَّا يَظُنُّوۡنَ শুধু অলীক কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

৭৯. فَوَيۡلٌ অতএব অত্যন্ত অমঙ্গল হবে তাদের لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ যারা লিখে নেয় الۡكِتٰبَ কিতাব بِاَيۡدِيۡهِمۡ নিজেদের হাতে ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ অতঃপর বলে هٰذَا এটা مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ হতে لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ উদ্দেশ্য এটা দ্বারা উপার্জন করবে ثَمَنًا قَلِيۡلًا সামান্য অর্থ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ সুতরাং তাদের ভীষণ সর্বনাশ হবে مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ তাদের হাত যা কিছু লিখে নিত তদ্দরুন وَوَيۡلٌ لَّهُمۡ তাদের আরো ভীষণ সর্বনাশ হবে مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ যা কিছু তারা উপার্জন করত তদ্দরুন।

৮০. وَقَالُوۡا আর ইহুদিরা বলল لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ কখনো অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدَةً গণনীয় কয়েক দিন ব্যতীত قُلۡ আপনি বলুন اَتَّخَذۡتُمۡ তোমরা কি নিয়েছ? عِنۡدَ اللّٰهِ আল্লাহ হতে عَهۡدًا কোনো ওয়াদা فَلَنۡ يُّخۡلِفَ اللّٰهُ যাতে আল্লাহ খেলাফ করবেন না عَهۡدَهٗۤ তাঁর ওয়াদা । اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ অথবা এমন বাক্য আরোপ করছ عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর উপর مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ যার কোনো জ্ঞান-প্রসূত প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

৮১. بَلٰى হ্যাঁ مَنۡ كَسَبَ سَيِّئَةً যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে وَّاَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـئَتُهٗ এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে فَاُولٰٓـئِكَ বস্তুত এরূপ লোকই اَصۡحٰبُ النَّارِ দোজখী হয় هُمۡ فِيۡهَا তারা তথায় خٰلِدُوۡنَ অনন্তকাল থাকবে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৮২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এই শ্রেণির লোকই জান্নাতবাসী হয়, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨٢)
(৮৩) আর যখন আমি নিলাম প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈল হতে যে, [কারো] ইবাদত করো না আল্লাহ ব্যতীত। আর উত্তমরূপে মাতা-পিতার খেদমত করবে এবং আত্মীয়দেরও, এতিমদেরও, মিসকিনদেরও, আর সর্বসাধারণের সাথে সুন্দররূপে কথা বলবে, আর কায়েম করবে নামাজ ও আদায় করতে থাকবে জাকাত, অনন্তর তোমরা সকলেই তা ভঙ্গ করলে অল্প কয়েজন ব্যতীত, আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাস।	وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٨٣)

শাব্দিক অনুবাদ

৮২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে اُولٰٓئِكَ এই শ্রেণির লোকই اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ জান্নাতবাসী হয় هُمْ فِيْهَا তারা তথায় خٰلِدُوْنَ অনন্তকাল থাকবে।

৮৩. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি নিলাম مِيْثَاقَ প্রতিশ্রুতি بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈল হতে যে لَا تَعْبُدُوْنَ [কারো] ইবাদত করো না اِلَّا اللّٰهَ আল্লাহ ব্যতীত। وَبِالْوَالِدَيْنِ আর মাতা-পিতার খেদমত করবে اِحْسَانًا উত্তমরূপে وَّذِى الْقُرْبٰى এবং আত্মীয়দেরও وَالْيَتٰمٰى এতিমদেরও وَالْمَسٰكِيْنِ মিসকিনদেরও وَقُوْلُوْا আর কথা বলবে لِلنَّاسِ সর্বসাধারণের সাথে حُسْنًا সুন্দররূপে وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর কায়েম করবে নামাজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও আদায় করতে থাকবে জাকাত ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ অনন্তর তোমরা সকলেই তা ভঙ্গ করলে اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ অল্প কয়েজন ব্যতীত وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭৮- **قوله وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)** হতে বর্ণিত, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, উপরোল্লিখিত ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারো মতে মাজুস বা অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)ও এ মতে একমত পোষণ করেছেন। কারো মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল – ২ : ইকরিমা ও যাহহাক (র.) বলেন, আরবের আনসারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, যারা লেখাপড়া জানত না। কারো মতে আহলে কিতাবদের একটি দল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা তাদের কৃত গুনাহের জন্য কিতাব উত্তোলন করেছিল বিধায় তারা উম্মি হয়ে যায়।

শানে নুযূল– ৩ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত এমন এক জাতি সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা কোনো কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি। সুতরাং তারা নিজেরাই কিতাব লিখে বলেছিল যে, এটা আল্লাহর কিতাব। ফলে তারা কিতাবকে অস্বীকার করার কারণে, তাদেরকে উম্মি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ তারা হলো একটি নির্বোধ জাতি, প্রথমোক্ত মতামতই স্থান বিশেষে অধিক প্রযোজ্য।–[বাহের মুহীত : ৪৪২]

৭৯- قوله فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত ইহুদি পণ্ডিতদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, ইহুদিদের মধ্য থেকে একটি দল, যারা তাদের কিতাবসমূহে রাসূল ﷺ -এর বর্ণিত গুণাবলি ও চরিত্রের বর্ণনাসমূহকে পরিবর্তন করে ফেলে, রাসূল ﷺ -এর গঠন-আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে লম্বাকৃতিতে একজন আদম সন্তান রূপে পরিচিতি দান করে। অতঃপর তাদের অনুসারীদেরকে বলত যে, দেখ সর্বশেষে যে আদর্শে নবী আগমন করবেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝে সে চরিত্র ও গুণ নেই। এমন কি ইহুদি পণ্ডিতদের ভয় ছিল যে, নবীর গুণাবলি ও পরিচিতি বর্ণনা যদি যথাস্থানে থেকে যায়, তাহলে তাদের হাদিয়া তোহফা বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য নবীর গুণাবলির বর্ণনা পরিবর্তন করে দেয়। তাদের পক্ষ থেকে সত্যকে গোপন করার ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে যে সকল মানুষেরা কোনো নবীর কিতাবের প্রতি ঈমান আনেনি; বরং তারা স্বহস্তে কিতাব রচনা করে তাতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী হালাল ও হারাম বিষয়াবলি নির্ধারণ করে বলে দিত যে, এ হচ্ছে আল্লাহর গ্রন্থ আসমানি কিতাব। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবূ সালেক বলেন যে, বনু আমের নিলুই (মৃত্যু ৩৭ হিঃ) গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ সুরাহ আল কুরাইশী নবী করীম ﷺ-এর সাথে সন্ধি করেছিল, অতঃপর সে নিজেই তা ভঙ্গ করে মুরতাদ বা ধর্মদ ত্যাগী হয়ে যায়। তার এহেন হঠকারিতামূক কাজের পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহিত : ৪৪৩/১, ইবনে কাছীর : ১১৭/১]

আয়াতে أُمِّيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : أُمِّيُّوْنَ শব্দটি أُمِّىٌّ -এর বহুবচন। أُمٌّ বা أُمَّةٌ -এর প্রতি নিসবাত করে أُمِّى বলা হয়। أُمِّىٌّ হলো– মানুষ তো মাতৃগর্ভ থেকে লেখাপড়াবিহীন আসে, এ অবস্থায় যারা সারা জীবন বহাল থাকে, তারা না লেখা জানে আর না পড়া জানে। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন–اَنَا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ

আবূ উবায়দার মতে, اُمُّ الْكِتَابِ -এর প্রতি নিসবত করে اُمِّىٌّ বলা হয়ে থাকে। আর্থাৎ, তাদের উপর কিতাব নাজিল হয়েছিল বিধায় তাদেরকে اُمِّىٌّ বলা হয়েছে।

اُمِّىٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য : اُمِّىٌّ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে না কোনো কিতাবের স্বীকৃতি দেয়, না কোনো রাসূলের উপর বিশ্বাস করে। অন্য তাফসীরকার বলেন, যে লেখতে এবং পড়তে জানে না তাকে উম্মী বলে। আয়াতে দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য। কেননা ইহুদিরা কিতাব ও রাসূলের স্বীকৃতি দিত। তদুপরি আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন যে, نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ -আমরা উম্মী জাতি লিখতে জানি না। اُمَّةٌ শব্দের প্রতি নিসবত করে اُمِّيَّةٌ ব্যবহৃত হয়েছে। ইকরামা ও দাহ্হাক বলেন, তারা হলো আরবের খ্রিস্টান সম্প্রদায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, তারা হলো অগ্নিপূজক। –[কুরতুবী]

اِلَّا اَمَانِىَّ এর অর্থ : اَمَانِى শব্দটি اُمْنِيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– তেলাওয়াত। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তারা কিতাব সম্পর্কে জানে না, জানে শুধু তেলাওয়াত।

অথবা اَمَانِىُّ অর্থ– اَكَاذِيْبُ তথা ভ্রান্ত, মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্য অর্থাৎ তারা মনগড়া কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে। কিতাব সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, বরং কিছু মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য উপস্থাপন করছে মাত্র।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, এর অর্থ এমন আশা যা তাদের জন্য নয়। অতএব তারা আল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা করে যা লাভের যোগ্য তারা নয়। কেউ কেউ বলেন, নির্ধারিত কিছুকে اَمَانِىُّ বলা হয়।

হাত দিয়ে কিতাব লেখার অর্থ : ইহুদিরা নিজের হস্তে কিতাব লিখে, এর অর্থ হলো তারা কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেখানে মহানবী ﷺ -এর আলোচনা ছিল, সেখানেই তারা কলম ধরে বিকৃত বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে লোকসমাজে প্রচার করে যে, এটাই আল্লাহর কিতাব। এখানে সঠিক ও নিখুঁতভাবে লেখার কথা বলা হয়নি।

قوله ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ-এর তাৎপর্য : মূলতঃ তাওরাতে বিশদভাবে নবী করীম ﷺ-এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; কিন্তু ইহুদি জ্ঞানপাপীরা এতে পরিবর্তন করে। মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি লোক চক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য তারা অবিকৃত কপি গোপন করে হস্তলিখিত কপি প্রকাশ করে বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত তাওরাত কিতাব।

কিভাবে তারা স্বল্প মূল্যে ক্রয় করল? ইহুদিরা কিতাব বিকৃত করার মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ তথা নেতৃত্ব ও অন্যান্য ভোগ বিলাসের প্রত্যাশী হয়েছে। যদিও তা অনেক বড়। কিন্তু পরকালের কঠিন শাস্তির মোকাবিলায় তা অত্যন্ত নগণ্য। তারা স্থায়ী শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে।

وَيْلٌ কি? : وَيْلٌ-এর অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারদের মতভেদ দেখা যায়। হযরত উসমান (রা.) মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, وَيْلٌ হলো আগুনের পাহাড়। হযরত আবূ সাঈদ বর্ণনা করেন, وَيْلٌ হলো জাহান্নামে অবস্থিত দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা যাতে পতিত ব্যক্তি ৪০ বছর পর্যন্ত অবিরত পড়তেই থাকবে।

সুফিয়ান ইবনে আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত وَيْلٌ বলতে ঐ স্থানকে বুঝায়, যা জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে হবে এবং ঐ স্থান দিয়ে জাহান্নামীদের পূঁজ প্রবাহিত হবে। যাহরাভী বলেন যে, وَيْلٌ হলো জাহান্নামের একটি দরজা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَيْلٌ হলো কষ্টদায়ক শাস্তি। খলীল বলেন, জঘন্য খারাপকে وَيْلٌ বলা হয়।

কলম দ্বারা প্রথম লেখক : হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত। সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন হযরত ইদ্রীস (আ.)। কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে লেখার শক্তি দান করা হয়েছে। তার নিকট থেকে বনী আদম লেখার উত্তরাধিকারী হয়। –[কুরতুবী]

بِاَيْدِيْهِمْ বলার উদ্দেশ্য : একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ হাত দ্বারা লিখে, তথাপি আল্লাহ তা'আলা بِاَيْدِيْهِمْ উল্লেখ করেছেন, তাকিদের জন্য। যেমন– وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহর সাথে হঠকারিতা এবং প্রকাশ্যে অন্যায় করাকে বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, স্বয়ং হাত দ্বারা গর্হিত কাজ করে। তাদের এ অন্যায়ের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ নেই। তারা একে স্বাভাবিক মনে করে। –[কুরতবী]

এখানে عَهْد দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে عَهْد বলে وَعْد উদ্দেশ্য। وَعْد-এর স্থলে عَهْد ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহর এই عَهْد শুনিয়ে নিশ্চিত করা।

اَيَّام দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরকারগণ اَيَّامٌ -এর দু'টি তাফসীর করেন যেমন–

ক. اَيَّامٌ তিন থেকে দশের ভেতরের সংখ্যাকে বুঝায়। দশের বাইরের সংখ্যাকে বুঝায় না। অতএব خَمْسَةَ اَيَّامٍ বলা যায় না। একদল মুফাস্সির বলেন– اَيَّامٌ বলতে সাত দিন বুঝানো হয়েছে।

খ. তাফসীরে কাবীরের গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, اَيَّامٌ দ্বারা চল্লিশ দিন উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি বলেন– বনী ইসরাঈল চল্লিশ দিন গো-বৎস পূজা করেছিল।

قوله وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ -এর মর্মার্থ : اَحَاطَتْ শব্দের অর্থ হলো, ঘিরে ফেলা। অতএব, আয়াতাংশের অর্থ হলো তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলেছে। অর্থাৎ তার কোনো পুণ্য নেই। এ অর্থ কেবলমাত্র কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা কুফরির কারণে তাদের কোনো ভালো কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কুফরির পূর্বে কোনো নেক আমল থাকলেও তা পণ্ড হয়ে গেছে। এজন্য কাফেরদের আমলনামায় কেবল পাপই অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের মূল ঈমানই একটি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ও সৎকাজ। তদুপরি বহুমুখী শাখাবিশিষ্ট অন্যান্য আমল তাদের আমলনামায় শামিল করা হয়। এজন্যই ঈমানদারগণ সম্পূর্ণ নেকীশূন্য হতে পারে না, অতএব মুমিনদের ক্ষেত্রে اِحَاطَةٌ শব্দটি উপরিউক্ত অর্থে প্রযোজ্য নয়। –[বয়ানুল কুরআন]

قوله اَصْحٰبُ النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَصْحٰبُ النَّارِ বলে এখানে কাফেরদের ব্যাপারে এমন একটি চিরন্তন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যদ্দারা তাদের চির আবাস দোজখ হবে বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আ.)-কে ইহুদিরা নবী মানে, কিন্তু তাঁর পরের দু'জন নবীকে তারা নবী মান্য করে না। তাই তারা কাফের ও চিরদিনের জন্য জাহান্নামী। কাজেই তাদের অল্প কয়েক দিন মাত্র দোজখের শাস্তি ভোগ করার দাবি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে।

শাস্তির আয়াতের পর পুরস্কারের আয়াত উল্লেখের কারণ : কুরআনে কারীমের যেখানেই শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে সেখানেই পাশাপাশি পুরস্কারের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা– (১) এটা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারের নমুনা। কাফেরদের চরম চূড়ান্ত শাস্তির পাশাপাশি মুমিনদের চূড়ান্ত নাজাত-এর ঘোষণা দেওয়াই ইনসাফ-এর কথা। (২) ভয় আর আশা তথা আশা নিরাশার মাঝে অবস্থান করাই উত্তম। মুমিনদের ভয় আর প্রত্যাশা হবে সমান শাস্তির আয়াত দ্বারা ভয় আর পুরস্কারের আয়াত দ্বারা প্রত্যাশা এ দু' জিনিসের মাঝেই মুমিন জীবনের ভারসাম্যতা। (৩) পুরস্কার দ্বারা আল্লাহর পূর্ণ রহমত আর শাস্তি দ্বারা তাঁর হিকমতের পূর্ণতা প্রকাশ পায়। –[কাবীর]

سَيِّئَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : سَيِّئَةً বলতে সকল প্রকার কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, شِرْك উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতের শেষের দিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলা হয়েছে। কবীরা গুনাহ দ্বারা চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না; বরং তাদেরকে শাস্তির পর বেহেশতে নিয়ে আসা হবে।

قوله مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ-এর বর্ণনা : বনী ইসরাঈল থেকে যে সব অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো নিম্নরূপ– (ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। (খ) মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। (গ) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। (ঘ) এতিম মিসকিনদের সাথেও আচরণ করতে হবে। (ঙ) সর্বস্তরের মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। (চ) সম্মিলিতভাবে সালাতের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। (ছ) জাকাত প্রদান করবে। (জ) নিজেদের মধ্যে পরস্পর রক্তপাত করবে না। (ঝ) অন্যকে ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত করবে না।

আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈল থেকে তাঁর ইবাদত করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। অতঃপর পিতামাতার সাথে সদাচরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, এর কারণ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম, সদা বর্ষিত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিধায় সকল শুকরিয়ার পূর্বে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তাঁর অনুগ্রহের পরেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তদীয় পিতা-মাতার অনুগ্রহ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হচ্ছেন সন্তানের মূল উৎস ও অস্তিত্ব লাভের মাধ্যম।
২. মানব অস্তিত্বে আসার আসল এবং মূল প্রভাবশালী হলেন আল্লাহ, আর বাহ্যিক হলেন পিতা-মাতা।
৩. আল্লাহ বান্দা থেকে তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের বিনিময় চান না। তদ্রূপ পিতা-মাতাও সন্তান থেকে তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় চান না।
৪. বান্দা অপরাধ করলেও আল্লাহ তদীয় নিয়ামত থেকে বান্দাকে বঞ্চিত করেন না। তদ্রূপ পিতা-মাতাও শত অপরাধ সত্ত্বেও সন্তান থেকে বাৎসল্য প্রত্যাহার করেন না।

قوله قَلِيْلًا দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে : যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত قَلِيْلًا দ্বারা কেবল তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর আনীত শরিয়তের পুরোপুরি অনুসারী ছিল। আর তাওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামি শরিয়তের অনুসারী হয়ে যায়।

يَتِيْم-এর অর্থ : يَتِيْم শব্দটি একবচন, বহুবচন اَيْتَام ও يَتَامٰى -যে সন্তানের পিতা মারা যায়, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাকে يَتِيْم বলা হয়, তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এতিম বলা হয় না। তবে যার মাতা মারা যায় তাকে এতিম বলা হয় না। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, এ নীতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য জীবের কোনো বাচ্চার মা মারা গিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে তাকেও يَتِيْم বলা হয় না। একই ঝিনুকে একটি মাত্র মুক্তা সৃষ্টি হলে তাকে دُرِّ يَتِيْم বলে।

তালহা ইবনে ওমর (র.) বলেন, আমি হযরত আতা (র.)-কে বললাম, আমার কাছে ভ্রান্ত লোকেরা আসা যাওয়া করে; কিন্তু আমার মেজায কঠোর, এ ধরনের লোক আমার কাছে আসলে আমি তাদের তাড়িয়ে দেই, আতা (র.) বললেন, এরূপ করবে না। কেনেনা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا অর্থাৎ মানুষের সাথে মার্জিত কথা বলবে। ইহুদি খ্রিস্টানরাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। সুতরাং মুসলমান অতি মন্দ হলেও সে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতব্য : তাফসীরবিদগণ ইহুদিদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহগার হলে গুনাহ পরিমাণে দোজখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোজখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদিদের দাবির সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার। হযরত ঈসা (আ.) ও হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোনো পাপের কারণে তারা দোজখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলাবাহুল্য, এ দাবিটি একটি সত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য– এরূপ দাবিই অসত্য। অতএব, হযরত ঈসা (আ.) ও হুজুরে আকরাম (সা.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ইহুদিরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোজখ থেকে মুক্তি পাবে, এমন কথা কোনো আসমানি গ্রন্থে নেই– যা আলোচ্য আয়াতে অস্বীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইহুদিদের দাবিটি যুক্তিহীন; বরং যুক্তিবিরুদ্ধ। গুনাহগার দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কারণ কুফরের কারণে কোনো সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য থাকে না। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গুনাহ ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমতঃ তাদের ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবান্তর।

জ্ঞাতব্য : 'অল্প কয়েকজন' অর্থ তারাই যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা হযরত মূসা (আ.) প্রবর্তিত শরিয়তের অনুসারী ছিল এবং তাওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামি শরিয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বুঝা যায় যে, একাত্ববাদে ঈমান এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এতিম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, নামাজ পড়া এবং জাকাত দেওয়া ইসলামি শরিয়তসহ পূববর্তী শরিয়তসমূহেও ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয়

قوله وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا **:** আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে– যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হোক বা অসৎ, সুন্নী হোক বা বিদআতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে নবুয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আর যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফেরাউন অপেক্ষা বেশি মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُمِّيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন أُمِّىٌ অর্থ– নিরক্ষর লোক। এখানে মূর্খ ইহুদিরা উদ্দেশ্য।

أَمَانِيَّ : শব্দটি বহুবচন, একবচন أُمْنِيَّةٌ অর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা।

يَظُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ . ن . ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ তারা বিশ্বাস করে।

وَيْلٌ : শব্দটি اسْمٌ অর্থ– দোজখের একটি উপত্যকার নাম। আজাবের কষ্ট।

يَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা বিনিময় লাভ করতে পারে।

اَتَّخَذْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা অঙ্গীকার করেছ।

اَحَاطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বেষ্টন করে নিয়েছে।

مِيْثَاقَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– অঙ্গীকার, শপথ, কথা, ওয়াদা।

حُسْنًا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ فعل تفضيل অর্থ– ভালো উত্তম।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কায়েম কর। তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছ।

مُعْرِضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ– বিমুখ লোকজন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে مِنْهُمْ শব্দটি خبر مقدم আর أُمِّيُّوْنَ হলো موصوف আর لَا يَعْلَمُوْنَ صفت মিলে مبتدأ مؤخر তারপর খবর ও مبتدأ মিলে বাক্য হয়ে এবার موصوف ও صفة , الْكِتٰبَ جملة اسمية গঠিত হয়ে গেছে।

قوله وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ : এখানে اَخَذْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ মাফউল। ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية গঠিত হয়েছে। قوله اِحْسَانًا পদটি উহ্য اَحْسِنُوْا এর মাফউল হেতু মানসূব হয়েছে। قَوْلُهٗ حُسْنًا পদটি উহ্য قَوْلًا -এর সিফাত আর قَوْلًا হলো قُوْلُوْا -এর মাফউলে মুতলাক।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ (٨٤)

অনুবাদ : (৮৪) আর যখন আমি তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং বিতাড়িত করবে না স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিজ দেশ হতে, অতঃপর তোমরা অঙ্গীকারও করলে এবং অঙ্গীকারও এরূপ যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ؗ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٨٥)

(৮৫) অতঃপর তোমাদের অবস্থা হলো এই- পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ এবং বের করে দিতেছ একদল অন্য দলকে নিজেদের দেশ হতে, ঐ সমস্ত স্বজনদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ পাপ ও অন্যায়মূলক; আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ তোমাদের নিকট বন্দী হয়ে আসে, তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করিয়ে দাও, অথচ তাদেরকে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তবে কি তোমরা ঈমান রাখ কিতাবের কোনো কোনো অংশের প্রতি এবং অবিশ্বাস কর কোনো কোনো অংশকে? সুতরাং কি শাস্তি হতে পারে তার যে তোমাদের মধ্য হতে এরূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামত দিবসে ভীষণ আজাবে নিক্ষিপ্ত হওয়া ব্যতীত? আর আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন, তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

শাব্দিক অনুবাদ

৮৪. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি নিলাম مِيْثَاقَكُمْ তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি যে لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না وَلَا تُخْرِجُوْنَ এবং বিতাড়িত করবে না اَنْفُسَكُمْ স্বগোত্রীয় লোকদেরকে مِّنْ دِيَارِكُمْ নিজ দেশ হতে ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ অতঃপর তোমরা অঙ্গীকারও করলে وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ এবং অঙ্গীকারও এরূপ যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।

৮৫. ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ অতঃপর তোমাদের অবস্থা এই হলো تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا এবং বের করে দিচ্ছ একদল অন্য দলকে مِّنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের দেশ হতে تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ ঐ সমস্ত স্বজনদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ ও অন্যায়মূলক وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ তোমাদের নিকট আসে اُسٰرٰى বন্দী হয়ে تُفٰدُوْهُمْ তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করিয়ে দাও وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ اِخْرَاجُهُمْ তাদেরকে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করাও اَفَتُؤْمِنُوْنَ তবে কি তোমরা ঈমান রাখ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ কিতাবের কোনো কোনো অংশের প্রতি وَتَكْفُرُوْنَ এবং অবিশ্বাস কর بِبَعْضٍ কোনো কোনো অংশকে فَمَا جَزَآءُ সুতরাং কি শাস্তি হতে পারে তার مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ যে এরূপ করে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে اِلَّا خِزْىٌ লাঞ্ছনা ব্যতীত فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামত দিবসে يُرَدُّوْنَ নিক্ষিপ্ত হওয়া اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ভীষণ আজাবে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اشۡتَرَوُا الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا بِالۡاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ الۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ (٨٦)

অনুবাদ : (৮৬) এরাই তারা যারা দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে আখেরাতের বদলে, সুতরাং তাদের আজাবও কম হবে না, কেউ তাদের সহায়তাও করতে পারবে না।

وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَقَفَّيۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيۡنَا عِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ الۡبَيِّنٰتِ وَاَيَّدۡنٰهُ بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌۢ بِمَا لَا تَهۡوٰۤى اَنۡفُسُكُمُ اسۡتَكۡبَرۡتُمۡ ۚ فَفَرِيۡقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيۡقًا تَقۡتُلُوۡنَ (٨٧)

(৮৭) আর আমি দান করলাম মূসাকে কিতাব এবং তাঁর পর ক্রমান্বয়ে পাঠালাম বহু পয়গম্বর, আর দান করলাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রকাশ্য দলিলসমূহ আর তাঁকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করলাম। এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, যখনই তোমাদের নিকট আনলেন কোনো রাসূল তোমাদের অবাঞ্ছিত আহকাম [তখনই] তোমরা অহংকার করতে লাগলে, ফলে কাউকেও মিথ্যাবাদী বললে, আর কাউকেও তো হত্যাই করে ফেলতে।

وَقَالُوۡا قُلُوۡبُنَا غُلۡفٌ ؕ بَلۡ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَقَلِيۡلًا مَّا يُؤۡمِنُوۡنَ (٨٨)

(৮৮) আর তারা বলে, আমাদের অন্তঃকরণ সংরক্ষিত; বরং তাদের কুফরির কারণে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত রয়েছে এবং তারা অতি সামান্য পরিমাণেই ঈমান রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ

৮৬. أُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ এরাই তারা যারা اشۡتَرَوُا গ্রহণ করেছে الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا দুনিয়াকে بِالۡاٰخِرَةِ আখেরাতের বদলে فَلَا يُخَفَّفُ সুতরাং কম হবে না عَنۡهُمُ তাদের الۡعَذَابُ আজাবও وَلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ কেউ তাদের সহায়তাও করতে পারবে না।

৮৭. وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا আর আমি দান করলাম مُوۡسَى الۡكِتٰبَ মূসাকে কিতাব وَقَفَّيۡنَا এবং ক্রমান্বয়ে পাঠালাম مِنۡۢ بَعۡدِهٖ তাঁর পর بِالرُّسُلِ বহু পয়গম্বর وَاٰتَيۡنَا আর দান করলাম عِيۡسَى ابۡنَ مَرۡيَمَ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে الۡبَيِّنٰتِ প্রকাশ্য দলিলসমূহ وَاَيَّدۡنٰهُ আর তাঁকে সাহায্য করলাম بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ রূহুল কুদুস দ্বারা اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, যখনই তোমাদের নিকট আনলেন رَسُوۡلٌۢ কোনো রাসূল بِمَا لَا تَهۡوٰۤى اَنۡفُسُكُمُ তোমাদের অবাঞ্ছিত আহকাম اسۡتَكۡبَرۡتُمۡ [তখনই] তোমরা অহংকার করতে লাগলে فَفَرِيۡقًا كَذَّبۡتُمۡ ফলে কাউকেও মিথ্যাবাদী বললে وَفَرِيۡقًا تَقۡتُلُوۡنَ আর কাউকেও তো হত্যাই করে ফেলতে।

৮৮. وَقَالُوۡا আর তারা বলে قُلُوۡبُنَا غُلۡفٌ আমাদের অন্তঃকরণ সংরক্ষিত; بَلۡ বরং لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ তাদের উপর আল্লাহর লা'নত بِكُفۡرِهِمۡ তাদের কুফরির কারণে فَقَلِيۡلًا مَّا يُؤۡمِنُوۡنَ এবং তারা অতি সামান্য পরিমাণেই ঈমান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৪- قوله وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَكُمۡ لَا تَسۡفِكُوۡنَ دِمَآءَكُمۡ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ১. পরস্পর খুনাখুনি করবে না। ২. কেউ কাউকে বহিষ্কার করবে না। ৩. নিজেদের মধ্যে কেউ বন্দি হলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে। এই তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম দুটি তারা লঙ্ঘন করত। কিন্তু তৃতীয়টি মানার ব্যাপারে ছিল তৎপর। ঘটনাটির মূল বিবরণ হলো এই মদিনাতে দুটি আনসার গোত্র বাস করত আউস এবং খাজরাজ। আউস এবং খাজরাজের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। কখনো কখনো এ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেত। পাশাপাশি সেখানে দুটি ইহুদি গোত্র বাস করত। বনী কুরাইজা ও বনী নজীর। বনী কুরাইজা ছিল আউসের বন্ধু আর বনী নজীর ছিল খাজরাজের বন্ধু। ফলে আউস এবং খাজরাজের লড়াই যখন শুরু হতো, তখন বনী কুরাইজা ও বনী নজীরও তাদের বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত, তাতে আউস এবং খাজরাজের লোক যেমন মারা যেত তেমনি বনী নজীর ও বনী কুরাইজার লোকও মারা যেত। একে অপরকে দেশান্তর করত; কিন্তু তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। যখন তাদের কেউ প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হতো তখন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনত। তাদের এহেন দৃষ্টান্তপূর্ণ আচরণ -এর জবাবে আল্লাহ পাক এই আয়াতগুলো নাজিল করেন। আর তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো আপনারা বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনেন কেন? তখন তারা বলে এটা আল্লাহর নির্দেশ। তাহলে যুদ্ধ করেন কেন? আমাদের মিত্ররা হেরে যাবে এই লজ্জায়।

৮৭- قوله وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলদের গর্ব-অহংকার ইচ্ছা ও কামনাপূজারী হওয়ার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তারা তাওরাত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর পরে অপরাপর যত নবী আগমন করেছিলেন তাদের বিরোধিতা করেছিল। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা শেষ হয় হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে। তিনি আসমানি কিতাব ইঞ্জিল প্রাপ্ত হন। যার কোনো কোনো আহকাম তাওরাতের বিপরীত ছিল। তাকে নতুন নতুন মু'জিযাও প্রদান করা হয়েছিল। যেমন মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করা, মাটির তৈরি পাখির মধ্যে ফুঁক দিয়ে আল্লাহর হুকুমে উড়িয়ে দেওয়া, রুগীকে ফুঁক দ্বারা আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য করা, গায়েব অবগত করা ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও তাঁকে রূহুল কুদুস অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলের মিথ্যা প্রতিপাদন ও অহংকার আরো বেড়ে চলে। তাদের সে পুরনো ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ **দ্বারা সম্বোধন :** وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ বাক্য দ্বারা যদিও মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের পূর্ব-পুরুষদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ তুলে ধরে তাদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য। ৮৪ নং আয়াতে অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতসমূহে তাদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ যে সে অঙ্গীকারের বিপরীত কর্ম তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব তাদের কর্ম দ্বারা অঙ্গীকার ভঙ্গ হচ্ছে। কেননা তখন আল্লাহ তো বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে ইহুদিদের জন্যই অঙ্গীকার পেশ করেছিলেন। আর তারাই অঙ্গীকার করেছিল সকল ইহুদিদের পক্ষে। সুতরাং মহানবীর সমসাময়িক ইহুদিরাও অঙ্গীকারের মধ্যে শামিল এবং তারাই নিজ অঙ্গীকারের বিপরীত কর্ম করে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তীদের সম্বোধন এবং পরবর্তীদের তিরস্কার করা হয়েছে। অতএব, وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ -এর অর্থ হবে- اَمَرْنَاكُمْ وَاَكَّدْنَا الْاَمْرَ فَاَقْرَرْتُمْ بِلُزُوْمِهٖ وَوُجُوْبِهٖ অর্থাৎ আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি আর সে নির্দেশকে অবশ্য পলনীয় করেছি, অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই পালনীয় করবে বলে স্বীকৃতি দিয়েছ। -[কাবীর]

قَوْلُهٗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** এ স্থানে ইহুদিদের দু'টি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পার্থিব অবমাননা ও লাঞ্ছনা। তাদের এই শাস্তি হুজুর ﷺ-এর জীবিতকালেই মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে বনী কুরাইযা ধৃত ও নিহত হয়, আর বনী নাযীর অপরিসীম লাঞ্ছনার সাথে শাম দেশের দিকে বর্তমান সিরিয়ার দিকে বিতাড়িত হয়। আর দ্বিতীয় শাস্তি আখেরাতের আজাব। -[বয়ানুল কুরআন]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জিযিয়া কর প্রদান এবং অপমানিত হওয়া। এ মতটি দুর্বল। কেননা তাদের শরিয়তে জিযিয়া কর ছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়, তবে যদি তা মহানবী (সা.)-এর সময়কার ধরা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না।

কঠোর তিরস্কার এবং চরম অবমাননা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত হবে, যারা যে কোনো যুগে এবং যে কোনো অবস্থাতে আল্লাহর নির্দেশের কিছু মানবে আর কিছু প্রত্যাখ্যান করবে। এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। -[কাবীর]

قَفَّيْنَا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** قَفَّيْنَا সীগাহটি تَقْفِيَةٌ হতে নির্গত। এর অর্থ- পর্যায়ক্রমে আসা। একটি অপরটি অনুকরণ করা। تَقْفِيَةٌ মূলতঃ اَلْقَفَا হতে নির্গত। যার অর্থ ঘাড়ের পেছনের অংশ। যখন কারো পেছন থেকে আসা হয় তখন বলা হয়, اِسْتَقْفَيْتُهٗ এ ছাড়া যখন কাব্যে একটির সাথে অপরটির ছন্দ মিল ও অর্থ মিল পরিলক্ষিত হয় তখন বলা হয়, قَافِيَةُ الشِّعْرِ -এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর পর অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা তার অনুসরণ অনুগমন করেছেন, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের নবী। -[ফাতহুল কাদীর]

بَيِّنَاتٌ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** بَيِّنَاتٌ দ্বারা এখানে مُعْجِزَةٌ উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَيِّنَاتٌ হলো মৃতকে জীবিত করা, শ্বেত (ধবল) রোগ মুক্ত করা, অদৃশ্যের সংবাদ দান, হযরত জিবরাঈলকে দিয়ে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

কাফেরদের অহংকারের ধরন : নবী ও রাসূলগণের সাথে অহংকারের অর্থ হলো-তাদের ডাকে সাড়া না দেওয়া এবং তাদের রিসালাত প্রাপ্তিকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া। সমাজের এতিম, অসহায় ব্যক্তি হতে পারে না, আল্লাহ তার রিসালাত প্রদানের জন্য ভালো লোক কি খুজে পাননি? এ সকল উক্তিই তাদেরকে অহংকারী বানিয়ে দিয়েছে।

ইহুদিদের ঈমানের অর্থ : কয়েকটি বিষয়ে অন্যদের বিশ্বাসের সাথে ইহুদিদের বিশ্বাসের মিল রয়েছে। যেমন–আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা, কিয়ামতকে বিশ্বাস করা। এসব তারাও স্বীকার করে, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও কুরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। এ আংশিক ঈমানকে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান বলা হয়েছে। যার অর্থ– সাধারণ বিশ্বাস। শরিয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরিয়তে ঐ ঈমানই স্বীকৃত, যা شَارِعْ তথা শরিয়ত প্রবর্তক বর্ণিত সকল বিষয়কে বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অস্বীকৃত ও নিহত নবী : বনী ইসরাঈল একদল নবীকে অস্বীকার করেছে আর একদলকে হত্যা করেছে। অস্বীকৃত নবীগণের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং নিহত নবীদের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আ.) উল্লেখযোগ্য।

قوله قُلُوبُنَا غُلْفٌ -এর মর্মার্থ : এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন– (১) غُلُفٌ শব্দটি اَغْلَفُ -এর বহুবচন اَغْلَفُ তাকে বলা হয় যা غِلَافٌ বা আবরণীর ভেতরে থাকে। অর্থাৎ আমাদের অন্তর পর্দা দিয়ে ঘেরা, সেখানে তোমার দাওয়াত পৌঁছবে না। (২) কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন যে, আমাদের অন্তর বিদ্যা (عِلْم) দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ, অতএব মুহাম্মদের শরিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। (৩) অথবা, আমাদের অন্তর খালি গিলাফের মতো। ভেতরে কিছুই নেই। অন্তর পরিষ্কার, কারো জন্য কোনো শত্রুতা নেই।

قوله فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : তাফসীরকারগণ এর তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) قَلِيْل শব্দটি مُؤْمِنْ -এর সিফাত। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে অত্যন্ত কম সংখ্যক লোকই মু'মিন হবে, বিশ্বাস করবে। (২) قَلِيْل শব্দটি مُؤْمِنْ এর সিফাত অর্থাৎ তারা কিছু বিষয়ে ঈমান আনে। কেননা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু রাসূল ﷺ -কে বিশ্বাস করে না। (৩) তারা মূলেই ঈমান আনে না। না কম - না বেশি।

لَعْنَتٌ শব্দের অর্থ : لَعَنٌ শব্দের মূল অর্থ– তাড়ানো বা দূরে নিক্ষেপ করা। আল্লাহর লা'নত অর্থ তার রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া। করুণা হতে বঞ্চিত হলে গজবের উপযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

قوله بِرُوْحِ الْقُدُسِ -এর মর্ম : আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-কে رُوْحُ الْقُدُسِ দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখানে "রূহুল কুদুস" দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় উদ্দেশ্য। যথা–(ক) তাঁর পবিত্র আত্মা যা স্বয়ং আল্লাহর কালিমা। (খ) ওহীর জ্ঞান। (গ) ইসমে আযম যদ্দারা তিনি মৃতকে জীবিত করতেন এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করতেন। (ঘ) কিংবা ইঞ্জিল কিতাব। (ঙ) হযরত জিবরাঈল।

সর্বশেষ মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ অপরাপর যাবতীয় বিষয় اَلْبَيِّنَاتُ -এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَقْرَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা স্বীকার করেছ।

تَشْهَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ه ـ د) অর্থ– তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।

تَقْتُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা হত্যা কর, করবে।

وَتُخْرِجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ ـ ر ج) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বের কর, বের করে দাও, বের করে দিবে।

وَالْعُدْوَانِ : জুলুম, অবিচার। عَدَا يَعْدُوْا عَدْوًا বাব نَصَرَ হতে অর্থ– অন্যায় করা। অবিচার করা।

اُسٰرٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন اسير অর্থ– কয়েদীগণ।

تُفٰدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُفَادَاةُ মূলবর্ণ (ف ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা মালের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করেছ।

مُحَرَّمٌ : সীগাহ جمع مذكر اسم مفعول বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّحْرِيْمُ মাসদার (ح . ر . م) মূলবর্ণ صحيح জিনস
অর্থ– আল্লাহর পক্ষ হতে যা হারাম করা হয়েছে।

تُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ঈমান আনবে।

تَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) অর্থ– তোমরা কুফরি কর, তোমরা কুফরি করবে।

خِزْيٌ : এটি মাসদার, অর্থ– অবমাননা, জিল্লতি, লাঞ্ছনা।

اَلْحَيٰوةِ : এটি মাসদার, অর্থ– জীবন, বেঁচে থাকা।

اَلدُّنْيَا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّانِيَةُ মূলবর্ণ (د . ن . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দুনিয়া, পৃথিবী, জগত, বহু নিকট, খুব নিকৃষ্ট।

كَذَّبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূবর্ণ (ك . ذ . ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অস্বীকার করেছ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ : এখানে اَنْتُمْ হচ্ছে মুবদাতা আর এটার خبر এর মধ্যে তিনটি নিয়ম আছে।

১. تَقْتُلُوْنَ পদ خبر এই অবস্থায় هٰؤُلَاءِ-এর মধ্যে দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হলো اَعْنِىْ পদ هٰؤُلَاءِ উহ্য ফে'ল-এর مفعول হিসেবে منصوب হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো هٰؤُلَاءِ পদটি ياء হরফে নেদা-এর মোনাদা। আর হরফে নেদা হওয়ার প্রক্রিয়াটি سيبويه নাবহীর মতে জায়েজ নেই। কেননা, هٰؤُلَاءِ পদটি مُبْهَمْ এর সাথে উহ্য থাকতে পারে না।

২. অথবা هٰؤُلَاءِ পদটি اَلَّذِيْنَ-এর অর্থে হয়ে خبر হবে। আর هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ অর্থ اَلَّذِيْنَ এর صلة তারকীবের এই প্রক্রিয়াটিও দুর্বল। কেননা بصريين এর মাযহাব হচ্ছে هٰؤُلَاءِ পদটি اَلَّذِيْنَ এর স্থলে হতে পারে না। আর كوفيين এটা জায়েজ রাখে।

৩. এখানে هٰؤُلَاءِ পদটি مِثْل পদ উহ্য মুضاف এর مضاف اليه এখন مضاف এবং مضاف اليه মিলিত হয়ে انتم - এর خبر হবে। আর এই অবস্থায় تَقْتُلُوْنَ পদটি حال যার উপর আমল করবে معنى تشبيه ;

قوله وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ : واو টি হরফে আতফ يَوْمَ الْقِيَامَةِ মাফউলে ফীহি মুকাদ্দাম يُرَدُّوْنَ ফে'ল তার যমীর নায়েব ফা'য়েল, اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ তার মুতায়াল্লিক। ফে'ল, নায়েব ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جملة فعلية গঠিত হলো।

قوله وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ : اتينا ফে'ল ও ফা'য়েল مُوْسٰى প্রথম মাফউল, اَلْكِتَابَ দ্বিতীয় মাফউল। ফে'ল ফা'য়েল ও উভয় মাফউল মিলে جملة فعلية গঠিত হয়েছে।

قوله وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ : قَفَّيْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল مِنْ بَعْدِهٖ তার মুতাআল্লিক بِالرُّسُلِ মাফউল, ফে'ল, ফা'য়েল, মুতাআল্লেক ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : قَالُوْا ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة হয়ে قول হলো قُلُوْبُنَا মুবতাদা غُلْفٌ খবর, বাক্য হয়ে মাকূলা।

قوله لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : لعن ফে'ল هُمْ মাফউল اَللّٰهُ ফা'য়েল। ফে'ল ফা'য়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে جملة فعلية হয়েছে।

قوله فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ : এর قَلِيْلًا পদটি উহ্য اِيْمَانَ এর সিফাত হেতু منصوب হয়েছে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۫ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٨٩)

(৮৯) আর যখন তাদের নিকট এমন কিতাব আসল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা তাদের সঙ্গীয় কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী; অথচ ইতঃপূর্বে তারা তার বর্ণনা করত কাফেরদের নিকট, অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল সেই পরিচিত কিতাব, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল, সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٩٠)

(৯০) নিতান্ত জঘন্য সেই অবস্থাটি যা অবলম্বন করে তারা নিজেদের মুক্ত করতে চায় অর্থাৎ অমান্য করে এমন জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, শুধু [এই] হঠকারিতায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর বাঞ্ছিত বান্দার উপর [কিছু] নাজিল করেন, সুতরাং তারা গজবের উপর গজবের যোগ্য হয়েছে; আর কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۤ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩١)

(৯১) আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন ঐ সব কিতাবের উপর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, তখন বলে, আমরা ঈমান আনব [শুধু] আমাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর, তদ্ব্যতীত আর সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে, অথচ সেগুলোও [বাস্তবিকপক্ষে] সত্য, অধিকন্তু তাদের সঙ্গীয় কিতাবের সত্যতাও প্রমাণকারী; আপনি বলুন, তবে কেন হত্যা করছিলে আল্লাহর নবীগণকে ইতঃপূর্বে যদি তোমরা মুমিন ছিলে?

শাব্দিক অনুবাদ

৮৯. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট আসল كِتٰبٌ কিতাব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে مُصَدِّقٌ যা সত্যতা প্রমাণকারী لِّمَا مَعَهُمْ তাদের সঙ্গীয় কিতাবের وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ অথচ ইতঃপূর্বে তারা يَسْتَفْتِحُوْنَ তার বর্ণনা করত عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের নিকট فَلَمَّا جَآءَهُمْ অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল مَّا عَرَفُوْا সেই পরিচিত কিতাব كَفَرُوْا بِهٖ তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল فَلَعْنَةُ اللّٰهِ সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক عَلَى الْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের উপর।

৯০. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ নিতান্ত জঘন্য সেই অবস্থাটি যা অবলম্বন করে মুক্ত করতে চায় তারা اَنْفُسَهُمْ নিজেদের اَنْ يَّكْفُرُوْا অমান্য করে এমন জিনিস بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন بَغْيًا শুধু [এই] হঠকারিতায় যে اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন مِنْ فَضْلِهٖ নিজ দয়ায় عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ তাঁর বাঞ্ছিত বান্দার উপর فَبَآءُوْ সুতরাং তারা যোগ্য হয়েছে بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ গজবের উপর গজবের وَلِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য আছে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

৯১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদের বলা হয় اٰمِنُوْا তোমরা ঈমান আন بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ঐ সব কিতাবের উপর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন قَالُوْا তখন বলে, نُؤْمِنُ আমরা ঈমান আনব بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا [শুধু] আমাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর وَيَكْفُرُوْنَ তারা অস্বীকার করে بِمَا وَرَآءَهٗ তদ্ব্যতীত আর সবগুলোকে وَهُوَ الْحَقُّ অথচ সেগুলোও সত্য مُصَدِّقًا অধিকন্তু সত্যতাও প্রমাণকারী لِّمَا مَعَهُمْ তাদের সঙ্গীয় কিতাবের قُلْ আপনি বলুন فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ তবে কেন হত্যা করছিলে اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ আল্লাহর নবীগণকে مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন ছিলে?

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٩٢)	(৯২) আর মূসা আনলেন তোমাদের নিকট জ্বলন্ত প্রমাণসমূহ, তবুও তোমরা তাঁর পর বাছুরকে সাব্যস্ত করলে, আর তোমরা ছিলে অনাচারী।
وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩٣)	(৯৩) আর যখন তোমাদের ওয়াদা নিলাম এবং তুলে ধরলাম তোমাদের উপর তূর পর্বত; গ্রহণ কর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিতেছি সাহসের সাথে এবং শোন, তারা বলল, শুনলাম; কিন্তু আমল করতে পারব না, আর মিশে গিয়েছিল, তাদের হৃদয়ে সেই বাছুর তাদের কুফরির কারণে; আপনি বলুন, অত্যন্ত নিন্দনীয় যা কিছু আদেশ করতেছে তোমাদের ঈমান, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯২) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ আর আনলেন তোমাদের নিকট مُّوْسٰى মূসা بِالْبَيِّنٰتِ জ্বলন্ত প্রমাণসমূহ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ তবুও তোমরা সাব্যস্ত করলে الْعِجْلَ বাছুরকে مِنْ بَعْدِهٖ তাঁর পর وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ আর তোমরা ছিলে অনাচারী।

(৯৩) وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন নিলাম مِيْثَاقَكُمْ তোমাদের ওয়াদা وَرَفَعْنَا এবং তুলে ধরলাম فَوْقَكُمُ তোমাদের উপর الطُّوْرَ তূর পর্বত; خُذُوْا গ্রহণ কর مَآ اٰتَيْنٰكُمْ যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিতেছি بِقُوَّةٍ সাহসের সাথে; وَّاسْمَعُوْا এবং শোন; قَالُوْا তারা বলল سَمِعْنَا শুনলাম وَعَصَيْنَا কিন্তু আমল করতে পারব না; وَاُشْرِبُوْا আর মিশে গিয়েছিল فِيْ قُلُوْبِهِمُ তাদের হৃদয়ে الْعِجْلَ সেই বাছুর بِكُفْرِهِمْ তাদের কুফরির কারণে; قُلْ আপনি বলুন بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ অত্যন্ত নিন্দনীয় যা কিছু আদেশ করছে اِيْمَانُكُمْ তোমাদের ঈমান اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৯ – قوله وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনার আনসারদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে, ঘটনার বিবরণ হচ্ছে যে, ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর আসেম বিন ওমর বিন কাতাদাহ আনসারীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের বড়রা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষা কোনো আরবিই বেশি জানত না। এর কারণ ছিল, আমাদের সাথে একত্রে অধিবাসী ছিল ইহুদিদের, ওরা ছিল আহলে কিতাব। আর আমরা ছিলাম মূর্তিপূজারী। আমাদের দ্বারা তারা যখনই কোনো আঘাত পেত, তখন তারা বলত যে, নবী তো এ যুগেই আগমন করবেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে আ'দ ছামূদের ন্যায় ধ্বংস করে দিব। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন প্রেরিত হলেন, তখন আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম, আর তারা তাঁকে অমান্য করল। সুতরাং রাসূল ﷺ আমাদের পক্ষেই আছেন। এ সকল আনসারীদের সাফল্য এবং ইহুদিদের দাম্ভিকতা পূর্ণ পিঠ টান দেওয়ার স্বরূপ বর্ণনা এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা দান সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১১৩/১, দুররে মানছুর : ৮৭/১, ইবনে কাছীর : ১২৪/১]

জ্ঞাতব্য : কুরআনকে তাওরাতের 'মুসাদ্দিক' [সত্যায়নকারী] বলা হয়েছে। এ কারণ এই যে, তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কুরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তাওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে প্রকারান্তে তাওরাতকেই অস্বীকার করা হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত, কাফের বলা হলো কেন?
এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশি। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।
এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোদের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে অপমানজনক শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা হবে, তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়।
'আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না, ইহুদিদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা [তাওরাতে] আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।' এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।
প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলিলের মধ্যে কোনো আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোনো অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন মাজীদ, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোনো দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
পরবর্তী আয়াতে আরো কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদিদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।
ঘটনাটি ঘটে তাওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بَيِّنَاتٌ বলে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, লাঠি, জ্যোর্তিময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।
ইহুদিদের দাবির খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবি কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু হযরত মূসা (আ.)-কেই নয়, আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আমলে যেসব ইহুদি ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।
আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর তারা একটি কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে। পরে হযরত মূসা (আ.)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো টীকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে হত্যা বরণ করতে হয় এবং কিছু লোক ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবতঃ দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

قوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ -এর মর্ম : এখানে قِيْلَ لَهُمْ -এর মধ্যে لَهُمْ দ্বারা আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কার ইহুদিদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনার কথা বললে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

قوله لِمَ تَقْتُلُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলের লোকেরা অনেক নবীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়ে যে সকল ইহুদিরা ছিল, তারা মূলতঃ হত্যাকারী নয় হত্যাকারী ছিল তাদের পূর্বপুরুষেরা। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, لِمَ تَقْتُلُوْنَ বলে হত্যাকারী নয় এমন ইহুদিদের উদ্দেশ্য করার কারণ কি? এর উত্তরে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন যে, এ সময়কার ইহুদিরা তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের পূর্ব পুরুষরা নবীগণকে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা তারা অপরাধ মনে করেনি। ফলে তারাও তাদের পূর্ব পুরুষদের মতোই হিংস্র ও পাপী। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে لِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاۤءَ اللّٰهِ আলোচ্য আয়াতে اٰمِنُوْا দ্বারাও তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قوله بِالْبَيِّنٰتِ -এর মর্ম : অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে اَلْبَيِّنَاتُ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ উদ্দেশ্য। যেমন, কপট জাতির উপর আপতিত পঙ্গপাল, তাঁর হাতের লাঠি, বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রের জলরাশির মাঝে পথ তৈরি, মান্না সালওয়া অবতারণ, ব্যাঙ, রক্ত ও উকুনের ভয়ানক উপদ্রব সৃষ্টি করা, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলা, হাতের শুভ্রতা, বনী ইসরাঈলের উপর তূর পাহাড় উত্তোলন এবং পাহাড় থেকে পানির ঝরনা বের হওয়া ইত্যাদি। কারো কারো মতে, তাওরাতও اَلْبَيِّنٰتُ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قوله بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ -এর মর্ম : এখানে بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

ক. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, اَلْقُرْاٰنُ উদ্দেশ্য।

খ. কতিপয়ের মতে, مَا শব্দটি عُمُوْم-এর অর্থে আসে, কাজেই এখানে بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা সকল আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য। কারণ, ঈমান সকল কিতাবের উপর আনাই আবশ্যক।

قوله وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ-এর মধ্যে هُوَ যমীর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(১) اَلْقُرْاٰنُ যেহেতু পবিত্র কুরআনই তাদের কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী।

(২) نَبِيُّ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ ﷺ [আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ] কেননা, তিনি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী। –[কাবীর]

قوله سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে যখন বললেন, خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا তখন উত্তরে তারা বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا অর্থাৎ শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেন, ইহুদিরা سَمِعْنَا বলেছিল; তারা عَصَيْنَا বলেনি। তবে কুরআনের বাহ্যিক ভাষ্য দেখে মনে হয় তারা سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا উভয়টিই বলেছিল। প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহর কথার প্রেক্ষিতে তারা سَمِعْنَا বললেও কার্যতঃ তা ছিল عَصَيْنَا বলারই নামান্তর। কারণ তারা মুখে سَمِعْنَا বললেও বাস্তবে তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে যাচ্ছিল। কাজেই তারা মুখে মুখে যতই বলুকনা কেন سَمِعْنَا উক্তিতে মূলতঃ তাদের অবস্থা ছিল عَصَيْنَا বলার বাস্তব নমুনা। তাই তাদের বাস্তবানুগ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা سَمِعْنَا উক্তির সাথে عَصَيْنَا শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। –[আত্‌তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন]

قوله وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ -এর মর্ম : اَلْعِجْلُ শব্দের অর্থ– গরুর বাচ্চা। গরুর বাচ্চা কঠিন বস্তু বিধায় তা পান করানো যায় না। অথচ আয়াতের সরল অনুবাদ দাঁড়ায়–"তাদের অন্তরে গো-বৎস পান করানো হয়েছিল, যা বাস্তবানুগ নয়। তবে এর রূপক অর্থ হবে, তাদের অন্তরে গো-বৎস মোহ এমনভাবে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যেমন মদ্যপায়ীর মনে মদের মোহ সৃষ্টি করা হয়, তারাও গো-বৎস পূজার প্রতি মদ্যপায়ীর মদের প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার মতো দারুণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

ঈমাম সুদ্দী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত মূসা (আ.) গো-বৎস মূর্তিটি ঘৃণাভরে পানিতে ফেলে দেন এবং পূজারীদের তিরস্কার স্বরূপ বলেন, এর ধোয়া পানি পান কর। অতঃপর তারা সেই পানি পান করে। এদিকেই আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনেকের মতে এ বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি নেই। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী

মৃত্যু কামনার নির্দেশের কারণ : ইহুদিরা দাবি করত যে, পরকালের সুখ ভোগে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। এরই সত্যতা প্রমাণের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু কামনা করতে বলেন। কেননা তাদের কৃত দাবি পরকালের ব্যাপারে আন্তরিকই যদি হয়, তবে মৃত্যু কামনার ব্যাপারে তারা ইতস্ততঃ করবে না। কারণ মৃত্যু ব্যতীত তাদের পরকালে প্রবেশের কোনো পথ নেই। পরকালে গিয়ে আল্লাহর নৈকট্য বা মুক্তির আশায় ইহুদিদেরই সর্বাগ্রে মৃত্যু কামনা করা উচিত ছিল; কিন্তু তারা তা না করায় একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের দাবি আন্তরিক নয়।

মৃত্যু কামনা করার বিধান : মৃত্যু কামনা করা শরিয়তে বৈধ নয়। হাদীস শরীফে মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আয়াতে মৃত্যু কামনার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব বলা হবে মূলতঃ এখানে মৃত্যু কামনার নির্দেশ নয়; বরং এখানে দলিল পেশ করাই উদ্দেশ্য এবং তারা যে তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী একথা প্রমাণই উদ্দেশ্য।

যে সকল হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেস্থলে কোনো বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হওয়াই বুঝায়।

قوله قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ- এর মর্মার্থ : অর্থাৎ প্রকৃত তথ্যে বলা যায় যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমানদার নও। যদিও তোমরা বলে থাক আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। অথচ এ কথার পেছনে কুফরি লুক্কায়িত আছে। তাই তারা বলেছিল শুনলাম, মানলাম না।

যদি তোমরা সত্যিকাররূপে তাওরাতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হতে তাহলে তোমরা তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী কৃত শেষনবী ও তার আনীত আল-কুরআনকে অমান্য করতে পারতে না, বরং তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে বর্বরোচিত আচরণ এবং অবাধ্যতার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে। তাই মনে হয় তোমরা তাওরাতকেও প্রকৃতভাবে মান্য করছ না। দাবি যা করছ তা হলো শঠতাপূর্ণ দাবি। ঈমানের দাবি যা করছ তা মৌখিক মাত্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُصَدِّقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যবাদী, সমর্থনকারী।

كَانُوْايَسْتَفْتِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاحُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা মীমাংসা কামনা করছিল।

اِشْتَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা ক্রয় করল, তারা বিক্রয় করল।

يَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করেছে।

بَغْيًا : বাব ضرب-এর মাসদার, অর্থ হঠকারিতা বশতঃ, জিদের কারণে,

يُنَزِّلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি অবতীর্ণ করেন, নাজিল করেন।

بَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা অর্জন করেছে।

اُشْرِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের পান করানো হয়েছিল।

يَأْمُرُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার الاَمْرُ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে আদেশ করে। সে আদেশ দান করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ : لَمَّا হরফে শর্ত, جَاءَ ফে'ল هُمْ মাফউল كِتَابٌ মাওসূফ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ প্রথম সিফাত مُصَدِّقٌ দ্বিতীয় সিফাত। এটা সম্পূর্ণ মিলে ফা'য়েল হয়ে শর্ত আর জাযাটি উহ্য অর্থাৎ قَوْلُه كَفَرُوْا বাক্যটি بَغْيًا পদটি مفعول به হেতু منصوب হয়েছে।

قوله وَهُوَ الْحَقُّ : বাক্যটি হলা قوله مُصَدِّقًا দ্বিতীয় হালে মুয়াক্কাদা, وقوله وَرَفَعْنَا الخ বাক্যটিও হাল।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٩٤)

অনুবাদ : (৯৪) আপনি বলে দিন, যদি শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে পরজগতের উপভোগ আল্লাহর নিকট অন্য কারো অংশ গ্রহণ ব্যতীত, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করে দেখিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٩٥)

(৯৫) আর নিশ্চয় তারা কখনো তা কামনা করবে না তাদের স্বহস্তকৃত আমলসমূহের দরুন, আর আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন এ সমস্ত জালেম সম্বন্ধে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)

(৯৬) আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে পাবেন [পার্থিব] জীবনের প্রতি অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক লালায়িত এবং মুশরিকদের চেয়েও, তাদের এক একজন এই লালসায় রয়েছে যে, তার আয়ু যেন সহস্র বৎসরের হয়ে যায়, আর এটা তাকে তো আমার আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হলেও, আর আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে তাদের আমলসমূহ।

ع ١١ ربع

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٧)

(৯৭) আপনি বলুন, যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে জিবরাঈল-এর সাথে [সে রাখুক], তিনি পৌঁছিয়েছেন এই কুরআনকে আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে, যে অবস্থায় তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে। আর হেদায়েত করছে ও সুসংবাদ দিচ্ছে মুমিনদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ

৯৪. قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ كَانَتْ لَكُمُ যদি শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে الدَّارُ الْاٰخِرَةُ পরজগতের উপভোগ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ অন্য কারো অংশ গ্রহণ ব্যতীত فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করে দেখিয়ে দাও اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৯৫. وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا আর নিশ্চয় তারা কখনো তা কামনা করবে না بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের স্বহস্তকৃত আমলসমূহের দরুন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন بِالظّٰلِمِيْنَ এ সমস্ত জালেম সম্বন্ধে।

৯৬. وَلَتَجِدَنَّهُمْ আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে পাবেন اَحْرَصَ النَّاسِ অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক লালায়িত عَلٰى حَيٰوةٍ [পার্থিব] জীবনের প্রতি وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং মুশরিকদের চেয়েও يَوَدُّ اَحَدُهُمْ তাদের এক একজন এই লালসায় রয়েছে যে لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ তার আয়ু যেন সহস্র বৎসরের হয়ে যায় وَمَا هُوَ আর এটা بِمُزَحْزِحِهٖ তাকে তো রক্ষা করতে পারবে না مِنَ الْعَذَابِ আমার আজাব হতে اَنْ يُّعَمَّرَ দীর্ঘায়ু হলেও وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ আর আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে بِمَا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলসমূহ।

৯৭. قُلْ আপনি বলুন। مَنْ كَانَ عَدُوًّا যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে لِّجِبْرِيْلَ জিবরাঈল-এর সাথে فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ তিনি পৌঁছিয়েছেন এই কুরআনকে عَلٰى قَلْبِكَ আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে مُصَدِّقًا যে অবস্থায় তা সত্যতা প্রমাণ করছে لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের وَهُدًى আর হেদায়েত করছে وَّبُشْرٰى ও সুসংবাদ দিচ্ছে لِلْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদেরকে।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ (٩٨)

অনুবাদ : (৯৮) যে ব্যক্তি শত্রু হয় আল্লাহর এবং তাঁর ফেরেশতাগণের, তার রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের, আল্লাহ এরূপ কাফেরদের শত্রু ।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (٩٩)

(৯৯) আর আমি তো আপনার প্রতি বহু স্পষ্ট প্রমাণ নাজিল করেছি এবং এটা কেউই অবিশ্বাস করে না হুকুম অমান্যে অভ্যস্তগণ ব্যতীত ।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠٠)

(১০০) তবে কি, আর যখনই তারা যে কোনো অঙ্গীকার করে থাকে, তাকে তাদের মধ্যে কোনো না কোনো দল প্রত্যাখ্যান করে থাকে? পরন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তো ঈমান রাখে না ।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٠١)

(১০১) আর যখন তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সত্যতাও প্রমাণ করতেছেন ঐ কিতাবের যা তাদের নিকট আছে, তখন ফেলে দিল আহলে কিতাবদের একদল আল্লাহর এ কিতাবকেই তাদের পিছনের দিকে, যেন তারা কিছুই জানে না ।

শাব্দিক অনুবাদ

৯৮. مَنْ كَانَ عَدُوًّا যে ব্যক্তি শত্রু হয় لِلّٰهِ আল্লাহর وَمَلٰٓئِكَتِهٖ এবং তাঁর ফেরেশতাগণের وَرُسُلِهٖ তার রাসূলগণের وَجِبْرِيْلَ জিবরাঈলের وَمِيْكٰلَ এবং মিকাঈলের فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ আল্লাহ শত্রু لِلْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের ।

৯৯. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ আর আমি তো নাজিল করেছি اِلَيْكَ আপনার প্রতি اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ বহু স্পষ্ট প্রমাণ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ এবং এটা কেউই অবিশ্বাস করে না اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ হুকুম অমান্যে অভ্যস্তগণ ব্যতীত ।

১০০. اَوَكُلَّمَا তবে কি, আর যখনই عٰهَدُوْا عَهْدًا তারা যে কোনো অঙ্গীকার করে থাকে نَّبَذَهٗ তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে কোনো না কোনো দল بَلْ اَكْثَرُهُمْ পরন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তো لَا يُؤْمِنُوْنَ ঈমান রাখে না ।

১০১. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট আসলেন رَسُوْلٌ একজন রাসূল مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ থেকে مُصَدِّقٌ যিনি সত্যতাও প্রমাণ করছেন لِّمَا مَعَهُمْ ঐ কিতাবের যা তাদের নিকট আছে نَبَذَ তখন ফেলে দিল فَرِيْقٌ একদল مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের كِتٰبَ اللّٰهِ আল্লাহর এ কিতাবকেই وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ তাদের পিছনের দিকে كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ যেন তারা কিছুই জানে না ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৪- قوله قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ইহুদিরা যখন দাবি করতে থাকে যে, তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রিয় পাত্র হিসেবে বেহেশত লাভের একক হকদার ও উত্তরাধিকারী । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন– আচ্ছা তোমরা যদি তোমাদের দাবি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ এবং সত্যবাদী হও তবে আস, আমরা উভয়ে একত্রে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, যেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাদের ধ্বংস করে দেন । কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি । কারণ তারা ভালো করেই জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য, সত্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল । বস্তুতঃ তারা যদি মহানবী ﷺ-এর উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দোয়ার জন্য জমায়েত হতো তবে আল্লাহ তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতেন এবং দুনিয়ার বুকে একজন ইহুদিও বেঁচে থাকত না; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো নাজিল করেন । অথবা বেহেশতে ইহুদিরা ভিন্ন অন্য কেউ যেতে পারবে না । তাদের এ দাবি খণ্ডনে অত্র আয়াতগুলো নাজিল হয় ।

৯৫- قوله وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হবার পর রাসুল ﷺ ইহুদিদের লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমাদের [ইহুদি ও নাসারাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত] দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদি হয়ে থাক, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিকট এভাবে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি আমাদের মৃত্যু দান কর। তোমাদের থেকে কেউই এ প্রার্থনা করবেনা; বরং একজন তাকে থুথু দেয় ফলে সেখানেই সে মৃত্যু বরণ করে ফলে তারা এমনভাবে প্রার্থনা করতে অপছন্দ ও অস্বীকার করল। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[দুররুল মানছুর ৯৮/১]

৯৮- قوله مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আয়াত দু'টি নাজিলের কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ পাওয়া যায়। ১. বর্ণিত আছে যে, একদা ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সূরিয়া রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার নিকট কে ওহী নিয়ে আসে? রাসূল ﷺ বললেন, জিবরাঈল ওহী নিয়ে আসেন। তখন সে বলল, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। বহুবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। সব চেয়ে বেদনাদায়ক শত্রুতা ছিল এই যে, একদা আমাদের সমকালীন নবীর কাছে ওহী আসল যে, মেসোপটেমিয়ার অধিপতি নেবুজরদ এক সময় বায়তুল মাকদাস নগরী ধ্বংস করে দিবে। তখন আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাকে হত্যা করার জন্য এক গুপ্ত ঘাতক পাঠায়; কিন্তু জিবরাঈল তাকে ধরে দিয়ে নেবুজরদকে বাঁচিয়ে দেয়। অতঃপর নেবুজরদ পবিত্র নগরী ধ্বংস করে ৭০ হাজার ইহুদিকে হত্যা করে এবং ৭০ হাজারকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত দু'টি নাজিল হয়।

২. অন্য বর্ণনায় আছে, একদা হযরত ওমর (রা.) ইহুদিদের মাদ্‌রাসায় গমন করে তাদের শিক্ষকদের কাছে হযরত জিবরাঈল সম্পর্কে জানতে চান। তারা বলল, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। সে মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের সব গোপন কথা বলে দেয় এবং আমাদের সব আজাব সেই আনতো; বরং মীকাঈল আমাদের বন্ধু। হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা কেমন? তখন তারা বলল, জিবরাঈল আল্লাহর ডানে বসে এবং মীকাঈল বামে বসে। তবে তারা পরস্পর ঘোর শত্রু। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি তাদের অবস্থান এমনি হয়, তবে তারা শত্রু হতে পারে না। হযরত ওমর (রা.) তাদের কাছ থেকে ফিরে আসার আগেই হযরত জিবরাঈল এ আয়াত দু'টি নিয়ে হাজির হন।

৩. একদা ইবনে সূরিয়ার নেতৃত্বে একদল ইহুদি রাসূল ﷺ-এর নিকট তিনটি প্রশ্নের উত্তর চাইল এবং বলল, আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা ঈমান আনব। তাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর নিজের জন্য কি কি জিনিস হারাম করে ছিলেন?

উত্তরে নবীজী বললেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) "ইরকুন্নিসা" নামক এক প্রকার মারাত্মক রোগে ভোগছিলেন। এই রোগ থেকে মুক্তির জন্য তিনি মানত করেছিলেন, 'আল্লাহ যদি আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমি আমার প্রিয় খাদ্য 'উটের গোশত, চর্বি, দুধ খাব না।' এ মানতের পর তিনি রোগমুক্তি লাভ করেন এবং বাকি জীবন আর উটের গোশত, চর্বি ও দুধ খাননি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, স্ত্রী ও পুরুষের বীর্যের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কখন পুত্র সন্তান হয়, আর কখন কন্যা সন্তান হয়?

মহানবী ﷺ বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়, আর স্ত্রীদের বীর্য খানিকটা লালচে ও হালকা হয়ে থাকে। যৌন মিলনের পর ডিম্বকোষে স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য পেলে কন্যা এবং পুরুষের বীর্য প্রাধান্য পেলে ছেলে সন্তান হয়ে থাকে।

তাদের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, তাওরাতে যে উম্মী নবীর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর বিশেষত্ব কি এবং তাঁর নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে?

নবী কীরম ﷺ বললেন, তিনি যখন নিদ্রা যান তখন তার অন্তর জাগ্রত থাকে, আর জিব্‌রাঈল ফেরেশতা তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আসেন, যে ফেরেশতা সকল নবীদের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

একথা শুনার পর তারা বলল, আপনার সব উত্তরই সঠিক; তবে যেহেতু জিব্‌রাঈল আমাদের শত্রু; সে শাস্তি, নির্মমতা, হত্যা ইত্যাদি নিয়ে আসে তাই আমরা তাকে মানি না। একই কারণে আমরা আপনাকেও মানব না। হাঁ, হযরত মীকাঈল আমাদের বন্ধু। তিনি রহমতের বৃষ্টি, রিজিক ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তিনি যদি আপনার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতাম। এই বলে তারা চলে গেলে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন।

৯৯- قوله وَلَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একদা ইবনে সূরিয়া নামের এক ইহুদি পণ্ডিত হুযূর (সা.)-এর দরবারে এসে বলতে থাকে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতের মাধ্যমে নবীর যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের জানা রয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি নিদর্শনও তোমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আল্লাহ তা'আলাও তোমার নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করেননি। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

১০০- قوله وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তাওরাত ও ইনজীলে নবী করীম ﷺ -এর আগমনের পর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নবীজীর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইহুদি সর্দার মালেক ইবনে সায়েফকে তাওরাতের সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে দেন। তখন সে শপথ করে অস্বীকার করে, আর বলে, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের নিকট হতে কোনো ওয়াদা নেওয়া হয়নি। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্যধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরো দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

প্রথমতঃ নবী করীম ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান ইহুদিদের সঙ্গে উপরিউক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। যারা তাঁকে নবী হিসেবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদিদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয়তঃ এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদিরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামন করেছে, উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহর উক্তি وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ [কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না] এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হতো এবং নবী করীম ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে, কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশি ছিল। এরূপ কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। একারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদিরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণা মতে পারকালের যাবতীয় আরাম আয়েম ও নিয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি?

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নিয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূণ্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালোভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

قوله وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا الخ **এর ব্যাখ্যা :** যেহেতু ইহুদিরা ইহজীবনে বহুবিধ অন্যায় অবিচারে লিপ্ত আছে এবং তজ্জন্য তাদের পরিণতি কি হতে পারে তাও তারা অবহিত নয়। তাই তারা যদিও মুখে দাবি করে বেড়াচ্ছে যে, তারাই একমাত্র বেহেশতের একক উত্তরাধিকারী কিন্তু মনে মনে খোদায়ী শাস্তিকে ভয় করে এবং সে কারণে মৃত্যুকে অত্যাধিক ভয় করে। তা হতে বেঁচে থাকতে চায়। অথচ আল্লাহ তাদের এ সকল স্বজ্ঞান পাপাচারিতা সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হেতু একদিন তাদেরকে স্বীয় কৃত-কর্মের চরমদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের যাবতীয় পাপাচারিতার যথার্থ প্রতিফল দিবেন।

وَمَا هُوَ **-এর মধ্যকার** هُوَ **-এর প্রত্যাবর্তনস্থল :** وَمَا هُوَ -এর মধ্যকার هُوَ কোন্ দিকে ফিরেছে- এ ব্যাপারে তিনটি মত ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা–(১) পেছনে উল্লিখিত اَحَدُهُمْ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। (২) সামনে উল্লিখিত يُعَمَّرُ -এর মাসদারের প্রতি প্রত্যাবর্তিত। এমতাবস্থায় اَنْ يُّعَمَّرَ -এর মাসদার (تَعْمِيْر) হতে بَدَلْ হয়েছে। (৩) অথবা, هُوَ -কে যমীরে মুবহাম বলা যায়। اَنْ يُّعَمَّرَ সে মুবহামকে বর্ণনা করে দিয়েছে। –[কাবীর]

قوله وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ الخ **:** আয়াতে عَلٰى حَيٰوةٍ বলা হয়েছে এর অর্থ কোনো না কোনো ভাবে বেঁচে থাকা, তা যে কোনো ধরনের বেঁচে থাকা হোক না কেন, সম্মানের ও মর্যাদার বা লাঞ্ছনা অবমানার জীবনই হোক না কেন তার প্রতিই ইহুদিদের লোভ।

قوله نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ**-এর মর্মার্থ :** এর অর্থ "সে আপনার অন্তরে ওহী নাজিল করেছে" এ উক্তিটি থেকে বুঝা যায় যে, জিবরাঈল রাসূলকে ওহী শুধু পড়ে শুনাতেন না হৃদয়ের মাঝে ঢেলেও দিতেন। আর হৃদয় যা ধারণ করে তা শব্দ নয়; অর্থ। তাহলে কি একথা বলা হবে যে, ওহী শুধু অর্থের নাম, শব্দ ওহী নয়? এর জবাবে হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, অন্তর যেমন অর্থ বুঝে, তেমন শব্দও বুঝে। অন্তর মূলত উপলব্ধির কেন্দ্রস্থল, অন্যান্য অঙ্গ তার সাহায্যকারী মাত্র। যেমন– চোখে চশমার ভূমিকা, যদিও চশমার দেখার কোনো ক্ষমতা নেই। বিশেষ করে ওহী নাজিলের সময় বাহ্য-চেতনা শূন্যতা বশত পঞ্চেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়লে তখন ওহী সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করে। কারণ রাসূল ﷺ -এর অন্তর ঘুমে, জাগরণে সর্বাবস্থায় সচেতন ছিল। এ কারণেই বলা হয়েছে نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ –[বায়ানুল কুরআন]

جِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ -এর পরিচয় : আল্লাহ তা'আলা اَلْمَلٰئِكَةُ তথা সকল ফেরেশতা উল্লেখ করার পর আবার পৃথকভাবে জিব্রাঈল ও মীকাঈলের নাম উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ তারাও মালাইকা শব্দের মধ্যে শামিল। এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ–

- জিব্রাঈল ও মিকাঈল যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান ও অধিক মর্যদার অধিকারী, তাই তাঁদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাঁদের বিশেষ মর্যদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। উসূলে ফিকহের ভাষায় একে ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ বলা হয়।
- মূল আলোচনাটাই যেহেতু জিব্রাঈল ও মিকাঈলকে কেন্দ্র করে সেহেতু তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। নতুবা বিষয়টি কেমন যেন অস্পষ্ট থেকে যায়।

قوله مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الخ উক্তিটির মর্মার্থ : ইহুদিরা হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। কারণ ইহুদি গোষ্ঠীর উপর প্রাচীন কাল থেকে যত আজাব নাজিল হয়েছিল, সবই আল্লাহর আদেশ জিব্রাঈলের মাধ্যমে হয়েছিল। অথচ জিবরাঈল ছিলেন একজন আদিষ্ট ফেরেশতা, তাঁর অন্যথা করার উপায় ছিল না। কিন্তু এ আহমকরা তা বুঝতে চেষ্টা করত না, অনর্থক শত্রুতা পোষণ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, যারা জিব্রাঈলকে শত্রু ভাববে, তারা তাদের ক্ষোভ নিয়ে মরুক। এটা তাদের একটি হেঁয়ালী কাজ কারবার।

জিব্রাঈল মীকাঈল থেকে উত্তম : কয়েকটি দিক থেকে জিব্রাঈল (আ.)-এর ফজিলত দেখা যায়। যথা–

- আয়াতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- তিনি ওহী, কুরআন ও ইলম নিয়ে আসেন, যা অন্তরের খোরাক, আর মীকাঈল বৃষ্টি নিয়ে আসেন যা শরীরের খোরাক।
- কুরআনে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে– مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ; –[কাবীর]

جِبْرِيْل -এর উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম : جِبْرِيْل শব্দে দশটি নিয়ম দেখা যায়। যথা– (১) আহলে হিজায– جِيْم (بكسر الجيم) جِبْرِيْل -কে যের দিয়ে। (২) ইবনে কাছীর جَبْرِيْل (بفتح الجيم) جِيْمْ -কে যবর সহকারে। (৩) আহলে কূফা, جَبْرَئِيْل জীমে যবর এবং رَاءٌ -এর পর হামযাহ। (৪) আসেম (র.) جَبْرَئِل জীমে যবর কিন্তু হামযার পরে يَاءٌ নেই। (৫) ইয়াহিয়া ইবনে ইয়া'মূর ৪নং-এর মতো, তবে ل -এর মধ্যে তাশদীদ। যেমন– جَبْرَئِلَّ (৬) ইকরামা جَبْرَائِيْلُ অর্থাৎ راء -এর পরে الف ও همزة সহ। (৭) جَبْرَايِيْلُ হামযার পর يَاءٌ যুক্ত করে। (৮) جَبْرَئِيِيْل দুটি ياء যুক্ত করে। (৯) جَبْرَئِيْنُ জীমে যবর এবং শেষে নূন যোগে। (১০) جِبْرِيْنُ জীমে যের এবং হামযা বাদ দিয়ে।

مِيْكَالَ -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত : এখানে ছয়টি কেরাত দেখা যায়। যথা– (১) كَافْ -এর পরে هَمْزَهْ যোগ করে। যেমন– مِيْكَائِيْلُ পড়েন। (২) نَافِعْ দুই يَاءٌ দ্বারা مِيْكَايِيْلُ পড়েন। (৩) হিজাযবাসী مِيْكَالُ হামযাহ ও ياء ছাড়া পড়েন। (৪) ইবনে মুহাইসেন مِيْكَئِيْلُ অর্থাৎ كَاف -এর পড়ে الف ছাড়া পড়েন। (৫) আ'মাশ مِيْكَائِلُ হামযার উপর যবর দিয়ে পড়েন। (৬) مِيْكَائِلُ হামযার পরে ياء বাদ এবং হামযার মধ্যে যের সহকারে পড়া।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ (কুফর ও ফিস্‌কের মধ্যকার পার্থক্য) : اَلْكُفْرُ -এর আভিধানিক অর্থ– ঢেকে রাখা, গোপন করা, অস্বীকার করা ইত্যাদি। আর اَلْفِسْقُ -এর আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন করা, পাপ করা ইত্যাদি।

- আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল, তাঁর কিতাব ও তাঁর কোনো গুণাবলির প্রতি অবিশ্বাস, কিংবা অস্বীকার করার নাম কুফর। আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়াই فِسْق (ফিসক)।
- اَلْكُفْرُ শব্দটি عَامٌ এবং فِسْق শব্দটি خَاصْ কাজেই বলা হবে كُلُّ كَافِرٍ فَاسِقٌ কিন্তু لَيْسَ كُلُّ فَاسِقٍ بِكَافِرٍ; ফাসেক তার ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে, তবে কাফের অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

قوله فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ : مرجع এর- فَإِنَّهُ এর মধ্যে ه যমীর দুটির এখানে ه এর- نَزَّلَهُ এর- ه এর মরজি' জিবরাঈল এবং কুরআন কিংবা ওহী। বাক্যটি এমন হবে– فَإِنَّ جِبْرِيلَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ أَوِ الْوَحْيَ কারো মতে فَإِنَّهُ এর- ه এর যমীরের مرجع হবে اَللّٰه বাক্যটি এমন হবে فَإِنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ তবে প্রথম অভিমত অধিক যুক্তিযুক্ত। –[কাশশাফ]

مُصَدِّقًا، هُدًى، بُشْرٰى -এর মহল্লে ই'রাব : তিনটি শব্দই مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কারণ– (ক) এগুলো نَزَّلَهُ এর ه যমীর থেকে হাল হয়েছে। (খ) অথবা ه থেকে مُصَدِّقًا শব্দটি হাল হয়েছে এবং هُدًى ও بُشْرٰى শব্দ দুটি যেহেতু مُصَدِّقًا এর উপর عطف হয়েছে। তাই তারাও منصوب কারণ معطوف ও معطوف عليه -এর একই اعراب হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتَمَنَّوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّىْ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা মৃত্যু কামনা কর।

لَتَجِدَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ لام تاكيد با نون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجْدَانُ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি নিশ্চয় পাবে।

يُعَمَّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْمِيْرُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের দেওয়া হয়।

مُزَحْزِحٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْمُزَحْزَحَةَ মূলবর্ণ (ز ـ ح ـ ز ـ ح) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– রক্ষাকারী, দূর কারী।

فٰسِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ফাসেকগণ।

عٰهَدُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاهَدَةُ মূলবর্ণ– (ع ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তারা অঙ্গীকার করেছে।

ظُهُوْرِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ظَهْرٌ ; অর্থ– পিঠসমূহ।

বাক্য বিশ্লেষণ

بُشْرٰى ও هُدًى، مُصَدِّقًا পূর্বে উল্লিখিত نَزَّلَهُ -এর ه যমীর থেকে حال হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে।

قوله أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এখানে اَكْثَرُ হলো مضاف আর هُمْ যমীর مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে مبتدأ আর لَا يُؤْمِنُوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة হয়ে خبر হয়েছে। সুতরাং مبتدأ এবং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٢)

অনুবাদ : (১০২) আর তারা অনুসরণ করল এমন কাজের যার চর্চা করত শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে, আর সুলাইমান কুফরি করেননি, কিন্তু শয়তানরা [জাদু মন্ত্রের কথায় ও কাজে] কুফরি করছিল, মানুষকেও জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিল, আর [অনুসরণ করল] ঐ জাদুরও যা নাজিল করা হয়েছে বাবেলে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর, আর তারা শিক্ষা দিতেন না কাউকেও যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে, আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক, সুতরাং তোমরা কাফের হয়ো না; অতঃপর লোকে শিখত তাদের থেকে এমন জাদুবিদ্যা যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাত কোনো পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে; বস্তুত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা দ্বারা কারও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত, আর শিখত এমন বিষয় যা তাদের জন্য ক্ষতিকর মঙ্গলজনক নয়, আর তারা অবশ্যই জানে, যে ব্যক্তি এটা অবলম্বন করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই; আর নিশ্চিত মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের প্রাণ দিচ্ছে, হায়! যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকত।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٣)

(১০৩) আর যদি তারা ঈমান আনত এবং পরহেজগারী করত, তবে আল্লাহর তরফ হতে ছওয়াব উৎকৃষ্ট ছিল। হায়, যদি তাদের বুদ্ধি থাকত।

১২ ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ

১০২. وَاتَّبَعُوْا আর তারা অনুসরণ করল এমন কাজের مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ যার চর্চা করত শয়তানরা عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ সুলাইমানের রাজত্বকালে وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ আর সুলাইমান কুফরি করেননি وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا কিন্তু শয়তানরা [জাদু মন্ত্রের কথায় ও কাজে] কুফরি করেছিল يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ মানুষকেও শিক্ষা দিচ্ছিল السِّحْرَ জাদুবিদ্যা وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ আর ঐ জাদুরও যা নাজিল করা হয়েছে ফেরেশতাদ্বয়ের উপর بِبَابِلَ বাবেলে هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ হারূত ও মারূত وَمَا يُعَلِّمٰنِ আর তারা শিক্ষা দিতেন না مِنْ اَحَدٍ কাউকেও حَتّٰى يَقُوْلَآ যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক فَلَا تَكْفُرْ সুতরাং তোমরা কাফের হয়ো না فَيَتَعَلَّمُوْنَ অতঃপর লোকে শিখত مِنْهُمَا তাদের থেকে مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ এমন জাদুবিদ্যা যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাত بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ কোনো পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ বস্তুত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা দ্বারা مِنْ اَحَدٍ কারও اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুম ব্যতীত وَيَتَعَلَّمُوْنَ আর শিখত مَا يَضُرُّهُمْ এমন বিষয় যা তাদের জন্য ক্ষতিকর وَلَا يَنْفَعُهُمْ মঙ্গলজনক নয় وَلَقَدْ عَلِمُوْا আর তারা অবশ্যই জানে لَمَنِ اشْتَرٰىهُ যে ব্যক্তি এটা অবলম্বন করবে مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ আর নিশ্চিত মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা দিচ্ছে اَنْفُسَهُمْ নিজেদের প্রাণ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়! যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকত।

১০৩. وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا আর যদি তারা ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং পরহেজগারী করত لَمَثُوْبَةٌ তবে ছওয়াব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে خَيْرٌ উৎকৃষ্ট ছিল لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়, যদি তাদের বুদ্ধি থাকত।

(১০৪) হে মুমিনগণ! তোমরা 'রায়েনা' বলো না; বরং 'উনযুরনা' বলো এবং শুনে নাও, কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।	يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٠٤)
(১০৫) মোটেই পছন্দ করে না এই কাফেররা কিতাবীই হোক আর মুশরিক হোক, তোমাদের উপর অবতারিত হওয়া তোমাদের প্রভুর তরফ হতে কোনো কল্যাণ; আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে নেন তাঁর রহমতের সাথে যাকে ইচ্ছা; আর আল্লাহ মহা করুণাময়।	مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (١٠٥)

শাব্দিক অনুবাদ

১০৪. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا তোমরা 'রায়েনা' বলো না; وَقُوْلُوا انْظُرْنَا বরং 'উনযুরনা' বলো। وَاسْمَعُوْا এবং শুনে নাও وَلِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ اَلِيْمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১০৫. مَا يَوَدُّ মোটেই পছন্দ করে না الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই কাফেররা مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাবীই হোক وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ আর মুশরিক হোক اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর অবতারিত হওয়া مِّنْ خَيْرٍ কোনো কল্যাণ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে; وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে নেন بِرَحْمَتِهٖ তাঁর রহমতের সাথে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ আর আল্লাহ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মহা করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বকালে জিনেরা জাদুর প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) উক্ত গ্রন্থটি একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর পর জিনেরা তা বের করে লোক সমাজে বলতে থাকে, সুলায়মান এ কিতাবের বলে রাজত্ব করেছেন। ফলে ইহুদিরা সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলতে থাকে। নবী করীম (সা.) যখন সুলায়মান (আ.)-কে নবী হিসেবে সম্মানের সাথে নামোল্লেখ করেন, তখন তারা বলতে থাকে, মুহাম্মদ তো সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করে ফেলেছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল – ২ : আবূ হতেম বলেন, আসেফ ছিলেন সুলাইমান (আ.)-এর কেরানী। তিনি ইসমে আজম জানতেন। তিনি সব কিছুই সুলাইমান (আ.)-এর আদেশক্রমে লিখতেন। আবার তা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আদেশক্রমে লিখতেন। আর তা সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখতেন। পরবর্তীতে সুলাইমান (আ.) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন শয়তানেররা তা বের করে প্রতি দু'লাইনে লেখার ফাঁকে ফাঁকে জাদু ও কুফরি বাক্য লিখে রাখে। আর তারা বলতে লাগল যে, সুলাইমান যা আমল করতেন তাহলো এগুলো। তখন অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা তাঁকে কুফরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাঁকে ভর্ৎসনাও করে। সে সাথে তাদের ওলামারাও একসাথে তাল মিলায়। সুতরাং অজ্ঞ ইহুদিরা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে থাকে। তাদের অপকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তানের চক্রান্ত এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্কলুষতা লোক সমাজে বর্ণনা করার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১২২/১]

اَلشَّيٰطِيْنُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلشَّيٰطِيْنَ দ্বারা দুষ্ট প্রকৃতির জিন ও মানব জাতি উভয়ই হতে পারে। এখানে আয়াতে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ সরল পথ থেকে বিভ্রান্তকারী সকলকেই শয়তান বলা হয়।

হযরত সুলায়মান (আ.) সংক্রান্ত ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। যখন তিনি পায়খানা প্রশ্রাবখানায় যেতেন তখন উক্ত আংটি তাঁর স্ত্রী যুবায়দার নিকট রেখে যেতেন। এক সময় যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো তখন এক জিন শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করে যুবায়দার নিকট এসে তা চেয়ে নিয়ে যায়, সে আংটিটি হাতে পরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তখতে বসে পড়ে এবং যথারীতি রাজত্ব শুরু করে দেয়। এদিকে হযরত সুলায়মান (আ.) ফিরে এসে স্ত্রীর নিকট আংটি চাইলে স্বয়ং সুলায়মান (আ.) আংটিটি নিয়েছেন স্ত্রী কর্তৃক এই উত্তর শুনে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে, এটি একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। সেই সময় শয়তানরা জাদু-মন্ত্র, জ্যোতি-বিজ্ঞান, কাব্য-কবিতা ও গায়েবের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক লিখে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তখতের নিচে পুঁতে রাখে। খোদায়ী পরীক্ষার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি আংটিটি ফিরে পান ও পুনরায় তখ্‌তে সমাসীন হন। বার্ধক্যে পৌঁছলে তিনি ইন্তেকাল করেন। অতঃপর শয়তানরা সেই পুস্তকের কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করে এবং আরো প্রচার করে যে, এর সাহায্যেই তিনি মানব দানবসহ সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেহেতু জিনেরা তখ্‌তে সুলায়মানের নিকট যেতে পারতো না, তাই কিছু লোক গিয়ে তখ্‌তের নিচে খোদাই করে তা উদ্ধার করে আনে। তখন লোকেরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে একজন জাদুকর হিসেবে বিশ্বাস করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এসব ভ্রান্ত চিন্তা ধারার অপনোদন করেন এবং আল্লাহর ঘোষণা অবতীর্ণ হয় যে, যাদু-মন্ত্র শয়তান কর্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত ও প্রচারিত, হযরত সুলায়মান (আ.) তা থেকে মুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

হারূত ও মারূতের ঘটনা

হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশ্‌তার নাম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাদের সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. এক সময় বাবেল শহরে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। জাদুবিদ্যা এতটা উৎকর্ষিত হয়েছিল যে, লোকেরা মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে তফাত করতে পারত না। ফলে অনেক জাদুকরকেও তারা নবী মনে করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূত নামের দুই ফেরেশতাকে মানুষের পরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে বাবেল শহরে প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবীতে এসে মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা দিলে লোকেরা তাদের কাছে জড়ো হয়। তখন লোকদের উদ্দেশ্যে তারা বলে, "দেখ জাদু শিক্ষা করা কুফরি। আর আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। কাজেই তোমরা জাদু শিখে কুফরি করো না।" এ কথা বলার পরও যারা জাদু শিখতে চাইতো, তারা তাদেরকে জাদু শিখাত। তবে তারা মানুষের কোনো ক্ষতি করতো না।

২. ইমাম ইবনে কাসীর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হযত আদম (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা ধন সম্পদ ও নারী ভোগের কুহকে পড়ে খুনখারাবি শুরু করে। ফলে ফেরেশ্‌তাদের কেউ কেউ বলে উঠল, 'দেখো, আদম সন্তানরা কত নাফরমান, আল্লাহর নাফরমানি করছে। আমরা যদি তাদের মর্যাদার থাকতাম তাহলে আদৌ এমনটি করতাম না। এই মন্তব্য শুনে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথাই যদি সত্যি হয় তবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জনকে নির্বাচন করো। আমি তাদের মাঝে মানুষের মতো যাবতীয় জৈবিক চাহিদা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করি। তারপর তোমরা দেখো, তারা সেখানে গিয়ে কি করে।' কথামতো হারূত ও মারূত নামে দুই ফেরেশতাকে নির্বাচিত করা হয়। পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে ৩টি উপদেশ প্রদান করেন। যথা– (১) আমি তোমাদের সম্পর্কে বলছি যে, পৃথিবীতে গিয়ে তোমরা আমার সাথে কাউকেও শরিক করো না, (২) জেনা করো না, (৩) এবং মদ্যপান করো না।

বাবেলে আসার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা যোহরা নামের এক সুন্দরী রমণীর ফাঁদে পা দেয়। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার জন্য এই রমণীকে তাদের সাহচর্যে প্রেরণ করেন। তারা এই সুন্দরীকে দেখে অবিচল থাকতে পারেনি। তারা তাঁকে যৌন সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা শর্ত জুড়ে দেয়। সে বলে, "তোমরা যদি শিরক করতে পারো, তাহলে আমি এই প্রস্তাবে রাজি আছি।" এ শর্তে তারা অস্বীকৃতি জানালে সে চলে যেতে থাকে এবং আবার ফিরে এসে বলে, "তোমরা যদি ঐ ছেলেটাকে হত্যা করতে পার, তবে আমি রাজি আছি। এ শর্তেও তারা রাজি হলো না। ফলে সেই রমণী বলল, 'তোমরা যদি মদ পান করো তবে আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। এ শর্তে তারা রাজি হয়ে যায়। তারা মদ পানকে ছোট অপরাধ মনে করে এতে সম্মত হয়। মদ পান করে তারা মত্ত অবস্থায় ঐ রমণীর সাথে জেনা করে এবং ঐ ছেলেটিকেও হত্যা করে। চেতনা ফিরে এলে ঐ রমণী তাদেরকে বলল, তোমরা যা করতে অস্বীকার করেছিলে এখনতো তাও করলে।" তখন তারা তাদের কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল, কিংবা পরকালে শাস্তি গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদান করেন। তারা ইহকালের শাস্তিকেই বেছে নেয়। –[ইবনে কাসীর]

তবে আল্লামা বায়যাবী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত উপাখ্যানটিকে পৌরণিক কাহিনী এবং ইসরাঈলী বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, এই ঘটনার কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই। –[তাফসীরে বায়যাবী]

জাদুর বিবরণ : اَلسِّحْرُ শব্দের বাংলা জাদু, ইংরেজিতে তাকে magic বলা হয়। ম্যাজিক অর্থ সম্মোহন, যা এক প্রকার অদৃশ্য ক্রিয়ার প্রভাব মাত্র। দার্শনিকদের মতে اَلسِّحْرُ -এর কার্যকারণ একটি সূক্ষ্ম বিষয়। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শয়তানের সাহচর্যের মাধ্যমে অন্তরের নোংড়ামি প্রসূত বিষয়। যেমন কোনো বিশেষ মন্ত্র পড়লে এরূপ জাদু সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্যাপারটি বহিরাগত কোনো শক্তির প্রভাবও হতে পারে। যেমন দূর থেকে জিন ও শয়তানের প্রভাব। তবে এটা প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির প্রভাবও হতে পারে যাকে মেসমেরিজম বলা হয়।
ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, اَلسِّحْرُ হচ্ছে ধোঁকাবাজি।
সর্বসাধারণের চোখে যে সকল কাজ মানুষের সাধ্যের বাইরে, বিশেষ কোনো কৌশলে তা সাধন করে প্রদর্শন করাকেই اَلسِّحْرُ বলা হয়। হ্যাঁ, এই প্রকার কাজ যদি নবীদের থেকে ঘটে তবে তাকে মু'জিযা এবং ওলীদের থেকে প্রকাশিত হলে তাকে কারামত বলা হয়।
ইংরেজি অভিধানে اَلسِّحْرُ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The art of warking by poewr over the hidden forces of nature. অর্থাৎ, প্রকৃতিতে লুক্কায়িত অতিন্দ্রীয় শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছু সংঘটিত করার শিল্পকে জাদু বলে।

জাদুর বিধান : জাদু যদি ভেলকিবাজি হয়, কিংবা কুফরি কালামের সাহায্যে হয় তবে এ প্রকার জাদু মানুষের কল্যাণকর হোক, আর ক্ষতিকর হোক সর্বাবস্থায় হারাম।
আর যদি তা শরিয়ত সম্মত মন্ত্রের মাধ্যমে হয় এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে বৈধ। একে জাদু বলা হয় না, বরং এটাকে আযীমত বা তাবীলাত বলা হয়। –[বায়ানুল কুরআন]

জাদুকরের বিধান : পবিত্র কুরানের ভাষায় জাদু করা কুফরি। কাজেই কেউ যদি জেনে বুঝে জাদু করে তবে তো সে কুফরি করল। জাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে দু'রকম কথা পাওয়া যায়।

১. কোনো মুমিন যদি কুফরি কালামের সাহায্যে জাদু করে; কিংবা অন্য মুমিনের ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে জাদু করে, তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাকে হত্যা করতে হবে। তবে এ দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারের।
   ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, আবূ ছাওর, ইসহাক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এই মতকে সমর্থন করেন। তাঁদের দলিল হলো, নবীজীর বাণী– حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ অর্থাৎ "জাদুকরের দণ্ড বিধান হলো, তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।"
২. আর যদি জাদুতে কুফরি কালাম না থাকে, তবে জাদুকরকে হত্যা করা যাবে না। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করেন যে, "হযরত আয়েশা (রা.) একজন জাদুকর দাসী হত্যা না করে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।"
৩. তবে জাদু কুফরি কালামের দ্বারা হোক, আর বৈধ মন্ত্রের দ্বারাই হোক, জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে অবস্থাবেধে জাদুকরের কাছ থেকে قِصَاص বা دِيَّة গ্রহণ করা হবে। –[কুরতুবী]

قوله بِبَابِلَ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা হারূত মারূতকে বাবেল শহরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাবেল শহর কোনটি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন–(১) হীরা রাজ্য ও তৎকালীন কূফা নগরীর অদূরবর্তী একটি নগরী। কেননা ইবনে মাসউদ কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা হীরা ও বাবেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোক।" এ কথাটি দ্বারা বাবেল নগরী কূফার অদূরে বুঝায়। (২) কেউ কেউ বলেন : বাবেল বলে, ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। (৩) কেউ কেউ বলেছেন, বাবেল বলতে নাহওয়ান্দ পর্বত উদ্দেশ্য। (৪) কেউ কেউ মনে করেন বাবেল বলে ঐতিহাসিক বেবিলন নগরীকে বুঝানো হয়েছে যা এক সময় নেনেভা রাজ্যের রাজধানী ছিল। নমরূদ এ রাজ্যের অধিশ্বর, এটাকে মেসোপটেমিয়াও বলা হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী ও অন্যান্য]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর ও শানে নুযূল প্রসঙ্গে অনেক অসমর্থিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

১. নির্বোধ ইহুদিরাই হযরত সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২. বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদিদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী যোহরার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরিয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।
৩. সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদিরা আমল বা কাজ করত, 'ইলম' বা জানার বিপরীতে এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবং পরিশেষে 'যদি তারা জানত।' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।
৪. ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চার্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গম্বরগণের মু'জিযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে, কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন এবং অনুসরণ যোগ্য মনে করতে থাকে, এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত নামে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা– যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুয়তকে যেমন মু'জিযা ও নির্দশনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারুত ও মারুত যে ফেরেশতা তার উপর যুক্তি প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হলো, যাতে তাদের নির্দেশাবলি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে পয়গম্ব ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলি মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরে'র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। সুতরাং এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয়, যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভালো, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোনো হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণ আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়– যা সাধারণতঃ ভালো কাজেই হয়ে থাকে। উপরিউক্ত জাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও জাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার [যেমন, বাস্তবে হয়েছে] ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বগরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জিযার পার্থক্য : পয়গম্বরদের মু'জিযা ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলিও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না; কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মতো। কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলিও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জিযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জিযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণে কোনো হাত নেই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও।' কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, হযরত ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহর এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভিতরে চলে যায়। এটা মু'জিযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়।

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জিযা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বলা হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ আপনি যে একমুষ্ঠি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌছে গেল, এতে আপনার কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ। এই মু'জিযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জিযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ, আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জিযা ও জাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্যও আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ মু'জিযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাঁদের আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর জিকির হতে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর প্রার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জিযা ও নবুয়ত দাবি করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুয়তের দাবি ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে– يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ জাদুর কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

(১০৩) قوله وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا الخ – আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতি ইহুদিদের আরোপিত কুফরির অভিযোগ থেকে তাঁর নিষ্কলুষ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশ নাজিল করেন। বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, সুলাইমান (আ.) কে যখন নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হলো, তখন এক শ্রেণির ইহুদিরা বলতে লাগল, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি লক্ষ্য কর! তিনি হযরত সুলাইমানকে নবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন কেবল মাত্র একজন জাদুকর। ইহুদিদের এহেন মিথ্যা অভিযোগ থেকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্কলুষতার বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন। –[বাহরে মুহতি : ৪৯৫/১, জালালাইন : ১৫]

(১০৪) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا الخ আয়াতের শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাম বিনিময় ও কতাবার্তা ইত্যাদিতে ইহুদিরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে দুর্ব্যবহারের চেষ্টা চালাত। তাই তারা নবী করীম ﷺ-কে কখনো "একটু থামুন, কথাটিগুলো আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে দিন।" বলার প্রয়োজন হলে তারা বলত "রায়িনা'। এ কথাটির স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে– আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের কথা শুনুন। কিন্তু এর আরো কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন– হিব্রু ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে "শোন্ তুই বধির হয়ে যা" হিব্রু ভাষায় এর অপর অর্থ হতে পারে– নির্বোধ ও মূর্খ। এ শব্দটি কথা বার্তার মাঝে বলা হলে তার অর্থ হয়, "তুমি যদি আমাদের কথা শোনো তবে আমরাও তোমাদের কথা শুনব"। তাছাড়া এই শব্দ উচ্চারণের সময় খানিকটা দীর্ঘ করা হলে "রায়েনার" পরিবর্তে "রায়িনা' উচ্চারণ হয় যার অর্থ হয়, "হে আমাদের রাখাল"। ইহুদিদের মুখে শব্দটি শুনে মুসলমানরা এর স্বাভাবিক অর্থ লক্ষ্য করে শব্দটি প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতেন, এ সম্পর্কে ইহুদিদের দুষ্ট মনোভাব সম্পর্কে মুসলমানরা বেখবর ছিলেন। ইহুদিদের দুষ্ট ভাবধারা থাকার কারণে মুসলমানদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে একেবারেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে "উনজুরনা" বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ– "আমাদের দেখুন। আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের কথা বলার সুযোগ দিন।" এ শব্দটিতে অন্য কোনো অর্থের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাজিল হয়। ফলে ইহুদিদের 'রায়িনা' বলার আর কোনো সুযোগ রইল না।

لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا **বলার কারণ :** আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে رَاعِنَا বলতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে رَاعِنَا শব্দটি গঠনগতভাবে দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ এ শব্দটি ভালো এবং মন্দ উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যেমন– رَاعِنَا শব্দটি যদি مُرَاعَاةً মাসদার থেকে اَمَرْ -এর সীগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অর্থ হবে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। আবার رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعْىٌ মাসদার থেকে اسم فاعل হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে এর অর্থ হবে, হে আমাদের রাখাল! আর رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعُوْنَةٌ মাসদার থেকে اسم فاعل রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে উহার অর্থ হবে– হে আমাদের কুলক্ষণের ব্যক্তিটি! এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আল্লাহর রাসূলের শানে মানায় না। সুযোগ বুঝে এ শব্দটি নোংড়া অর্থে ব্যবহার করে ইহুদিরা নবীজীকে খাটো করার চেষ্টা করত। তাই সাহাবীগণ যদি رَاعِنَا বলা থেকে বিরত থাকে তবে ইহুদিরাও এই শব্দটি ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। এ সকল কারণে আল্লাহ মু'মিনদের رَاعِنَا বলতে নিষেধ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِتَّبَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুসরণ করল।

تَتْلُوْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে পাঠ করে।

مَا يُعَلِّمٰنِ : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْلِيْمُ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তারা শিখাতেন না।

فِتْنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فِتَنٌ অর্থ– পরীক্ষা।

يُفَرِّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা পৃথক করত, তারা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত।

اَلْمَرْءِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন "رِجَالٌ" مِنْ غَيْرِ لَفْظ অর্থ– লোক, পুরুষ।

زَوْجٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ازواج অর্থ– স্ত্রী।

ضَآرِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرُّ মূলবর্ণ (ض ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিকারকগণ।

مَثُوْبَةٌ: ছওয়াব, প্রতিদান, বিনিময়।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ : এখানে لام টি তাকীদের জন্য এসেছে مَثُوْبَةٌ হলো مبتدأ আর مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ জার মাজরূর হয়ে مَثُوْبَةٌ এর সাথে متعلق আর خَيْر হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا : এখানে لَا تَقُوْلُوْا ফে'ল اَنْتُمْ যমীরে মুসতাতির فاعل অতঃপর فعل ও فاعل মিলে قول হয়েছে। তৎপর رَاعِ ফে'ল اَنْتَ যমীর فاعل এবং نَا মাফউলে বিহী, এবার فعل এবং فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية হয়ে مقولة হয়েছে। পরিশেষে قَوْلٌ ও مقوله মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে وَ হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, ذُوْ মুযাফ, اَلْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মাওসূফ ও সিফাত মিলে مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

مَا نَنۡسَخۡ مِنۡ اٰيَةٍ اَوۡ نُنۡسِهَا نَاۡتِ بِخَيۡرٍ مِّنۡهَاۤ اَوۡ مِثۡلِهَا ؕ اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ (١٠٦)

অনুবাদ : (১০৬) আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকেই বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা তদানুরূপ আনয়ন করি; তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান।

اَلَمۡ تَعۡلَمۡ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَمَا لَـكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ (١٠٧)

(১০৭) তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহরই; আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো বন্ধুও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

اَمۡ تُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَسۡـَٔلُوۡا رَسُوۡلَـكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوۡسٰى مِنۡ قَبۡلُ ؕ وَمَنۡ يَّتَبَدَّلِ الۡكُفۡرَ بِالۡاِيۡمَانِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيۡلِ (١٠٨)

(১০৮) তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিকট আবেদন করবে যেমন ইতঃপূর্বে [হঠকারিতাবশতঃ এরূপ বহু নিরর্থক] আবেদন করা হয়েছিল মূসার নিকট, আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করে, নিশ্চয় সে সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে।

وَدَّ كَثِيۡرٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَوۡ يَرُدُّوۡنَكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِكُمۡ كُفَّارًا ۖۚ حَسَدًا مِّنۡ عِنۡدِ اَنۡفُسِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الۡحَـقُّ ۚ فَاعۡفُوۡا وَاصۡفَحُوۡا حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ (١٠٩)

(১০৯) কায়মনে চায় কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনয়নের পর আবার তোমাদেরকে কাফের করে ফেলে, শুধু তাদের অন্তরে নিহিত হিংসার দরুন, তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর, যা হোক ক্ষমা করতে থাক, উপেক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর হুকুম পাঠান; নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

১০৬. مَا نَنۡسَخۡ مِنۡ اٰيَةٍ আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করলে اَوۡ نُنۡسِهَا কিংবা আয়াতটিকেই বিস্মৃত করে দিলে نَاۡتِ আনয়ন করি بِخَيۡرٍ مِّنۡهَاۤ তদপেক্ষা উত্তম اَوۡ مِثۡلِهَا বা তদানুরূপ; اَلَمۡ تَعۡلَمۡ তুমি কি জান না যে, اَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ সকল বিষয়ের উপরই قَدِيۡرٌ ক্ষমতাবান।

১০৭. اَلَمۡ تَعۡلَمۡ তুমি কি জান না যে, اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ একমাত্র আল্লাহরই مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য وَمَا لَـكُمۡ আর তোমাদের নেই مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত مِنۡ وَّلِىٍّ অন্য কোনো বন্ধুও وَّلَا نَصِيۡرٍ এবং সাহায্যকারীও নেই।

১০৮. اَمۡ تُرِيۡدُوۡنَ তোমরা কি চাও যে, اَنۡ تَسۡـَٔلُوۡا আবেদন করবে رَسُوۡلَـكُمۡ তোমাদের রাসূলের নিকট كَمَا سُئِلَ যেমন আবেদন করা হয়েছিল مُوۡسٰى মূসার নিকট مِنۡ قَبۡلُ ইতঃপূর্বে وَمَنۡ আর যে ব্যক্তি يَّتَبَدَّلِ অবলম্বন করে الۡكُفۡرَ কুফরি بِالۡاِيۡمَانِ ঈমানের পরিবর্তে, فَقَدۡ ضَلَّ নিশ্চয় সে দূরে সরে পড়ে سَوَآءَ السَّبِيۡلِ সঠিক পথ হতে।

১০৯. وَدَّ কায়মনে চায় كَثِيۡرٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই لَوۡ يَرُدُّوۡنَكُمۡ আবার তোমাদেরকে করে ফেলে, مِّنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِكُمۡ তোমাদের ঈমান আনয়নের পর كُفَّارًا কাফের حَسَدًا শুধু হিংসার দরুন مِّنۡ عِنۡدِ اَنۡفُسِهِمۡ তাদের অন্তরে নিহিত مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الۡحَـقُّ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর فَاعۡفُوۡا যা হোক ক্ষমা করতে থাক وَاصۡفَحُوۡا উপেক্ষা করতে থাক حَتّٰى يَاۡتِىَ اللّٰهُ যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা পাঠান بِاَمۡرِهٖ তাঁর হুকুম اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ প্রত্যেক বস্তুর উপর قَدِيۡرٌ ক্ষমতাবান।

(১১০) এবং যথারীতি নামাজ পড় ও জাকাত দাও; আর যে নেক কাজই নিজ কল্যাণের জন্য সঞ্চয় করতে থাকবে তা আল্লাহর নিকট পাবে; কেননা আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١١٠)
(১১১) আর ইহুদি, নাসারাগণ বলে বেহেশতে কেউই কখনো যেতে পারবে না তারা ব্যতীত যারা ইহুদি কিংবা নাসারা হয়েছে; এটা তাদের আত্ম-সান্ত্বনামূলক উক্তি; আপনি বলে দিন, নিজ নিজ দলিল আন- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١١١)
(১১২) নিশ্চয় অন্যরাও যাবে, যে কোনো ব্যক্তিই নিজের চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকাবে এবং সে অকপটও হয়, তবে এরূপ ব্যক্তি তার বিনিময় পাবে তার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছে, আর না তাদের কোনো ভয় আছে এবং না তারা চিন্তান্বিতও হবে।	بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١١٢)

শাব্দিক অনুবাদ

১১০. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং যথারীতি নামাজ পড় وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও জাকাত দাও; وَمَا تُقَدِّمُوْا আর যে সঞ্চয় করতে থাকবে لِاَنْفُسِكُمْ নিজ কল্যাণের জন্য مِّنْ خَيْرٍ নেক কাজই تَجِدُوْهُ তা পাবে; عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট اِنَّ اللّٰهَ কেননা আল্লাহ بِمَا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের সকল কৃতকর্মের প্রতি بَصِيْرٌ দৃষ্টি রাখছেন।

১১১. وَقَالُوْا আর ইহুদি, নাসারাগণ বলে لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ বেহেশতে কেউই কখনো যেতে পারবে না اِلَّا مَنْ كَانَ তারা ব্যতীত যারা হয়েছে هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি কিংবা নাসারা تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ এটা তাদের আত্ম-সান্ত্বনামূলক উক্তি; قُلْ আপনি বলে দিন, هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ নিজ নিজ দলিল আন– اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২. بَلٰى নিশ্চয় অন্যরাও যাবে, مَنْ اَسْلَمَ যে কোনো ব্যক্তিই ঝুঁকাবে وَجْهَهٗ নিজের চেহারা لِلّٰهِ আল্লাহর দিকে وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে অকপটও হয়, فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ তবে এরূপ ব্যক্তি তার বিনিময় পাবে عِنْدَ رَبِّهٖ তার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছে, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ আর না তাদের কোনো ভয় আছে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং না তারা চিন্তান্বিতও হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৬) قوله مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** যখন কেবলা পরিবর্তন হলো তখন ইহুদিরা তিরস্কার করে বলতে লাগল, মুহাম্মদ অস্থিরমনা মানুষ আজ তার সাথীদেরকে এক নির্দেশ দেয় আবার আগামীকাল তা থেকে নিষেধ করে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল–২ : কুরআন শরীফের এক আয়াত অপর আয়াত দ্বারা রহিত হওয়া দেখে ইহুদিরা অভিযোগ আরোপ করল যে, পূর্ববর্তী আয়াত ও তার হুকুমের মধ্যে খারাপ ও সঙ্গত দিক কোনটি দেখা দিল, পূর্ববর্তী আয়াত যাদ্দরুণ রহিত করা হলো। পূর্ববর্তী নির্দেশে যদি কোনো প্রকারের অসঙ্গত ছিলই, তাহলে সে নির্দেশ দেওয়া হলো কেন যাকে রহিত কতে হলো? কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, রাতে ওহী নাজিল হতো ভোর বেলায় তা রহিত হয়ে যেত। ফলে ইহুদিরা বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কুলূব]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর উপর রাতের বেলায় যে ওহী নাজিল হতো। দিনের বেলায় কোনোংশ ভুলিয়ে দেওয়া হতো, তখন এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ১২৭/১]

(১০৮) قوله اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–২ :** একবার মক্কার কাফেররা রাসূলে কারীম (সা.)-কে বললেন, আমাদের জন্য ওহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিন। রাসূল ﷺ প্রতিউত্তরে বললেন, আমি স্বর্ণ বানাতে পারি, তবে শর্ত হলো এরপর যদি তোমরা নাফরমানি কর তাহলে তোমাদের উপর আজাব আসবে। ঐ আজাব আসবে যা বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। একথা বলার পর তারা হুজুর ﷺ-এর কাছে থেকে চলে গেল। কুরাইশদের অযৌক্তিকভাবে এ দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে ইহুদি ও কতিপয় মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তাদের কারো এ দাবি ছিল আসমান থেকে পূর্ণ কিতাব এক সাথে নিয়ে আস। হযরত মূসা (আ.) যেমনভাবে একসাথে পূর্ণ তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন। কারো দাবি ছিল যে, আসমান থেকে আমাদের নিকট একটি পত্র নিয়ে আস, যাতে লিখা থাকবে রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়ার প্রতি। আমি মুহাম্মদকে মানুষের প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি। কারো দাবি ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের মুখামুখি আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে উপস্থিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনব না। এ সকল উদ্ভট দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

(১০৯) قوله وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** ইসলামের চির শত্রু আখতারের দুই ছেলে ইহুদি নেতা হুআই এবং আরেক ভাই সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করত মুসলমানদেরকে কুফরির দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাদের এই নোংরা চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল –২ : নাহাস বিন আযূরা, যায়েদ বিন কায়েস ও ইহুদিদের একটি জামাত, হুযাইফা ও আম্মারকে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে। তাদের এহেন চক্রান্তের প্রতি মুসলমানদের সচেতন ও সতর্ক করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[বাহরে মুহীত : ৫১৭-১৮/১]

(১১১) قوله وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার হুজুর ﷺ-এর দরবারে নাজরানের কিছু খ্রিস্টান এবং মদিনার কিছু ইহুদি উপস্থিত হলো। তারা এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপ তর্কে লিপ্ত হলো। ইহুদিরা দাবি করতে লাগল যে, জান্নাতে একমাত্র ইহুদিরাই প্রবেশ করবে। আর নাসারাও দাবি করলো যে, জান্নাতে একমাত্র নাসারাই প্রবেশ করবে। তাদের এই হাস্যকর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا –এই আয়াতে কুরআনি আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নস্‌খ' শব্দের অর্থ হলো দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নসখ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা– অর্থাৎ, রহিত করাকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্‌খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোনো বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

আল্লাহর বিধানে নস্‌খের স্বরূপ : জগতের রাষ্ট্র ও আইন আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্‌খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে।

১. ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। ২. ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোনো কোনো সময় সাময়িক আইন জারি করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নসখ আল্লাহর আইনে হতে পারে বলে ধারণাও করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নসখ' এরূপ : আইন রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না' অন্য আইন জারি করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারি করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ঔষধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ঔষধ এবং পরে অন্য ঔষধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ঔষধ, তিনি দিন অন্য ঔষধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ঔষধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বুঝাবুঝির কারণে ত্রুটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহর আইনে এবং আসমানি গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানি গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানি গ্রন্থের বিদান নসখ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারি করেছে। এমনিভাবে একই নবুয়ত ও শরিয়ত এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর আল্লাহর হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ اِلَّا تَنَاسَخَتْ –অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নসখ ও পরিবর্তন করা হয়নি।–[কুরতুবী] [বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফিকহ দ্রষ্টব্য]

এখানে 'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোনো অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে করা হোক।

জ্ঞাতব্য : তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদিদের প্রতি আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত [পথনির্দেশ] নিহিত রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে।

খ্রিস্টান ও ইহুদি উভয় সম্প্রাদয়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র বলে দাবি করত এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এ অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরাএকথা বলার সুযোগ পেল যে, খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদিধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ওদের মূর্তি পূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন, তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা ইসলাম যে কোনো ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ

এক. বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমপর্ণ করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পিছনে ফেলে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

দুই. যদি কেউ মনে প্রাণে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল খুশিমতো মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও ইবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম বিষয়টি بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়; বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

مَا مَعْنَى النَّسْخِ বা 'নসখ' অর্থ কি? اَلنَّسْخُ শব্দটি বাব فَتَحَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ–

- বিদূরিত করা, রহিত করা। যেমন– نَسَخَتِ الرِّيحُ اٰثَارَ الدِّيَارِ অর্থাৎ ঝড় বাড়ি-ঘরের চিহ্ন বিদূরিত করেছে।
- বাতিল করে দেওয়া। যেমন– বলা হয় نَسَخَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ অর্থাৎ বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন।
- মিটিয়ে দেওয়া। যেমন– نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ অর্থাৎ যৌবন বার্ধক্যকে মিটিয়ে দিয়েছে।
- ইংরেজিতে نَسْخٌ মানে To cancel. To abrogate ইত্যাদি।

اَلنَّسْخُ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلنَّسْخُ هُوَ اِنْتِهَاءُ التَّعَبُّدِ بِقِرَاءَةِ الْاٰيَةِ اَوِالْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا اَوْ بِهِمَا جَمِيْعًا অর্থাৎ কোনো আয়াতের পঠন, অথবা এর বিধান, অথবা উভয়ের ইবাদত স্বরূপ আমলের পরিসমাপ্তি ঘটাকে نَسْخٌ বলে। অর্থাৎ, কোনো আয়াতের বিধান বহাল থেকে পঠন পরিসমাপ্ত হওয়া, অথবা পঠন বহাল থেকে বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া। অথবা পঠন ও বিধান উভয় পরিসমাপ্ত হওয়াকে نَسْخٌ বলা হয়।

কোনো আয়াতের পঠন বা বিধান যে আয়াতের মাধ্যমে নসখ করা হয় তাকে نَاسِخْ বলে এবং যে ঘোষিত আয়াতকে নসখ করা হয় তাকে مَنْسُوْخْ বলে। চাই এ مَنْسُوْخْ টি مَنْسُوْخُ التِّلَاوَةِ হোক কিংবা مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ হোক।

যেমন– لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ এ আয়াতটির বিধান– আল্লাহর বাণী قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ –দ্বারা مَنْسُوْخْ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রথম আয়াতটি مَنْسُوْخْ এবং দ্বিতীয়টি نَاسِخْ হয়েছে।

اَقْسَامُ النَّسْخِ (নসখের প্রকারভেদ) : নাসেখ ও মানসূখের বিচারে শরিয়তে প্রচলিত نَسْخْ প্রধানত ৪ প্রকার যথা– (১) نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা কুরআনের অন্য আয়াতের বিধান বা পঠন রহিত করা। যেমন– উপরের দৃষ্টান্তটি। (২) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা হাদীসের হুকুম রহিত করা। যেমন– নবীজী প্রথমে খেজুর গাছের তা'বীর করতে নিষেধ করেন, কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত করে তা'বীরের অনুমতি প্রদান করেন। (৩) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ হাদীস দ্বারা হাদীসের হুকুম রহিত করা। যেমন– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ, হুজুর ﷺ-এর শেষ আমল ছিল আগুনে স্পর্শ করা জিনিস আহার করার পর অজু না করা। হুজুর ﷺ প্রথমে অজুর হুকুম দিয়েছিলেন পরে তা রহিত করে দিয়েছেন। (৪) نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের বিধানকে রহিত করা। অনেকেই বলেছেন যে, নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতার জন্য অসিয়তের আয়াতটি নবীজীর বাণী– لَا وَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা مَنْسُوْخْ হয়ে গেছে। তবে ইমাম শাফেয়ীসহ আরো অনেকের মতে ৪র্থ প্রকার نَسْخْ জায়েজ নেই। এতে কিতাবুল্লাহর উপর সুন্নাতে নববীর প্রাধান্য এসে যায়, যা বৈধ নয়।

كَيْفِيَّةُ النَّسْخِ (রহিত করার পদ্ধতি) : তাফসীরের কিতাব থেকে জানা যায়, তিন পদ্ধতিতে نَسْخْ তথা রহিতকরণ হতে পারে। যথা– (১) আয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হওয়া। যেমন– رَضَاعَتْ-এর আয়াত সংশ্লিষ্ট হযরত আয়েশার পঠিত عَشْرُ رَضْعَاتٍ অংশটি। (২) হুকুম রহিত, তবে তেলাওয়াত বাকি থাকা। যেমন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ এ আয়াতটির তেলাওয়াত বাকি আছে; কিন্তু হুকুম রহিত।

(৩) তেলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম বহাল থাকা। যেমন– বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের জেনার শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا এ আয়াতটির তেলাওয়াত রহিত; কিন্তু হুকুম বহাল।

নসখের হিকমত : মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। কাজেই বান্দার জন্য কোথায়, কখন, কোন ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন, তা তিনিই ভালো জানেন। যেমন– শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য ডাক্তারগণ দুধ খেতে বলেন, কিন্তু সে একই লোক যদি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন একই ডাক্তার তাকে দুধ খেতে বারণ করেন। ঠিক এমনিভাবে একই জাতির জন্য এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বিধান সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ জন্যই তিনি হুকুমের রদবদল করে থাকেন। এটাই نَسْخْ-এর মূল রহস্য। যেমন– আল্লাহ "মদ" একবারে হারাম করতে পারতেন। কিন্তু বান্দার জন্য তা মান্য করা হতো ভীষণ কঠিন। তাই তিনি মদের হুকুম সময়ান্তরে অবস্থাভেদে পুনঃ পুনঃ রদ-বদল করে ৪র্থ বারে সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। এটা তাঁর অজ্ঞাত নয়; বরং এটা তাঁর চরম বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

হাসাদ শব্দের অর্থ : اَلْحَسَدُ শব্দের বাংলা হলো, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি। ইংরেজিতে اَلْحَسَدُ -কে বলা হয় To envy. To hate. কাজেই اَلْحَسَدُ-এর সংজ্ঞায় বলা যায়– اَلْحَسَدُ رَجَاءُ الْمَرْءِ هَلَاكَ الْغَيْرِ وَضَرَرَهُ مَالًا اَوْ حَالًا سَوَاءٌ كَانَ قَصَدَ مِنْهُ شَيْئًا اَمْ لَا.

অর্থাৎ, اَلْحَسَدُ হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের সম্পদ অথবা তার অবস্থা ধ্বংস হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কামনা করা। এতে সে কিছু আশা করুক আর নাই করুক। এ প্রকারের حَسَدْ সম্পূর্ণ হারাম।

اَقْسَامُ الْحَسَدِ : হালাল হারামের বিচারে حَسَدْ-কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) **حَسَدْ مَذْمُوْمْ (শরিয়ত নিন্দিত হিংসা) :** এটা হলো অন্যের উন্নতি ও কল্যাণ দেখে গা জ্বালা করলে তার ধ্বংস কামনা করা। এতে হিংসুক নিজে কিছু পাক আর না-ই পাক, এ প্রকারের হিংসা مَذْمُوْمْ এবং হারাম। যেমন–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا (১)

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ الخ (২)

(খ) حَسَدٌ مَحْمُوْدٌ (প্রশংসনীয় ঈর্ষা) : আরবিতে এই প্রকারের حَسَدٌ অর্থে গ্রহণ করা হয় না, বরং এটা দ্বারা غِبْطَةٌ উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন হাদীসে নববীতে এসেছে–

لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا لًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

অর্থাৎ দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যাবে না। বিষয় দু'টি হলো–

১. কোনো ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে কুরআন প্রদান করেছেন, আর সে সকাল-সন্ধ্যা কুরআন অনুযায়ী চলে।

২. কোনো ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তাই সে সকাল-সন্ধ্যা এই মাল (আল্লাহর রাহে) খরচ করে। মোট কথা হলো অন্যের অনিষ্ট কামনা করা যাবে না। –[কুরতুবী]

হিংসার কারণসমূহ : দার্শনিক ইমাম গাযালী (র.) হিংসার কতগুলো কার্যকর কারণ বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

শত্রুতা : কোনো কারণে কারোর শত্রুতা জন্মালে ঐ শত্রুতা থেকে জন্ম নেয় حَسَدٌ বা হিংসা।

- كُوْنُوْا مُكَرَّمًا فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ কোনো ব্যক্তি সর্ব সাধারণের চোখে সম্মানিত হওয়া তাঁর সমসাময়িকরা চায় না সে তাদের ওপরে উঠে যাক, ফলে হিংসার শুরু হয়।
- خَادِمًا لِلْاُمَّةِ জাতীয় সেবক হওয়া। কারণ সেবার ফলে সবাই তাকে ভালোবাসবে। কিন্তু ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ আদৌ চায় না যে, লোকেরা তাকে ভালোবাসুক। তাই হিংসার সৃষ্টি হবে।
- مَانِعًا فِيْ حُصُوْلِ الْمَقْصَدِ উদ্দেশ্য হাসিলে বাধা হয়ে দাঁড়ানো। কেউ যদি কোনো কিছু পেতে চায় এবং সেখানে অন্য কেউ হাত দেয়, তবেই জন্ম নেয় হিংসা।
- حِرْصُ السِّيَادَةِ নেতৃত্বের লোভ। এটা হিংসার একটি অন্যতম উৎস। তাছাড়াও ছোট-খাটো অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো থেকে হিংসা নামক নাশকতামূলক চরিত্র জন্ম নেয়। এই চরিত্র যে ব্যক্তি কিংবা সমাজে ঢুকে, ওটাকে খান খান করে নিঃশেষ করে দেয়। আমরা এই নাশক পোকার আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

تِلْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য : تِلْكَ দ্বারা কোন্ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত পরিলক্ষিত। যথা–

ক. ইতঃপূর্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মনের অবাস্তব বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা উল্লিখিত হয়েছে। সব কটির দিকে تِلْكَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঐ গুলোর মধ্য হতে একটি হলো তারা ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর একটি হলো ৪০ দিনের বেশি তারা দোজখে থাকবে না।

খ. কারো মতে تِلْكَ দ্বারা শুধু তাদের একটি বাসনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো তারা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

اَمَانِيُّ এর অর্থ : اَمَانِيُّ শব্দটি اُمْنِيَّةٌ এর বহুবচন। اُمْنِيَّةٌ-এর অর্থ– তেলাওয়াত। অর্থাৎ এটা তাদের মুখে উচ্চারণ করা পাঠমাত্র। اَمَانِيُّ-এর অন্য অর্থ اَكَاذِيْبُ। তথা মিথ্যা বক্তব্য। যেমন হযরত উসমান (রা.) বলেন– مَا تَمَنَّيْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর আমি মিথ্যা বলিনি। হযরত কাতাদা বলেন, তার জন্য যা নয় তা কামনা করাটাই اُمْنِيَّةٌ –[কুরতুবী]

هُوْدًا-এর উদ্দেশ্য : هُوْدًا বলতে ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতিরিক্ত হরফ বাদ দেওয়া হয়েছে। অথবা, هُوْدًا শব্দটি هَائِدٌ-এর বহুবচন।

قوله هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর অর্থ "তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো" এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চান যে, কেউ কোনো কিছুর দাবি পেশ করুক বা কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করুক উভয়াবস্থাতেই দলিল উপস্থাপন করতে হবে। দলিল ব্যতীত কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অন্ধ অনুসরণকে চরমভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। –[কাবীর]

قوله بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকীদার শিকার হয়ে পড়ছে। তারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল, ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করছে। কুরআন ও হাদীসের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যে সব অঙ্গীকার করা হয়েছে তারা নিজেদেরকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে– সেগুলো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কুরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, পবিত্র কুরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোনো অঙ্গীকার করেনি– যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। এই হলো بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা বা সারমর্ম।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَنْسَخْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْسَاءُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভুলিয়ে দেওয়া, বিস্মৃতি ঘটানো।

نَأْتِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ء . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা আসি, আমরা আনয়ন করি।

يَتَبَدَّلِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَدُّلُ মূলবর্ণ (ب . د . ل) জিনস صحيح অর্থ– সে পরিবর্তন করে।

اعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা মাফ কর।

اصْفَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص . ف . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ক্ষমা কর।

تُقَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّقْدِيْمُ মূলবর্ণ (ق . د . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সামনে অগ্রসর হবে। তোমরা সামনে পাঠাবে।

تَجِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ– (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাবে।

هَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব; مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিয়ে আস।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : এখানে ود ফে'ল, كَثِيْرٌ হলো فاعل আর مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ অংশটি জার মাজরূর হয়ে - ود এর সাথে متعلق অতঃপর فعل فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ শব্দটি হলো اسم ان আর ب হলো حَرْف جار ও مَجْرُور মিলে مَا تَعْمَلُوْنَ মাওসুল ও সেলা একত্রিত হয়ে হলো, অতঃপর مَجْرُور ও جار মিলে متعلق হলো بَصِيْرٌ-এর সাথে। আর بَصِيْرٌ স্বীয় فاعل ও متعلق মিলে خبر ان অতঃপর اسم ان ও خبر ان মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১১৩) আর ইহুদিরা বলে, নাসারাগণ কোনো ভিত্তির উপরই নয়, আর নাসারাগণ বলে, ইহুদিরা কোনো ভিত্তির উপর নয়, অথচ তারা সকলে কিতাব পাঠ করে, এরূপ যারা মূর্খ ও নিরক্ষর তাদের ন্যায় উক্তি করে, আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন তাদের মধ্যে কিয়ামত দিবসে। ঐ সমস্ত বিষয়ের যা নিয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে।	وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۠ وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١١٣)
(১১৪) আর কে অধিক জালিম হবে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম জিকির করতে বাধা সৃষ্টি করে এবং ঐগুলো বিরাণ হওয়ার চেষ্টা করে? এদের তো কখনো নির্ভীকভাবে ঐগুলোতে পা রাখাই উচিত ছিল না; এদের জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা হবে আর আখেরাতেও এদের ভীষণ শাস্তি হবে।	وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١١٤)
(১১৫) আর আল্লাহর আধিপত্যে পূর্ব এবং পশ্চিমও অতঃপর তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান; কেননা আল্লাহ তা'আলা [সর্বদিক] পরিবেষ্টনকারী– পূর্ণ জ্ঞানবান।	وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (١١٥)
(১১৬) আর তারা বলে আল্লাহর সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ! বরং একমাত্র তাঁরই আধিপত্যে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে, সমস্তই তাঁর আজ্ঞাধীন।	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ (١١٦)

শাব্দিক অনুবাদ

১১৩. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ আর ইহুদিরা বলে لَيْسَتِ النَّصٰرٰى নাসারাগণ নয় عَلٰى شَيْءٍ কোনো ভিত্তির উপর وَقَالَتِ النَّصٰرٰى আর নাসারাগণ বলে لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ ইহুদিরা নয় عَلٰى شَيْءٍ কোনো ভিত্তির উপর وَهُمْ অথচ তারা يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ সকলে কিতাব পাঠ করে كَذٰلِكَ এরূপ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ যারা মূর্খ ও নিরক্ষর তারা উক্তি করে مِثْلَ قَوْلِهِمْ তাদের ন্যায় فَاللّٰهُ يَحْكُمُ আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে। فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ঐ সমস্ত বিষয়ের যা নিয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে।

১১৪. وَمَنْ اَظْلَمُ আর কে অধিক জালিম হবে مِمَّنْ مَّنَعَ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে বাধা সৃষ্টি করে مَسٰجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর মসজিদসমূহে اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ তাঁর নাম জিকির করতে وَسَعٰى এবং চেষ্টা করে فِيْ خَرَابِهَا ঐগুলো বিরাণ হওয়ার اُولٰٓئِكَ এদের তো مَا كَانَ لَهُمْ উচিত ছিল না اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ কখনো নির্ভীকভাবে ঐগুলোতে পা রাখা لَهُمْ فِي الدُّنْيَا এদের জন্য দুনিয়াতেও হবে خِزْيٌ লাঞ্ছনা وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ আর আখেরাতেও এদের হবে عَذَابٌ عَظِيْمٌ ভীষণ শাস্তি।

১১৫. وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আর আল্লাহর আধিপত্যেই পূর্ব এবং পশ্চিমও فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا অতঃপর তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান اِنَّ اللّٰهَ কেননা আল্লাহ তা'আলা وَاسِعٌ [সর্বদিক] পরিবেষ্টনকারী عَلِيْمٌ পূর্ণ জ্ঞানবান।

১১৬. وَقَالُوا আর তারা বলে اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا আল্লাহর সন্তান আছে, سُبْحٰنَهٗ সুবহানাল্লাহ! بَلْ لَّهٗ বরং একমাত্র তাঁরই আধিপত্যে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে, كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ সমস্তই তাঁর আজ্ঞাধীন।

অনুবাদ	আয়াত
(১১৭) তিনি আবিষ্কর্তা আসমানসমূহ এবং জমিনের, আর যখন কোনো কাজ সমাধা করতে চান, শুধু তাকে বলেন, 'হয়ে যাও' তখনই তা হয়ে যায়।	بَدِيۡعُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَهٗ کُنۡ فَیَکُوۡنُ (١١٧)
(১১৮) আর মুর্খরা বলে– কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না আল্লাহ; অথবা আমাদের নিকট কোনো অন্য প্রমাণ আসে না; এরূপ তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের ন্যায় উক্তি করে আসতেছিল; তাদের সকলের অন্তরই পরস্পর সদৃশ; আমি তো বহু স্পষ্ট দলিল বর্ণনা করেছি দৃঢ় বিশ্বাসকামীদের জন্য।	وَقَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ لَوۡلَا یُکَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوۡ تَاۡتِیۡنَاۤ اٰیَةٌ ؕ کَذٰلِکَ قَالَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡ ؕ تَشَابَهَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ ؕ قَدۡ بَیَّنَّا الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ (١١٨)
(১১৯) আমি আপনাকে একটি সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছি যেন সুসংবাদ শুনাতে থাকেন এবং ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন, অনন্তর আপনার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে না দোজখীদের সম্বন্ধে।	اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّنَذِیۡرًا ۙ وَّلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ اَصۡحٰبِ الۡجَحِیۡمِ (١١٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৭) بَدِيۡعُ তিনি আবিষ্কর্তা السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ আসমানসমূহ এবং জমিনের وَاِذَا قَضٰۤی اَمۡرًا আর যখন কোনো কাজ সমাধা করতে চান فَاِنَّمَا یَقُوۡلُ لَهٗ তখন শুধু তাকে বলেন, کُنۡ 'হয়ে যাও' فَیَکُوۡنُ তখনই তা হয়ে যায়।

(১১৮) وَقَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ আর মুর্খরা বলে– لَوۡلَا یُکَلِّمُنَا اللّٰهُ আল্লাহ; কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না اَوۡ تَاۡتِیۡنَاۤ اٰیَةٌ অথবা আমাদের নিকট অন্য কোনো প্রমাণ আসে না کَذٰلِکَ قَالَ এরূপ উক্তি করে আসতেছিল الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ তাদের পূর্ববর্তীগণও مِّثۡلَ قَوۡلِهِمۡ তাদের ন্যায় تَشَابَهَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ তাদের সকলের অন্তরই পরস্পর সদৃশ قَدۡ بَیَّنَّا الۡاٰیٰتِ আমি তো বহু স্পষ্ট দলিল বর্ণনা করেছি لِقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ দৃঢ় বিশ্বাসকামীদের জন্য।

(১১৯) اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ আমি আপনাকে পাঠিয়েছি بِالۡحَقِّ একটি সত্য ধর্ম দিয়ে بَشِیۡرًا যেন সুসংবাদ শুনাতে থাকেন وَّنَذِیۡرًا এবং ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন وَّلَا تُسۡـَٔلُ অনন্তর আপনার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে না عَنۡ اَصۡحٰبِ الۡجَحِیۡمِ দোজখীদের সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৩) قوله وَقَالَتِ الۡیَهُوۡدُ لَیۡسَتِ النَّصٰرٰی عَلٰی شَیۡءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইহুদি সম্প্রদায় তাওরাত এবং খ্রিস্টানরা ইনজীল পাঠ ও আলোচনা করে। উভয় কিতাবের মধ্যেই উভয় কিতাবের এবং উভয় রাসূলের সত্যতামূলক বর্ণনা রয়েছে। অথচ ইহুদি সম্প্রদায় বলে, নাসারাদের ধর্ম কোনো ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, অনুরূপভাবে নাসারাও বলে ইহুদিদের ধর্ম কোনো ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়। কিতাবীদের পরস্পরের এরূপ উক্তি শ্রবণ করে আরবদের কাফেররাও নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করতে বলত, ইহুদি ও নাসারাদের উভয় ধর্মই ভিত্তিহীন, বরং আমরা সত্যের উপর রয়েছি। তাদের এহেন উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল – ২ : অপর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত নাজরারেন খ্রিস্টান ও ইহুদি নেতাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাজরানের নাসারা গোষ্ঠী যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট আসল, তখন তাঁর কাছে ইহুদি দলপতিরাও আসল। ফলে তারা পরস্পরে রাসূল (সা.)-এর সামনেই তর্কে লেগে গেল। সুতরাং রাফে' বিন হারমালা বলল, তোমরা তো কোনো ধর্মেই নেই। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং তাওরাতকেও অস্বীকার করল। অথচ ইহুদিদের কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সমর্থন এবং নাসারাদের কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সমর্থন যে রয়েছে, সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩০/১, ইবনে কাছীর : ১৫৫/১]

(১১৪) قوله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

১. ইহুদিরা যখন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করল তখন খ্রিস্টানরা তার বদলা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এক পর্যায়ে তারা ইরাকের অগ্নিপূজক বাদশাহর নেতৃত্বে সিরিয়ার বাদশাহ তাইতাশের নেতৃত্বাধীনদের উপরে আক্রমণ করল। তারা বহু ইহুদিদেরকে হত্যা করল এমন কি মসজিদে আকসার উপরও আক্রমণ করল। মসজিদে আকসার ভিতরে শুকর ও আবর্জনা ফেলে মসজিদকে নাপাক করে দিল। তাদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটির সম্পর্ক হুদায়বিয়ার সাথে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হন তখন কাফেররা হুদায়বিয়া নমক স্থানে রাসূল ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেন। যার বিস্তারিত ঘটনা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

(১১৫) قوله وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল-১ :** এ আয়াতটি সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন, যখন রাসূল ﷺ মক্কাতে ছিলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন। ইহুদিরা মনে প্রাণে চাইতো রাসূল ﷺ যেন মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। কেননা আকসা ইহুদিদের কেবলা। কিছুদিন পর রাসূল ﷺ হিজরত করে মদিনায় ফিরে যান তখন আল্লাহর নির্দেশে ষোল কিংবা সতের মাস মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। তাতে ইহুদিরা খুব আনন্দিত হলো আর পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ যখন আমাদের কেবলা অনুসরণ করেছেন। নিশ্চয় কিছুদিন পর আমাদের ধর্মও অনুসরণ করবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ মনে প্রাণে চাইতেন যাতে রাসূল ﷺ -এর কেবলা বায়তুল্লাহর দিকে করে দেওয়া হয়। পরে ষোল সতের মাস পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। যখন কেবলা পরিবর্তন হয়ে গেল তখন ইহুদিরা তিরস্কার করে বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ -এর কেবলারই ঠিক নেই। তাদের এই তিরস্কারের জওয়াবে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : আসেম বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবি'আ বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা অবন্ধকার রজনীতে আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলাম। ফলে আমরা কোনো এক স্থানে অবস্থান করলাম। তখন এক ব্যক্তি পাথর রেখে একটি মসজিদের আকৃতি বানায় এতে নামাজ আদায় করা হয়। অতঃপর যখন ভোর হলো তখন কেবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করেছি বলে বুঝতে পেলাম। সুতরাং আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কেবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করেছি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩২/১, ইবনে কাছীর : ১৫৮/১]

(১১৮) قوله وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদি খ্রিস্টান বা মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণকারী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পরও তাঁর প্রতি ঈমান আনায় অনীহা প্রদর্শন করে এবং তাদের স্বভাবগত হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সরাসরি আমাদেরকে বলে দিতেন যে, আপনি তার রাসূল। তবে আমাদের আপনাকে মান্য করতে আপত্তি থাকতো না। কিংবা তিনি যদি আমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিদর্শন প্রেরণ করতেন, তবে আমরা আপনাকে মান্য করতাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন মূর্খতাপূর্ণ আবদারের উত্তরে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১১৯) قوله إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কাফের মুশরিকদের ঈমান আনয়নে অনীহা ও দীনে হকের বিরোধিতার কারণে রাসূল (সা.) বিশেষভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে রাসূল! আমি আপনাকে সত্য দীনসহ হেদায়েতের পথযাত্রীদের প্রতি বেহেশতের সুসংবাদদাতা ও হেদায়েত বিমুখ কাফেরদের প্রতি দোজখের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ হেদায়েত পৌঁছে দেওয়াই আপনার দায়িত্ব। কে হেদায়েত গ্রহণ করছে বা করছে না তার হিসেব রাখা আপনার দায়িত্ব নয়। আর দোজখবাসীদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিতও হবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার রাসূল ﷺ নিজ পরলোকগত পিতা-মাতা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন যে, তারা কোথায় অবস্থান করছেন, বেহেশতে না দোজখে? এ বিষয়ে তিনি বেশ দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে তাকে এরূপ চিন্তা করতে বারণ করে দেন।

قوله وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইহুদি নাসারারা পরস্পর বিপরীত বক্তব্য পেশ করছে। অথচ তাদের অবস্থা হলো এই যে, তাদের নিকট ইলম রয়েছে এবং তারা কিতাব পাঠ করছে। তাওরাত এবং ইনজীলের অনুসারীদের জন্য দায়িত্ব হলো তারা নিজেদের কিতাবদ্বয়ের প্রত্যেকটি পরস্পরের স্বীকৃতি দানকারী এবং উভয়টিতে মৌলিক বক্তব্য একই ধরনের। তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং ইনজীল হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করে। তাই উভয়টির সত্যতা প্রদান করাই সকল ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কর্তব্য ছিল।

قوله قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-এর উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতাংশটি দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাব উদ্দেশ্য যারা আলেম পর্যায়ের ছিল না। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে ইহুদি এবং খ্রিস্টান তথা আহলে কিতাব বলে দাবি করত। মূলত কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের ছিল না। মা বাবা আহলে কিতাব বলেই তারা আহলে কিতাব। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে ইহুদি নাসারা তথা আহলে কিতাব বলে পরিচয় দেয় তারা সবাই এই শ্রেণিভুক্ত।

قوله فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ -এর অর্থ : আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। এ বাক্যটির চারটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– আল্লাহ সবাইকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে জাহান্নামে পাঠাবেন।

২. আল্লাহ মিথ্যাবাদী জালিম থেকে মাজলুমের ন্যায্য হক ও অধিকার দিয়ে দেবেন।

৩. তিনি এটা দেখিয়ে দেবেন যে, কে সরাসরি বেহেশতে প্রবেশ করছে, আর কে দোজখে প্রবেশ করছে।

৪. তিনি হক ও বাতিলের দাবিদারদের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়াদি ফয়সালা করবেন। –[কবীর, রুহুল মা'আনী]

قوله مِثْلَ قَوْلِهِمْ -এর উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী– مِثْلَ قَوْلِهِمْ -এর هُمْ দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা ছিল তাওরাত ও ইনজীলের আলেম। অথচ তাদের একদল বলতো ইহুদিরা সঠিক দীনের উপর নেই। আর ইহুদিরা বলত, খ্রিস্টানরা সঠিক দীনের উপর নেই। قَوْلِهِمْ দ্বারা আসলে আহলে কিতাবীদের এই বক্তব্যই উদ্দেশ্য।

قوله مِمَّنْ مَنَعَ الخ -এর মর্মার্থ : আল্লাহর বাণী– وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ -এর মধ্যে مِمَّنْ -এর مَنْ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

ক. নবীজীর আগমনের পূর্বে অত্যাচারী বাদশাহ বুখতে নসর বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইহুদিদেরকে সেখানে ইবাদত করতে দেয়নি। এখানে مَنْ দ্বারা তাকেই বুঝানো হয়েছে।

খ. অথবা, সিরিয়ার অগ্নিপূজক বাদশাহ তাইতাসকে বুঝানো হয়েছে। সে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে অবিচারে হত্যা করে এবং বায়তুল মাকদাসে ময়লা নিক্ষেপ পূর্বক সেখানে শূকর ছেড়ে দেয়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

গ. অথবা, মক্কার কাফেররা উদ্দেশ্য। কারণ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবীজী তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কা'বা ঘরে ওমরা পালনে এলে তারা মুসলমানদের কা'বা এলাকায় ঢুকতে বাধা দেয় এবং সেখানে ওমরা ও যাবতীয় কার্যকলাপ করতে বারণ করে দেয়।

ঘ. বর্তমান কালের ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে مَنْ দ্বারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে মসজিদে ইবাদত করতে বাধা দেয়। তা অতীতে, বর্তমানে, কিংবা ভবিষ্যতে যখনই হোকনা কেন। আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি এর হুকুম সর্বকালীন।

قوله مَسٰجِدَ اللّٰهِ -এর উদ্দেশ্য : এখানে مَسَاجِدَ (মাসজিদ) দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

ক. বায়তুল মাকদিস। নবীজীর আগমনের পূর্বে তা ধ্বংস করা হয়েছিল।

খ. কারো মতে মসজিদে নববী ও মসজিদে হারাম উদ্দেশ্য।

গ. কারো মতে মসজিদে আবূ বকর (রা.) উদ্দেশ্য, যা হিজরতের পূর্বে মক্কাতে ছিল। মুশরিকরা তা ভেঙ্গে ফেলে।

ঘ. বর্তমানের আলেমগণের মতে مَسَاجِدْ দ্বারা পৃথিবীর সকল মসজিদ উদ্দেশ্য। যদিও আয়াতটি বিশেষ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

حُكْمُ دُخُوْلِ الْكُفَّارِ فِى الْمَسْجِدِ : কাফেররা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। যেমন– (ক) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ করা না জায়েজ নয়। (খ) ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, জায়েজ নেই। (গ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হেরেম শরীফ ও মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যসব মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। (ঘ) এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো–

١. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ . الخ

٢. اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْهَا الخ

٣. مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ .

তবে কথা হলো, কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ সমীচীন নয়। হ্যাঁ, একান্ত যদি প্রবেশ না করলেই নয় তাহলে প্রবেশ করতে পারবে। هٰذَا مِنْ عِنْدِنَا وَعِنْدَ اللّٰهِ الصَّوَابُ

মহল্লে ই'রাবের বর্ণনা : اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ এ বাক্যটি مَنَعَ ফে'ল -এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ হিসেবে মহল্লান مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ এ বাক্যটির প্রথমে وَاوْ বর্ণটি حَالِيَةٌ পুরো বাক্যটি পূর্বোক্ত اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى হতে হাল হিসেবে মহল্লান مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমত : শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মাকদিস, মসজিদে হারাম ও মসজিদ নববীর অবমাননা যেমনি বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাজের ছওয়াব এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমান এবং মসজিদে নববী ও বায়তুল মাকদিসে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সমান। এই তিন মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট ছওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম মনে করে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে জিকির ও নামাজে বাধা দেওয়ার মতো যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামাজ ও তেলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামাজ ও জিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাজের সময় যখন মুসল্লিরা নফল নামাজ, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও জিকির করা এবং নামাজিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকহবিদগণ একে না-জায়েজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লি না থাকে, তখন সরবে জিকির অথবা তেলাওয়াত করায় কোনো দোষ নেই।

এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন মুসল্লিরা নামাজ, তাসবীহ, ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোনো ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামাজির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পায়।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য [নাউযুবিল্লাহ] বায়তুল্লাহ অথবা বায়তুল মাকদিসের পূজা করা নয়, কিংবা এ দুটি স্থানের সাথে আল্লাহর পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেওয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত হুজুরে আকরাম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেওয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাজসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোনো ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোনো কোনো মুফাসসির فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাজেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাজেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাজরত অবস্থায় রেলগাড়ি অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামাজ পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাজির জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাজি অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামাজ আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে না।

জ্ঞাতব্য : ১. বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা। যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিজিক পৌছানো ইত্যাদি কোনো না কোনো রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনোটিই এজন্য নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

২. ইমাম বায়যাভী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহকে পিতা বলা হতো। একেই মুর্খেরা জন্মদাতা অর্থে বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

জ্ঞাতব্য : ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ছিল আসমানি কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।

حُكْمُ الصَّلَاةِ اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ নামাজের সময় কেবলার প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো ফরজ। ইচ্ছা করে যদি কেউ কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে উম্মতে মুসলিমাহ একমত। তবে কেউ যদি ভুল বশতঃ কিংবা কোনো অসুবিধার কারণে অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাজ হবে কি না এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা–(ক) ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) বলেন, এমতাবস্থায় তার নামাজ শুদ্ধ হবে। পুনরায় পড়তে হবে না। (খ) ইমাম মালেকের মতে, সময় থাকলে নামাজ পুনরায় পড়ে নেওয়া মোস্তাহাব। (গ) ইমাম শাফেয়ীর মতে, নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কারণ, কিবলামুখী হওয়া ফরজ। –[কুরতুবী]

قوله وَجْهُ اللهِ-এর উদ্দেশ্য : এখানে وَجْهُ اللّٰهِ -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

(ক) হাকীকী : وَجْهٌ অর্থ মুখমণ্ডল। তখন মুখমণ্ডল বলে আল্লাহর অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। এটাকে মানতেকের ভাষায় تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ بِاِرَادَةِ الْكُلِّ বলে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তো নিরাকার, তাহলে তাঁর মুখমণ্ডল হবে কি করে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ নিরাকার নয়। তাঁর আকার অবশ্যই আছে। তবে তা আমরা জানিনা যে, তাঁর আকার কিরূপ। এমনিভাবে তাঁর وَجْهٌ আছে। এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত। তারা বলেন– اَلْوَجْهُ لَهٗ مَعْلُوْمٌ وَكَيْفِيَّتُهٗ مَجْهُوْلٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ وَاجِبٌ-

(খ) মাজাযী : অর্থাৎ, وَجْهُ اللّٰهِ অর্থ হবে رِضَا اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে তোমরা যে দিকেই ফিরে নামাজ পড়না কেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।

قوله وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ.............كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ : বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা বলত, 'হযরত ওযায়ের (আ.) ছিলেন اِبْنُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর পুত্র। খ্রিস্টানরা বলত, 'ঈসা (আ.) ছিলেন اِبْنُ اللّٰهِ তথা 'আল্লাহর পুত্র'। অন্য দিকে একদল বর্বর মুশরিক মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি জন্মগ্রহণও করেন নি। জন্ম দেওয়া নেওয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। এ কথার স্বপক্ষে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

قوله بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে بَدِيْعٌ শব্দটি خَالِقٌ বা خَلِيْقٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بَدِيْعٌ মূলতঃ بَدْعٌ ক্রিয়ামূল থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। بَدْعٌ অর্থ সৃষ্টি করা। এমন সৃষ্টিকে بَدْعٌ বলা হয় যার পূর্বে কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মূলতঃ আসমান ও জমিনের কোনো আকার আয়তন কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এসব সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহকে بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বলা হয়েছে। তেমনিভাবে দীনে ইসলামিতে যদি কেউ এমন কোনো ইবাদত প্রচলিত করে যার নমুনা ইতঃপূর্বে ছিল না তাকে مُبْتَدِعٌ এবং ইবাদতটিকে بِدْعَةٌ বলা হয়। –[কুরতুবী ও অন্যান্য]

قوله وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا-এর ব্যাখ্যা : قَضَىٰ শব্দের লুগাতী অর্থ মীমাংসা করল, মিটমাট করল। শব্দটি أَمْر 'আদেশ দিয়েছেন' অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ কিন্তু এখানে শব্দটি ২টি অর্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা রাখে। যথা–(ক) قَصَدَ অর্থ ইচ্ছা করলেন, সংকল্প করলেন। (খ) عَزَمَ অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

أَمْر শব্দের নানান প্রেক্ষাপটে প্রায় ২০টির মতো অর্থ হয়ে থাকে। তবে আলোচ্য আয়াতে "ব্যাপার" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ أُمُوْرِ دِيْنِكُمْ এখানে أُمُوْر শব্দটি أَمْر -এর বহুবচন। অর্থ– তোমাদের দিনের বিষয়ে। সুতরাং, আয়াতাংশটির অর্থ দাঁড়ায় "যখন তিনি (আল্লাহ তা'আলা) কোনো ব্যাপারে কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি বিষয়টিকে লক্ষ্য করে বলেন, "হও" অতঃপর তা হয়ে যায়।

قوله وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ .... لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ : হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর বর্ণনা মতে, একদা মক্কার কাফেররা নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দু'টি দাবি পেশ করে। তারা বলে–

* হে মুহাম্মদ! তুমিতো সত্য নবী! তবে আল্লাহকে বল তিনি যেন তোমার নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন,
* তিনি যেন আমাদের উদ্দেশ্যে এমন একটি নিদর্শন প্রেরণ করেন যার মাধ্যমে আমরা তোমার নবুয়তের সত্যতা বুঝতে পারব। তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উল্লিখিত কথাগুলো মদীনার ইহুদি নেতা রাফে' ইবনে খোযাইমার।
* মুজাহিদ বলেন, উল্লিখিত বক্তব্য খ্রিস্টানদের। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর]

قوله إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ : অনেক দলিল প্রমাণ পেশ করার পরও কাফের, মুশরিক, ইহুদি ও নাসারাগণ নবীজীর প্রতি ঈমান আনেনি। অধিকন্তু নবীজীকে নানান অবান্তর প্রশ্ন করে তাদের কুফরিকে আরো বৃদ্ধি করেছে। ফলে নবীজী আশঙ্কা করেন যে, কিয়ামত দিবসে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ ভেবে তিনি অনেক বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قوله الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী– وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যে لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা–

ক. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য।

খ. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর দ্বারা খ্রিস্টানরা উদ্দেশ্য।

গ. ইমাম সুদ্দী ও কাতাদাহ বলেন, এরা হলো মক্কার কাফের।

ঘ. তবে আয়াতের শানে নুযূল ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাবদের বুঝানো হয়েছে যাদের কোনো কিতাবের জ্ঞান ছিল না। যারা মূর্খ ছিল, তবুও তারা বংশগতভাবে নিজেদেরকে আহলে কিতাব বলে পরিচয় দিত।

قوله تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের অন্তর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে ইহুদি নাসারাগণ যেমন হঠকারিতামূলক আচরণ করছে, তাদের পূর্বপুরুষরাও এমনি ছিল। তারাও তাদের নবীদের সাথে এরূপ আচরণই করেছে। তাদের অন্তরে রয়েছে কুটিলতা, যেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের অন্তরে। এদিক থেকে তাদের অন্তর পূর্ববর্তীদের অন্তরের সাথে সাদৃশ্যময়। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله بِالْحَقِّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْحَقّ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

ক. دِيْنُ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে– أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِدِيْنِ الْحَقِّ

খ. اَلْقُرْاٰنُ তখন আয়াতের অর্থ হবে– إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْقُرْاٰنِ الخ –(তাফসীরে মা'আরিফ)

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা তেলাওয়াত করে, পাঠ করে।

سَعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلسَّعْىُ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে চেষ্টা করেছে।

يَدْخُلُوْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د ـ خ ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবেশ করে।

خَآئِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয়কারীগণ।

خِزْىٌ : বাব ضرب-এর মাসদার। অর্থ– অবমাননা, লাঞ্ছনা।

اَلْمَغْرِبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ ظرف زمان ومكان অর্থ– সূর্যাস্তের স্থান এবং সূর্যাস্তের সময়, সূর্যাস্তের দিক।

تُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা যে দিকেই মুখ কর।

عَلِيْمٌ : علم মাসদার হতে مبالغة-এর সীগাহ। শব্দটি একবচন, বহুবচন عُلَمَاءُ অর্থ– জ্ঞানী।

قٰنِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ– (ق ـ ن ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– তারা সকলেই তাঁর আজ্ঞাধীন।

تَشَابَهَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش ـ ب ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তাদের অন্তর একে অপরের সাদৃশ্য হয়ে গেছে।

قَدْ بَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى قريب معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب ـ ي ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা বয়ান করে দিয়েছি।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা বিশ্বাস করে।

بَشِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه অর্থ– সুসংবাদদাতা। [রাসূল (সা.)-এর একটি গুণবাচক নাম।]

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে واو হলো حالية আর هُمْ হলো مبتدأ এবং يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ জুমলা হয়ে خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : এখানে لَهُمْ ও فِى الْاٰخِرَةِ উভয়টি ثابت উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم আর عذاب হলো موصوف এবং عَظِيْمٌ হলো তার صفت। موصوف ও صفت মিলে مبتدأ مؤخر অতঃপর خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰهِ জার মাজরূর মিলে خبر مقدم আর اَلْمَشْرِقُ হলো معطوف عليه এবং المغرب হলো معطوف ; অতঃপর معطوف عليه ও معطوف মিলে مبتدأ مؤخر এবং مبتدأ ও خبر مقدم মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর لفظ اللّٰهَ হলো اسم اِنَّ এবং وَاسِعٌ عَلِيْمٌ হলো خبر ان অতঃপর ان স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

وَلَنۡ تَرۡضٰی عَنۡكَ الۡیَهُوۡدُ وَلَا النَّصٰرٰی حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡ ؕ قُلۡ اِنَّ هُدَی اللّٰهِ هُوَ الۡهُدٰی ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ اَهۡوَآءَهُمۡ بَعۡدَ الَّذِیۡ جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیۡرٍ (۱۲۰)

অনুবাদ : (১২০) আর কখনো আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না ইহুদিরাও এবং নাসারারাও যাবৎ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন, আপনি বলুন! বস্তুত আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তাই হেদায়েতের রাস্তা; আর যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য আল্লাহ হতে রক্ষাকারী কোনো বন্ধুও থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও না।

اَلَّذِیۡنَ اٰتَیۡنٰهُمُ الۡكِتٰبَ یَتۡلُوۡنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ ؕ وَمَنۡ یَّكۡفُرۡ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ (۱۲۱)

(১২১) যাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব আর তারা তা তেলাওয়াত করতেছে যথোচিতভাবে; এরূপ লোকেই তার প্রতি ঈমান আনে, আর যারা তা অমান্য করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِیَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ وَاَنِّیۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَی الۡعٰلَمِیۡنَ (۱۲۲)

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতগুলো স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, আর এটাও যে, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তোমাদেরকে বহু লোকের উপর।

وَاتَّقُوۡا یَوۡمًا لَّا تَجۡزِیۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَیۡئًا وَّلَا یُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا تَنۡفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمۡ یُنۡصَرُوۡنَ (۱۲۳)

(১২৩) আর তোমরা এমন দিনকে ভয় কর– যেদিন আদায় করতে পারবে না কেউ কারো পক্ষ হতে কোনো দাবি আর না কারো পক্ষ হতে কোনো বিনিময় গৃহীত হবে আর না কারো পক্ষে কোনো সুপারিশও ফলপ্রদ হবে, আর না তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ

১২০. وَلَنۡ تَرۡضٰی আর কখনো সন্তুষ্ট হবে না عَنۡكَ আপনার উপর الۡیَهُوۡدُ ইহুদিরাও وَلَا النَّصٰرٰی এবং নাসারারাও حَتّٰی যাবৎ না تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡ আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন قُلۡ আপনি বলুন! اِنَّ هُدَی اللّٰهِ বস্তুত আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তাই هُوَ الۡهُدٰی হেদায়েতের রাস্তা وَلَئِنِ اتَّبَعۡتَ আর যদি আপনি অনুসরণ করেন اَهۡوَآءَهُمۡ তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের بَعۡدَ الَّذِیۡ جَآءَكَ مِنَ الۡعِلۡمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর مَا لَكَ তবে আপনার জন্য থাকবে না مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ হতে রক্ষাকারী مِنۡ وَّلِیٍّ কোনো বন্ধুও, وَّلَا نَصِیۡرٍ আর কোনো সাহায্যকারীও না।

১২১. اَلَّذِیۡنَ اٰتَیۡنٰهُمُ যাদেরকে আমি দান করেছি الۡكِتٰبَ কিতাব یَتۡلُوۡنَهٗ আর তারা তা তেলাওয়াত করতেছে حَقَّ تِلَاوَتِهٖ যথোচিতভাবে اُولٰٓئِكَ এরূপ লোকেই یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ তার প্রতি ঈমান আনে وَمَنۡ یَّكۡفُرۡ بِهٖ আর যারা তা অমান্য করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১২২. یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ হে বনী ইসরাঈল! اذۡكُرُوۡا স্মরণ কর نِعۡمَتِیَ আমার সেই নিয়ামতগুলো الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি وَاَنِّیۡ فَضَّلۡتُكُمۡ আর এটাও যে, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তোমাদেরকে عَلَی الۡعٰلَمِیۡنَ বহু লোকের উপর।

১২৩. وَاتَّقُوۡا یَوۡمًا আর তোমরা এমন দিনকে ভয় কর– لَّا تَجۡزِیۡ যেদিন আদায় করতে পারবে না نَفۡسٌ কেউ عَنۡ نَّفۡسٍ কারো পক্ষ হতে شَیۡئًا কোনো দাবি وَّلَا یُقۡبَلُ আর না কারো পক্ষ হতে গৃহীত হবে عَدۡلٌ কোনো বিনিময় وَّلَا تَنۡفَعُهَا আর না কারো পক্ষে কোনো ফলপ্রদ হবে شَفَاعَةٌ সুপারিশও وَّلَا هُمۡ یُنۡصَرُوۡنَ আর না তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে।

وَاِذِ ابۡتَلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِکَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیۡ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهۡدِی الظّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۲۴﴾

(১২৪) আর যখন পরীক্ষা করলেন, ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু কয়েকটি বিষয়ে, তিনি তা পূর্ণরূপে সমাধা করলেন। আল্লাহ বললেন, আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাব, তিনি বললেন, আর আমার বংশধরগণ হতেও, আল্লাহ বললেন, আমার [এই] পদ অবাধ্য লোকেরা পাবে না।

وَاِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَیۡتَ مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ وَاَمۡنًا ؕ وَاتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَعَهِدۡنَاۤ اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِیۡنَ وَالۡعٰکِفِیۡنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ ﴿۱۲۵﴾

(১২৫) আর যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের ইবাদতের স্থান এবং নিরাপত্তার স্থান করলাম এবং [বললাম] মাকামে ইবরাহীমকে নামাজ পড়ার স্থান বানিয়ে নাও; আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম আমার ঘরটিকে খুব পবিত্র রেখ বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য।

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارۡزُقۡ اَهۡلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ بِاللّٰهِ وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنۡ کَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیۡلًا ثُمَّ اَضۡطَرُّهٗۤ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۱۲۶﴾

(১২৬) আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে প্রভু! এটাকে একটি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে ফলাদি দ্বারা অনুগৃহীত করুন যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ বললেন, আর যে কাফের তাকেও, বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব, অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে দোজখের আজাবে পৌঁছিয়ে দিব, আর সেই পৌছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ।

শাব্দিক অনুবাদ

১২৪. وَاِذِ ابۡتَلٰۤی আর যখন পরীক্ষা করলেন اِبۡرٰهٖمَ ইবরাহীমকে رَبُّهٗ তাঁর প্রভু بِکَلِمٰتٍ কয়েকটি বিষয়ে فَاَتَمَّهُنَّ তিনি তা পূর্ণরূপে সমাধা করলেন قَالَ আল্লাহ বললেন اِنِّیۡ جَاعِلُکَ আমি আপনাকে বানাব لِلنَّاسِ اِمَامًا মানুষের ইমাম, قَالَ তিনি বললেন وَمِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ আর আমার বংশধরগণ হতেও قَالَ আল্লাহ বললেন لَا یَنَالُ পাবে না عَهۡدِی আমার [এই] পদ الظّٰلِمِیۡنَ অবাধ্য লোকেরা।

১২৫. وَاِذۡ جَعَلۡنَا আর যখন আমি করলাম الۡبَیۡتَ কাবা গৃহকে مَثَابَۃً لِّلنَّاسِ মানুষের ইবাদতের স্থান وَاَمۡنًا এবং নিরাপত্তার স্থান وَاتَّخِذُوۡا এবং বানিয়ে নাও مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ মাকামে ইবরাহীমকে مُصَلًّی নামাজ পড়ার স্থান; وَعَهِدۡنَاۤ আর আমি আদেশ করলাম اِلٰۤی اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِیۡلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে اَنۡ طَهِّرَا খুব পবিত্র রেখ بَیۡتِیَ আমার ঘরটিকে لِلطَّآئِفِیۡنَ বহিরাগত وَالۡعٰکِفِیۡنَ ও স্থানীয় লোকদের জন্য وَالرُّکَّعِ السُّجُوۡدِ এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য।

১২৬. وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهٖمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন رَبِّ اجۡعَلۡ هٰذَا হে প্রভু! পরিণত করুন এটাকে بَلَدًا اٰمِنًا একটি নিরাপত্তাময় শহরে وَّارۡزُقۡ اَهۡلَهٗ এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে অনুগৃহীত করুন مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলাদি দ্বারা مَنۡ اٰمَنَ مِنۡهُمۡ যারা ঈমান রাখে بِاللّٰهِ আল্লাহর প্রতি وَالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি قَالَ আল্লাহ বললেন وَمَنۡ کَفَرَ আর যে কাফের তাকেও فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیۡلًا বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব ثُمَّ اَضۡطَرُّهٗۤ অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়েপৌছিয়ে দিব اِلٰی عَذَابِ النَّارِ দোজখের আজাবে وَبِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ আর সেই পৌছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২০) قوله وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন, মদিনার ইহুদি ও নাজরানের নাসারাগণ মনে প্রাণে চাইতো যে, রাসূল ﷺ যেন তাদের কেবলা অনুসরণ করেন। যখন বায়তুল্লাহকে কেবলা বানিয়ে দেওয়া হলো তখন তাদের মন ভেঙ্গে গেল। তারা যে আশা করেছিল রাসূল আমাদের ধর্ম অনুসরণ করবেন সে আশাও ভেঙ্গে গেল তখনই এই আয়াত নাজিল হলো।

শানে নুযূল– ২ : ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূল ﷺ -এর সাথে কোনো কোনো বিষয়ে সমঝোতা করতে চেয়েছিল। তাদের কামনা ছিল তিনি যদি তাদের মতাদর্শ মেনে নেয়, তাহলে তারাও কিছু কিছু বিষয়ে মেনে নিবে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সেই ধর্ম নিরপেক্ষা তার দিকে নবী করীম ﷺ -কে দাওয়াত দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩৬/১, মা'আরেফন নুযূল : ৯৭/১]

(১২১) قوله اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি নাজিল হয় নাজ্জাশীর কিছু সাথীদের ব্যাপারে যারা মূলত আহলে কিতাবী ছিল। তারা হাবশা থেকে রাসূল ﷺ -এর দরবারে আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। তাদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

(১২৫) قوله وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, জাফর বিন আবূ তালেবের সাথে নৌকায় আরোহণ করে আগত নাসারাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা ৩২ জন ছিল আবিসিনিয়ার [বর্তমান ইথিওপয়া] অধিবাসী এবং সিরিয়ার ৮ জন সংসার ত্যাগি রাহেব। মতান্তরে তাদের কতিপয় নাজরান অধিবাসী, কতিপয় আবেসিনিয়া এবং কতিপয় ছিল রোমীয়। আর ৮ জন ছিল নৌকার মাঝি মাল্লা। তারা সকলেই জাফর বিন আবূ তালেবের সাথে এসেছিল। যাহহাক বলেন, তারা হলেন, সে সকল ইহুদি, যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, ইবনে সূরিয়া ও ইবনে ইয়ামিন প্রমূখ। এ সকল ঈমানদারগণের ফাজায়েল ও মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : এই আয়াত সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) একদা রাসূল ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাকামে ইবরাহীম কে নামাজের স্থান বানিয়ে নিলে ভালো হতো তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তাই তো হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার তিনটি সিদ্ধান্ত আল্লাহর তিনটি সিদ্ধান্তের সাথে মিলে গেছে। ১. আমি রাসূলূল্লাহ ﷺ -এর কাছে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান বানানোর আবেদন করেছিলাম। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান ঘোষণা করেন। ২. আমি রাসূল ﷺ -কে বলেছিলাম, আপনার বিবিদের কাছে ভালোমন্দ উভয় ধরনের লোক যায়। অতএব তাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার নির্দেশ দিলে ভালো হয় তখন এই পর্দার আয়াত নাজিল হয়। ৩. যখন রাসূল ﷺ -এর বিবি আত্মমর্যাদার দাবি করল তখন আমি বললাম عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ তখন আল্লাহ হুবহু আমার একথাটি নাজিল করেন।

قوله وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী। ইহুদি নাসারাদের খেয়ালিপনার অনুসরণ তিনি করতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁকে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ বলে ধমক দেওয়ার হেতু কি? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। যথা– (ক) এখানে যদিও اتَّبَعْتَ বলে রাসূল ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে, তবুও এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র উম্মতকে সতর্ক করা। (খ) অথবা, যেহেতু নবীজী ﷺ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন, তাদেরকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। মূলতঃ এমনটি করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়নি; ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কর্ম থেকে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সতর্ক করার পর যেন এমনটি আর কখনো না হয়। যদি হয় তাহলে আল্লাহর কোনো সাহায্য সহযোগিতা তার জন্য থাকবে না। কাজেই এই সতর্কবাণী নবীজীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। –[তাফসীরে বায়যাবী]

قوله اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ **-এর উদ্দেশ্য :** আল্লাহর বাণী– 'আমরা যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি' এ বাক্যে اَلَّذِيْنَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–(ক) মুমিনগণ, কারণ তাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে। তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে এবং এর প্রতি ঈমান রাখে। (খ) অথবা, ঐ সকল আহলে কিতাব যারা ঈমান এনেছিল। কারণ পূর্ব থেকেই আহলে কিতাবদের আলোচনা চলে আসছে। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله الكِتٰبِ -এর উদ্দেশ্য : আলোচ্যাংশে اَلْكِتٰبَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–(ক) আল-কুরআন। অথবা, (খ) তাওরাত ও ইঞ্জিল। তখন يُؤْمِنُوْنَ -এর ہ যমীর দ্বারা রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য হবে। ইবারত এভাবে হতে পারে– أُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِالرَّسُوْلِ কারণ পূর্ববর্তী এই কিতাবে নবীজীর নবুয়তের প্রমাণাদি বর্ণিত ছিল। আর যারা যথার্থভাবে তা পাঠ করেছে তারাই নবীজীর প্রতি ঈমান এনেছে।

قوله حَقَّ تِلَاوَتِهٖ -এর ব্যাখ্যা ঃ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ দ্বারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা– (ক) অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা, (খ) পড়ে আমল করা, (গ) তাজভিদসহ তেলাওয়াত করা, (ঘ) তাহরীফ না করে পড়া, এর সব কটি অর্থই একসাথে উদ্দেশ্য হতে পারে।

বনী ইসরাঈল কারা ? بَنِىْ শব্দটি মূলে ছিল بَنُوْنَ ইযাফতের কারণে ن বর্ণটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। শব্দটি مُنَادٰى مُضَاف হওয়াতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তাই بَنِىْ হয়ে গেছে। অর্থ পুত্রগণ। এখানে বংশধর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْرَائِيْل শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দা। আর ইসরাঈল দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

قوله اتَّقُوْا يَوْمًا -এর উদ্দেশ্য : সকল মুফাস্সির একমত যে, এখানে يَوْمًا দ্বারা يَوْمُ الْحِسَابِ তথা বিচার দিবস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুণরুত্থানের পর যেদিন আল্লাহ বলবেন, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ "হে পাপিষ্ঠের দল তোরা আজ পৃথক হয়ে যা," সেদিনকে يَوْمَ الْحِسَابِ –ও বলা হয়। পবিত্র কুরআনে উহাকে يَوْمَ الْقِيَامَةِ ও বলা হয়েছে। সেদিন প্রত্যেকে তার পাপ পুণ্যের হিসেব হাতের কাছে পাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

সেদিন যার পাপের বোঝা ভারি হবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ এসব কারণেই আল্লাহ অত্র দিবসের ব্যাপারে সর্তক থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেওয়া হলো, এতে হযরত খলীলুল্লাহর প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযত খলীলুল্লাহর পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু : এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। কারো কোনো অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে?

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেওয়া হলো?

পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর আলোচনা করা হলো।

প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কুরআনের একটি শব্দ رَبُّهٗ [তার পালনকর্তা] এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আর তাঁর 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' [পালনকর্তা] নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের [পালনকর্তৃত্বের] দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোনো বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই পরীক্ষা কোনো অপরাধের সাজা হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কুরআনে শুধু كَلِمٰت [বাক্যসমূহ] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশি অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোনো বিরোধ নেই; বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের অভিমতও তাই।

আল্লাহর কাছে সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশি : পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না; বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশি, তা শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়; বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তু মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূণ বিষয় এই–

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.) কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেওয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরূদ ও তার পরিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহর খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

অর্থাৎ আমি হুকুম দিলাম : হে অগ্নি! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ কোনো বিশেষ স্থানের আগুনকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের আগুনও এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কুরআনে। بَرْدًا [শীতল] শব্দের সাথে سَلٰمًا [নিরাপদ] শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোনো বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক; বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سَلٰمًا বা না হলে আগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে পারত।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রা.) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল (আ.) কে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তর গমন করুন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোনো শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল (আ.) বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই, গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল। [যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল,] তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহর বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহর বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি।' বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরিও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্বিকার– কোনো উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলিলুল্লাহর সহধর্মিনী। ব্যাপার বুঝে গেলেন ডেকে বললেন, আপনি কি আল্লাহর কোনো নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ! খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশিমনে বললেন, যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দিবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুন পিপাসা তাঁকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোনো মানুষ দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ

ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহর রহমত নাজিল হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষও এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হলো।

হযরত ইসমাঈল (আ.) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন, এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى - قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ-

'বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল! তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরজ করলেন, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন।'

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ.) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য পুত্রকে জবাই করানো ছিল না; বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেননি; বরং জবাই করেছেন, অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তা-ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে অর্থাৎ স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বেহেশত থেকে এর পরিপুরক নাজিল করে তা কুরবানি করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহকে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হলো। তন্মধ্যে দশটি কাজ খাসায়েলে ফিতরত [প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান] নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত। ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোজাদার, রুকূ-সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাজতকারী– এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মুমিনুনে বর্ণিত দশটি গুণ হলো এই–

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাজে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত জাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালজ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

সূরা আহযাবে বর্ণিত দশটি গুণ হলো–
"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিনী নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারিনী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারিণী নারী, তাদের সবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"
কুরআনের তাফসীর বিশারদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনোক্ত كَلِمَاتٌ যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।
এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হলো।
তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাফল্যেল প্রকার ও শ্রেণি সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কুরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সফল্যেলর স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে;
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন।
চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে– বলা হয়েছে : إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا পরীক্ষার পর আল্লাহ বলেন– "আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব।"
এ আয়াত দ্বারা একদিকে ইঙ্গিত করা গেল যে, হযরত খলীল (আ.)-কে সাফল্যের প্রতিদান মানবসমাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–
"যখন তারা শরিয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হলো এবং আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাসী হলো, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"
এই আয়াতে صَبْر [সংযম] ও يَقِيْن [বিশ্বাস] শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। صَبْر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يَقِيْن কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।
পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান দেওয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?
এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেওয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত খলীলুল্লাহর মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা : এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে।

হরম সম্পর্কিত মাসায়েল
১. مَثَابَةً শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন لَا يَقْضِي أَحَدٌ مِنْهَا وَطَرًا অর্থাৎ কোনো মানুষ কা'বা গৃহের জেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না; বরং প্রতিবারই জেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোনো কোনো আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ জিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে দ্বিতীয়বার তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই জিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম

মনোরম দৃশ্যও এক দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোনো মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

২. এখানে أَمْنًا শব্দের অর্থ مَأْمَنٌ অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। بَيْتَ শব্দের অর্থ শুধু কা'বাগৃহ নয়; বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ কা'বা গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গন। কুরআনে بَيْتَ اللّٰهِ ও كَعْبَة শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে বুঝানো হয়েছে, তার আরো বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে– هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كَعْبَة বলে সমগ্র হরমকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এতে কুরবানির কথা আছে। কুরবানি কা'বা গৃহের অব্যন্তরে হয় না এবং যেখানে কুরবানি করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমি কা'বার হরমকে শান্তির আলয় করেছি।' শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। –[ইবনে আরাবী]

৩. وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى –এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ– ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। –[সহীহ বুখারী] হযরত আনাস (রা.) বলেন, ঐ পাথরে আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন দেখেছি জেয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। –[কুরতুবী]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকাত নামাজ মাকামে ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোনো অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকহ শাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

৪. আলোচ্য আয়াতে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। –[সহীহ মুসলিম] এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন– যদি কেউ মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোনো দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

৫. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামাজ ওয়াজিব। –[জাস্সাস, মোল্লা আলী ক্বারী] তবে এ দু' রাকাত নামাজ বিশেষভাবে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দু' রাকাত নামাজ কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে। –[জাস্সাস]। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু' রাকাত মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নত। যদি কোনো কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনোখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

৬. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بَيْتِيَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোনো মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সব মসজিদই আল্লাহর ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে– فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ হযরত ফারুকে আজম (রা.) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, জান না? [কুরতুবি] অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং পাগলদেরও মসজিদে প্রবেশে করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৭. لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। **প্রথমতঃ** কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ এ'তেকাফ ও নামাজ। **দ্বিতীয়তঃ** তওয়াফ আগে আর নামাজ পরে। [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অভিমত তাই]। **তৃতীয়তঃ** বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাজের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরজ হোক অথবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোনো নামাজ পড়া বৈধ। –[জাস্সাস]

مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ-এর পরিচয় : مَقَامْ শব্দের বাংলা হলো দাঁড়াবার জায়গা; মাকামে ইবরাহীম তথা ইবরাহীম (আ.)-এর দাঁড়াবার জায়গা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন–

- বর্ণিত আছে যে, কা'বা নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি পাথরের উপর দাঁড়াতেন। ফলে পাথরটিতে তাঁর উভয় পায়ের চিহ্ন বসে যায়। ঐ পাথরটিকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়।
- কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর স্ত্রীকে দেখতে আসেন তখন ঘোড়া থেকে অবতরণের সুবিধার্থে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী একটি পাথর এগিয়ে দেন এবং ঐ পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) অবতরণ করেন। ঐ পাথরটিকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছে।
- অথবা, যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিশ্ববাসীকে হজের জন্য আহবান করেছিলেন, সে পাথরকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছে।
- অথবা, কা'বা গৃহের কাছে যে স্থানে ঐ পাথর আজ অব্দি রাখা আছে সেই স্থানকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলা হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

মাকামে ইবরাহীমের মাঝে নামাজ পড়া যায় কি? মাকামে ইব্রাহীম মূলতঃ একটি ছোট পাথর যার উপর সর্বোচ্চ একজন লোক দাঁড়াতে পারে। এর মাঝে নামাজ পড়া সম্ভব নয়। তবে এখানে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলে যদিও একটি পাথর উদ্দেশ্য তবুও مُصَلًّى বলতে ঐ পাথরের আশ পাশের প্রশস্ত জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মসজিদে নববী বললে এর আশ পাশের এলাকাও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বুঝায়। –[বয়ানুল কুরআন]

কা'বা ঘরের ভিতরে নামাজের বিধান : কা'বা ঘর নামাজের জন্য কিবলা। এর চারপাশে নামাজ আদায় করা হয়। কিন্তু কা'বা ঘরের ভিতরে নামাজ পড়া বৈধ কি না এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের মাঝে মতানৈক্য দেখা গেছে।

- ইমাম আ'জম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, কা'বার ভিতরে কি ছাদে, ফরজ কি নফল সকল প্রকার নামাজ পড়া বৈধ হবে।
- ইমাম মালেক (র.) বলেন, কা'বার ভিতরে ফরজ পড়া যাবে না। তবে নফল পড়া যাবে। কেউ যদি ফরজ পড়ে ফেলে তাহলে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে।
- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কা'বা ঘরের ভিতরে যদি কেউ দেয়ালের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে তবে শুদ্ধ হবে। আর যদি কা'বার খোলা দরোজার দিকে মুখ করে কিংবা ছাদে উঠে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কারণ তার নামাজ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ হয়নি।

উল্লেখ্য, এখানে ইমাম আজমের কথাই অধিক যুক্তিযুক্ত। –[কুরতুবী]

قوله اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ -এর মর্ম : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র কর।" এই কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা–

- মুশরিকদের রাখা মূর্তি মুক্ত করা,
- তাতে নিক্ষেপিত ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-সাফ করা।
- উলঙ্গ নারী-পুরুষের তওয়াফ থেকে মুক্ত করা।
- অপবিত্রা নারীদের প্রবেশ থেকে মুক্ত রাখা।
- সব রকমের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা। –[রূহল মা'আনী]

قوله قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ -এর উদ্দেশ্য : প্রশ্ন হলো قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ বাক্যে قَالَ- এর قَائِلْ কে? এর দু'টি উত্তর পাওয়া যায়। যেমন–

- ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা.)-এর ভাষ্যমতে قَالَ- এর قَائِلْ হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তখন فَاُمَتِّعْهُ ও اَضْطَرَّهٗ এর সীগাহ দু'টি শব্দ ধরা হবে।

➢ উবাই ইবনে কা'ব ও ইবনে ইসহাক বলেন قَالَ -এর قَائِلُ আল্লাহ স্বয়ং; এবং فَأُمَتِّعُهُ ও أَضْطَرُّهُ -এর সীগাহগুলো وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ হবে। –[কুরতুবী]

قوله اِجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন, হে আমার রব, আপনি এই মক্কা নগরীকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। তবে যারা খোদাদ্রোহী তাদের জন্য পৃথিবীর কোনো স্থানই নিরাপদ নয়। তাই কোনো সীমালঙ্ঘনকারী যদি হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে, যে কোনো পন্থায় তাকে হেরেমের বাইরে এনে তার ওপর হদ কায়েম করতে হবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কা নগরী কি ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার পর থেকে নিরাপদ হয়েছে না, পূর্ব থেকেই নিরাপদ ছিল? এ ব্যাপারে অনেকেই মতানৈক্য করেছেন।

মক্কা নগরী পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই হারাম বা পবিত্র নগরী ছিল। তাদের দলিল নবী করীম (সা.)-এর এই বাণী–

اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ এই নগরীকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত এটি পবিত্র নগরী হিসেবে বহাল থাকবে।"

একদল আলেম মনে করেন– এটা ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হারাম নগরীতে পরিণত হয়েছে। যেমন– নবীজীর দোয়ার বরকতে মদিনা হারাম নগরীতে পরিণত হয়েছে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন, قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِاَهْلِهَا

ইবনে আতিয়া বলেন, উভয় মতের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রথম মতে, মক্কা নগরী হারাম হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর ইলেমে ছিল, দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে হযরত ইব্রাহীমের দোয়ার বরকতে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ইমাম তাবারী অনুরূপ মত পোষণ করেন। –[কুরতুবী]

কা'বা নির্মাণ কাহিনী

কা'বা পৃথিবীর প্রথম ঘর। এর পূর্বে পৃথিবীতে কোনো ঘর ছিল না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا الخ প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এ ঘর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। তখন থেকে অদ্যাবধি এই ঘরের পুনঃনির্মাণ ও পুনঃসংস্কার প্রায় ১০ বার সংঘটিত হয়।

১. প্রথমতঃ স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ ঘর তৈরি করেন। আদম সৃষ্টির প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে এই নির্মাণ কাজ অনুষ্ঠিত হয়। কালক্রমে তা মাটি চাপা পড়ে যায়।
২. তারপর আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের পর তিনি এই ঘর পুনঃনির্মাণ করেন।
৩. অতঃপর হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানরা এর সংস্কার সাধন করে।
৪. হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে প্লাবনের সময় এ ঘর ধ্বসে যায়। বহুকাল পর আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহীম (আ.) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ.) যৌথভাবে এ ঘর পুনঃনির্মাণ করেন।
৫. দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কা'বা ঘর পুনরায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়লে আরবের আমালেকা গোত্র তা পুনঃসংস্কার করে।
৬. এর দীর্ঘদিন পর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর শ্বশুর গোষ্ঠী জুরহাম গোত্রের লোকেরা পুনঃসংস্কার করে।
৭. এরপর কুসাই ইবনে কিলাব গোত্র তা পুনঃসংস্কার করে।
৮. মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর কিশোর বয়সে মক্কার কুরাইশগণ কা'বা গৃহকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করে। মদিনার জিন্দেগীতে নবীজী তা মাকামে ইবরাহীমের উপর পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও আর সময় পাননি। ফলে কুরাইশরা যে ভিত্তির উপর কা'বা নির্মাণ করেছিল আজ অব্দি সেই ভিত্তির উপরই রয়ে গেল।
৯. পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর উমাইয়া শাসনামলে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শ্রুত একটি হাদীস মোতাবেক মাকামে ইব্রাহীমী সহ কা'বা গৃহ পুনঃ সংস্কার করেন।
১০. তারপর খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কা'বা গৃহের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। যা আজ পর্যন্ত বহাল আছে।

অতঃপর হিজরি ১৪০ সালে তুর্কী বাদশাহ মুরাদখান কুরাইশদের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করেন এবং প্রথম কা'বাকে গোলাফ আবৃত করেন। তারপর থেকে সৌদি বাদশাহগণ বিভিন্ন সময় এর সংস্কার সাধন করেছেন। বিশেষ করে বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজের সময়ে এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মূলতঃ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ ফেরেশতা, হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম ও কুরাইশ গোত্রের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। বাকিগুলো সব সংস্কার কাজ ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

اتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ– (و . ق . ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর, পরহেজগারী অবলম্বন কর।

تَجْزِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ– (ج . ز . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তা যথেষ্ট হবে, তা বদলা হবে, তা কাজে আসবে।

نَفْسٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْفُسٌ، نُفُوْسٌ ; অর্থ– প্রাণ, প্রাণী, ব্যক্তি।

ابْتَلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ– (ب . ل . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে লিপ্ত হয়েছে।

لَا يَنَالُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن . ى . ل) জিনসে اجوف يائى অর্থ– সে পাবে না।

مَثَابَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم ظرف অর্থ– লোকদের জন্য সম্মিলিত স্থান।

اتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তুমি বানাও, তুমি গ্রহণ কর।

مُصَلًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص . ل . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– নামাজ পড়ার স্থান।

طَآئِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلطَّوَافُ মূলবর্ণ (ط . و . ف) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তওয়াফকারীগণ।

الرُّكَّعِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন راكع অর্থ– রুকূ' করা। ঝুঁকা।

اُمَتِّعُه : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি ফায়েদা ভোগ করার সুযোগ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ىْ হলো তার اسم আর جَاعِلُ হলো شبه فعل আর كَ হলো مفعول আর لِلنَّاسِ হলো متعلق আর اِمَامًا হলো مفعول ثانى অতঃপর جَاعِلُكَ জুমলা হয়ে خبر ان অতঃপর اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ : এখানে لَا يَنَالُ ফে'ল আর عَهْدِىْ শব্দটি مضاف و مضاف اليه মিলে فاعل আর الظّٰلِمِيْنَ হলো مفعول এবং ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ: এখানে اُرْزُقْ ফে'ল ও ফা'য়েল اَهْلَهٗ শব্দটি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول আর مِنَ الثَّمَرَاتِ হলো متعلق অতএব, ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٢٧)

(১২৭) আর যখন নির্মাণ করছিলেন ইবরাহীম কাবাগৃহের প্রাচীর এবং [সহায়করূপে] ইসমাঈলও [বললেন] হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হতে কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনি খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٢٨)

(১২৮) হে আমাদের প্রভু! আর আমাদেরকে আপনার আরো অধিক অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধর হতেও আপনার অনুগত একদল লোক পয়দা করুন আর আমাদেরকে আমাদের হজের আহকামও বলে দিন এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন, আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই বিশেষ যত্নবান এবং মেহেরবান।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٢٩)

(১২৯) হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল নির্দিষ্ট করে দিন যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন; নিশ্চয় আপনিই প্রবল ক্ষমতাবান পূর্ণ সংবিধানকারী।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٣٠)

(১৩০) ইবরাহীমী ধর্ম হতে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে যে মূলেই নির্বোধ, আর আমি তাঁকে দুনিয়ায় নির্বাচিত করেছি এবং তিনি আখেরাতে অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত।

শাব্দিক অনুবাদ

১২৭. وَاِذْ يَرْفَعُ আর যখন নির্মাণ করছিলেন اِبْرٰهِيْمُ ইবরাহীম الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ কাবাগৃহের প্রাচীর وَاِسْمٰعِيْلُ এবং ইসমাঈলও رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু تَقَبَّلْ مِنَّا আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন اِنَّكَ اَنْتَ নিঃসন্দেহে আপনি السَّمِيْعُ খুব শ্রবণকারী الْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী।

১২৮. رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! وَاجْعَلْنَا আর আমাদেরকে বানিয়ে নিন مُسْلِمَيْنِ لَكَ আপনার আরো অধিক অনুগত وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ এবং আমাদের বংশধর হতেও اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন وَاَرِنَا আর আমাদেরকে বলে দিন مَنٰسِكَنَا আমাদের হজের আহকামও وَتُبْ عَلَيْنَآ এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন اِنَّكَ اَنْتَ আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই التَّوَّابُ বিশেষ যত্নবান الرَّحِيْمُ এবং মেহেরবান।

১২৯. رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! وَابْعَثْ فِيْهِمْ নির্দিষ্ট করে দিন رَسُوْلًا مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ যিনি তাদেরকে পড়ে শুনাবেন اٰيٰتِكَ আপনার আয়াতসমূহ وَيُعَلِّمُهُمُ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও হিকমত وَيُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন اِنَّكَ اَنْتَ নিশ্চয় আপনিই الْعَزِيْزُ প্রবল ক্ষমতাবান الْحَكِيْمُ পূর্ণ সংবিধানকারী।

১৩০. وَمَنْ يَّرْغَبُ আর ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমী ধর্ম হতে اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ যে মূলেই নির্বোধ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ আর আমি তাঁকে নির্বাচিত করেছি فِى الدُّنْيَا দুনিয়ায় وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ এবং তিনি আখেরাতে لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত।

(১৩১) যখন তাঁকে তাঁর প্রভু বললেন, অনুগত হও, তখন তিনি বললেন, আমি অনুগত হলাম বিশ্বপ্রতিপালকের।	اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۱۳۱)
(১৩২) আর এরই হুকুম করে গেছেন ইবরাহীম নিজ সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ এই ধর্মকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা ইসলাম ব্যতীত আর কোনো অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না।	وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ؕ (۱۳۲)
(১৩৩) তোমরা কি স্বয়ং উপস্থিত ছিলে? যখন ইয়াকূবের মৃত্যুকাল উপনীত হয়েছিল, যখন তিনি নিজ সন্তানদের বললেন, তোমরা আমার পরে কিসের ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা তাঁর ইবাদত করব আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক যাঁর ইবাদত করে আসছেন অর্থাৎ, এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদের, আর আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।	اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (۱۳۳)
(১৩৪) এটা একটি জামাত ছিল যা অতীত হয়ে গেছে, তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে, তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের কাজে আসবে, তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাও তো করা হবে না।	تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۳۴)

শাব্দিক অনুবাদ

১৩১. اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ যখন তাঁকে তাঁর প্রভু বললেন اَسْلِمْ অনুগত হও قَالَ اَسْلَمْتُ তিনি বললেন, আমি অনুগত হলাম لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের।

১৩২. وَوَصّٰى بِهَاۤ আর এরই হুকুম করে গেছেন اِبْرٰهٖمُ ইবরাহীম بَنِيْهِ নিজ সন্তানদেরকে وَيَعْقُوْبُ এবং ইয়াকূবও يٰبَنِىَّ হে আমার সন্তানগণ! اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى আল্লাহ মনোনীত করেছেন لَكُمُ তোমাদের জন্য الدِّيْنَ এই ধর্মকে فَلَا تَمُوْتُنَّ সুতরাং তোমরা মৃত্যুবরণ করো না اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ইসলাম ব্যতীত আর কোনো অবস্থায়।

১৩৩. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ তোমরা কি স্বয়ং উপস্থিত ছিলে? اِذْ حَضَرَ যখন উপনীত হয়েছিল يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ইয়াকূব-এর মৃত্যুকালে اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ যখন তিনি নিজ সন্তানদের বললেন مَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা কিসের ইবাদত করবে? مِنْۢ بَعْدِىْ আমার পরে قَالُوْا তারা বলল نَعْبُدُ আমরা তাঁর ইবাদত করব اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষ যাঁর ইবাদত করে আসছেন اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক اِلٰهًا وَّاحِدًا এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদের وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ আর আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।

১৩৪. تِلْكَ اُمَّةٌ এটা একটি জামাত ছিল قَدْ خَلَتْ যা অতীত হয়ে গেছে لَهَا مَا كَسَبَتْ তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে, وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের কাজে আসবে وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাও তো করা হবে না عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩০) قوله وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁর দুই ভাতিজা সালামা এবং মুহাজিরকে এই বলে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন দেখ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য নবী। এবং কুরআন সত্য কিতাব আর তোমরা এটাও জান যে, তাওরাতের মধ্যে শেষ নবীর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তখন সালামা ইসলাম গ্রহণ করলেন কিন্তু মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করল না। তাদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাজিল হয়।

(১৩৩) قوله أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন, একবার ইহুদিরা বলতে লাগল যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) ইন্তেকালের সময় তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদি হওয়ার অসিয়ত করেছিল। তাদের এই অমূলক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া : رَبِّ শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ– 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এ জাতীয় শব্দ আল্লাহর রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম দোয়া এই: "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও– যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।"

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে– পরওয়ারদেগার! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও। অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোনো শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। তারা কা'বা ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত আনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা ঘর ও তার পাশ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ তা'আলা হরমের চতুঃসীমায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েজ নয়। জীব-জন্তুর মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা মুকাররমা ও পাশ্ববর্তী ভূমি কোনোরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে ছিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়।

হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর সাবধানতা: আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালেম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও খোদাভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ভয় ও

সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে: وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের, মুশরিক হয়। তবে মুমিনদেরকে ইহকাল ও পরকালসর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা : হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনো আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত; কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহর এমন এক বন্ধু যিনি আল্লাহর প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহর উপযুক্ত ইবাদত ও আনুগত্য কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার এ আমল কবুল কর। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই বলেছেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ –এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর। কারণ মা'রেফাত তথা আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততবেশি অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ – এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালোবাসা রাখেন। কিন্তু এই ভালোবাসার দাবিসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লার প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন: "আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর।" সন্তানদের জন্য এ দোয়ার মধ্যে আরো একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। –[বাহরে মুহীত]

হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনো সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহর আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁরও অশ্রদ্ধা ছিল। –[বাহরে মুহীত]

يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ –তেলাওয়াতের আসল অর্থ– অনুসরণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কুরআন ও অন্যান্য আসমানি কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য। আসমানি গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরি। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোনো শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন: "আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তেলাওয়াত বলা যায় না।"

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ –এখানে কিতাব বলে আল্লাহর কিতাব বুঝানো হয়েছে। 'হিকমত' শব্দটি আরবি অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা– সত্যে উপনীতি হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। –[কামুস]

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেন : এ শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, বিদ্যমান বস্তুরসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সত্য কথা ইত্যাদি। –[কামুস ও রাগেব]

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তাফসীরকার সাহাবীগণ হুজুরে আকরাম ﷺ-এর কাছ থেকে শিখে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর কাতাদাহ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান, কেউ শরিয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হলো রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ।

وَيُزَكِّيهِمْ – زَكوة শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ভবিষ্যত বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন– যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দিবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্য গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ স্বগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছে: প্রত্যুত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ জমানায় প্রেরণ করা হবে।' –[ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য : মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ বলেন: 'আমি আল্লাহর কাছে তখনও পয়গম্বর ছিলাম, যখন হযরত আদম (আ.) ও পয়দা হননি; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরি হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি: আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ আমি এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নুর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদাসমূহ আলোকজ্জ্বল করে তুলেছে। কুরআনে হুজুর (সা.)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু' জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমায় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে পয়গম্বরের জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি : সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে- ইমরান ও সূরা জুমার বিভিন্ন আয়াতে হুজুর ﷺ সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী ﷺ -এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তাঁর রেসালাতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কুরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানি গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কুরআন তেলাওয়াত : এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তেলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কুরআনে অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তেলাওয়াত ও হেফাজত ফরজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী ﷺ -এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ছিলেন তাঁরা শুধু আরবি ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না; বরং অলঙ্কার পূর্ণ আরবি ভাষার একজন বাগ্মী কবিও ছিলেন।

তাঁদের সামনে কুরআন পাঠ করাই বাহ্যতঃ তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কুরআন অপরাপর গ্রন্থের মতো নয়– যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কুরআন এমন নয়। কুরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কুরআনের সংজ্ঞা এভাবে هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দ সম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কুরআন। এতে বুঝা যায়, কুরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কুরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কুরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাজে পাঠ করলে তার নামাজ হবে না। এমনিভাবে কুরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধান ও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কুরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন, বাংলা কুরআন অথবা ইংরেজি কুরআন' বলা হয়। কারণ ভাষান্তরিত কুরআন প্রকৃতপক্ষে কুরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়– ছওয়াবের কাজ :

একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মতো শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কুরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোনো গ্রন্থের শব্দাবলি পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কুরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানি গ্রন্থের নামই কুরআন। কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধিন পালন করা যেমন ফরজ ও উচ্চস্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ। কেননা মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ "কুরআন শরীফ তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত"।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বুঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বুঝা এবং আমল করার জন্য একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কুরআন তেলাওয়াতকে 'অন্ধের যষ্টি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কুরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কুরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কুরআনের সাত মনজিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের এ কার্যধারাই যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের ইবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তব্যসমূহের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ কুরআনের অর্থ বুঝে না, শব্দের ছওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বুঝার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি, যাতে কুরআনের সত্যিকারের নুর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কুরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। [মা'আযাল্লাহ] কুরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে নির্গত হয়।'

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ : মহানবী ﷺ-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক নাপাকী থেকে পবিত্র করা বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক নাপাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহতে

এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সুফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা : আল্লাহর গ্রন্থ ও রাসূল : এ প্রসঙ্গে আরো দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রাসূলগণের ধারা। আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাজিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি; বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কুরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন, যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। কোনো ফেরেশতা বা গ্রন্থ কখনো গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও একদিকে পবিত্র শরিয়ত ও অন্যদিকে কৃতি পুরুষগণ রয়েছেন। কুরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

সমগ্র কুরআনের সারমর্ম হলো সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হলো সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কুরআনের পথ, রাসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু প্রভুভক্তের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে–

'সিরাতে মুস্তাকীম হলো তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গজবে পতিত ও গোমরাহ হয়েছে।' অন্য এক জায়গায় নিয়ামত প্রাপ্তদের আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

–এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও পরবর্তীকালের জন্য কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে–

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– 'আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।'

মোটকথা, কুরআনের উপরিউক্ত নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। ১. কুরআনের হেদায়েত এবং ২. তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরিয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোনো বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশি।

কেউ কেউ কুরআনে প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরিয়তের অনুসারী কি না, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। কুরআন বলে– اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে

স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে; যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো উস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে– 'আল্লাহর কিতাব কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বুঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বুঝাবুঝি কোনো কোনো সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ, 'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করব।'

এ ওয়াদার ফলেই কুরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহর ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোনো পক্ষ থেকে এতে কোনো বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থি এমন একদল আলেম থাকবেন, যারা কুরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কুরআন বাস্তবায়নের জন্য রাসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কুরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যন্ত ফরজ। কাজেই রাসূলের শিক্ষাও কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের জমানা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামি বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরিউক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বুঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কুরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক : পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীনে কার্যতঃ প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুজুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবীগণের যে একটি দল তৈরি হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর, বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহর উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কুরআন তাদের প্রশংসায় বলে– وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

'যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকূ'-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহর কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।' –[সূরা ফাতাহ : ২৯]

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিস্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাগুরুর চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টা যত্নের পরও এমন কৃতি পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রসমাজও বেশির চেয়ে বেশি তাদের মতোই হতে পারবে। এ কারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালাতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হলো। পরিশেষে সংক্ষেপে আরো জানা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদুর বাস্তবায়িত করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হতো। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কুরআন খতম করতেন। কুরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচুর।

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কুরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কুরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড গণ্য করা হতো। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণ ও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতি হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত আয়াতে ইবরাহীমী দীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ ইবরাহীমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোনো সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মতো পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পরিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলা-কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও পরিকল্পনাকে ধুলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড আগুনকেও তাঁর বন্ধুর জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো। বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফের, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনে-প্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবি করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে কর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ, ওমরা, কুরবানি ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা ঐ নিয়ামতেরই ফলশ্রুতি– যার দরুন খলীলুল্লাহ (আ.)-কে 'মানব নেতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল– اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। এই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)এর মর্যাদা কুরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহর আনুগত্য শুধু মাত্র ইসলামেই সীমাবদ্ধ : অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের ইবরাহীমী মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে– إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ অর্থাৎ, 'ইবরাহীম (আ.) কে যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন, আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।' এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার أَسْلِمْ আনুগত্য অবলম্বন কর। সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনের ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ [আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম] বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ অর্থাৎ, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনোই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরো জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত– যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানি গ্রন্থসমূহ নাজিল করা হয়েছে। এতে আরো বুঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কুরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

'ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম'। 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মান্বেষণ করে, তার পক্ষ থেকে তা কখনো কবুল করা হবে না'।

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহর কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম– যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর ধম, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, তথা ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলো সরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে [ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে] মুসলিম [অর্থাৎ, আনুগত্যশীল] কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।' হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন– فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 'তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছে– مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا 'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতঃপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও [অর্থাৎ কুরআনেও] এ নামই রাখা হয়েছে।'

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবি মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, এবং যত আসমানি গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য এং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ করা।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরিয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে– যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরিয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণীয় নয়।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসিয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালোবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রেসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থি নয়। আল্লাহর বন্ধু যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানি করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নিয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লিখিত আয়াত وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ আর আয়াত اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নিয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানি ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে ন্তানকে সারা জীবনে অভিজ্ঞতালবব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসিয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ : পয়গম্বরগণের এই বিশেষণ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশি তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালোবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আজাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরো একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনেযোগ দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে– প্রথমতঃ প্রকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচেয়ে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
'হে মুমিনগণ! নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল। তাঁর হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আরো বলা হয়েছে– وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, পরিবার-পরিজনকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়তঃ আরো একটি রহস্য এই যে, কোনো মতবাদ ও কর্মসূচিতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল– يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا অর্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না : لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না– যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদিদের সে দাবিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা'ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব তা নয়।

কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে:
'প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।' অন্য এক আয়াতে আছে– 'কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "হে বনী হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহর আজাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে "আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।"

শব্দ বিশ্লেষণ

الْقَوَاعِدَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قاعدة অর্থ– প্রাচীর।

تَقَبَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تفعّل মাসদার التَّقَبُّلُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ তুমি কবুল কর।

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِرَائَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ا ـ ى) জিনসে মোরাক্কাব, مهموز عين، ناقص يائى অর্থ– আমাদেরকে দেখিয়ে দিন [শিখিয়ে দিন]

ابْعَثْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب ـ ع ـ ث) জিনসে صحيح অর্থ– তুমি পাঠাও।

اصْطَفَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– আমরা নির্বাচিত করেছি।

لَاتَمُوْتُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তোমরা মরো না।

شُهَدَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন شَهِيْدٌ; অর্থ– উপস্থিত, বিদ্যমান।

كَسَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك ـ س ـ ب) জিনসে صحيح অর্থ– সে আমল করল।

لَاتُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّوَالُ মূলবর্ণ (س ـ أ ـ ل) জিনসে مهموز عين অর্থ– তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ك যমীর হলো اسم এবং اَنْتَ হলো যমীরে فاصل আর السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ হলো اِنَّ এর خبر এভাবে ان স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ : এখানে اِبْعَثْ হলো فعل ও اَنْتَ যমীর فاعل আর فِيْهِمْ হলো জার মাজরূর হয়ে متعلق আর رَسُوْلٌ হলো مفعول অতএব, مفعول ـ فاعل ـ فعل ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ : এখানে يُعَلِّمُ হলো ফে'ল ও هُوَ যমীর فاعل আর هُمْ যমীর مفعول এবং اَلْكِتَابَ হলো مفعول ثانى অতএব, فعل , فاعل ও উভয় مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ: এখানে اَسْلَمْتُ ফে'ল ও ফা'য়েল আর ل হলো حرف جار এবং رب হলো مضاف ও العلمين হলো مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবং جار ও مجرور মিলে متعلق হলো অতঃপর فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ হলো مبتدأ আর مُسْلِمُوْنَ হলো خبر ও مبتدأ খবর মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥)

অনুবাদ : (১৩৫) আর তারা বলে, তোমরা ইহুদি হও কিংবা নাসারা হও, তোমরাও সৎপথ পাবে, আপনি বলুন, আমরা তো ইবরাহীমী ধর্মের উপর থাকব যাতে বক্রতার নামও নেই; আর ইবরাহীম মুশরিকও ছিলেন না।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٦)

(১৩৬) [হে মুসলমনাগণ!] বলে দাও যে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি আর যা আমাদের প্রতি অবতারিত হয়েছে, আর তার [বিধানের] প্রতিও যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাঁর আওলাদের প্রতি, আর তার প্রতিও যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে, আর তার উপরও যা অন্যান্য নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে, এভাবে যে, আমরা তাদের মধ্যে কাউকেও কোনো পার্থক্য করি না, এবং আমরা আল্লাহর অনুগত।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣٧)

(১৩৭) অতঃপর তারাও যদি ঐরূপ ঈমান আনে যেরূপ তোমরা এনেছ, তবে তারাও সঠিক পথ পাবে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা তো বিরোধিতায় লেগেই আছে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে পূর্ণ বুঝাপড়া করবেন, আর আল্লাহ শুনতেছেন, জানতেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

১৩৫. وَقَالُوْا আর তারা বলে। كُوْنُوْا তোমরা হও هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি কিংবা নাসারা। تَهْتَدُوْا তোমরাও সৎপথ পাবে قُلْ আপনি বলুন بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ বরং আমরাই তো ইবরাহীমী ধর্মের উপর থাকব حَنِيْفًا যাতে বক্রতার নামও নেই وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর ইবরাহীম মুশরিকও ছিলেন না।

১৩৫. قُوْلُوْٓا [হে মুসলমনাগণ!] বলে দাও যে, اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا আর যা আমাদের প্রতি অবতারিত হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর তার [বিধানের] প্রতিও যা নাজিল হয়েছে اِلٰٓى প্রতি اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীম وَاِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ ইসহাক وَيَعْقُوْبَ ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطِ এবং তাঁর আওলাদের وَمَآ اُوْتِيَ আর তার প্রতিও যা প্রদান করা হয়েছে مُوْسٰى وَعِيْسٰى মূসা ও ঈসাকে وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ আর তার উপরও যা অন্যান্য নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে مِنْ رَّبِّهِمْ তাঁদের রবের তরফ হতে لَا نُفَرِّقُ এভাবে যে, আমরা কোনো পার্থক্য করি না بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে কাউকেও وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা আল্লাহর অনুগত।

১৩৭. فَاِنْ اٰمَنُوْا অতঃপর তারাও যদি ঐরূপ ঈমান আনে بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ। فَقَدِ اهْتَدَوْا তবে তারাও সঠিক পথ পাবে। وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ তবে তারা তো বিরোধিতায় লেগেই আছে فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ তবে শীঘ্রই আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে পূর্ণ বুঝাপড়া করবেন وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আর আল্লাহ শুনতেছেন, জানতেছেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ (١٣٨)

(১৩৮) আমরা সেই রঙ্গেই থাকব যে রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রঞ্জিত করেছেন, আর এমন কে আছে যার রঞ্জন আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সুন্দর হবে? আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ (١٣٩)

(১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা কি তর্ক জুড়েছ আমাদের সাথে আল্লাহর সম্বন্ধে? অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আর আমরা পাব আমাদের কর্মফল এবং তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল, আর আমরা শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে খাঁটি করে রেখেছি।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٠)

(১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের বংশধর ইহুদি বা নাসারা ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরাই কি অধিক ওয়াকিফ, না আল্লাহ? আর কে হবে অধিক জালেম সেই ব্যাক্তি হতে যে গোপন করে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য : আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤١)

(১৪১) তা ছিল একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে, তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আর তাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

১৩৮. صِبْغَةَ اللّٰهِ আমরা সেই রঙ্গেই থাকব যে রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রঞ্জিত করেছেন وَمَنْ اَحْسَنُ আর এমন কে আছে অধিক সুন্দর হবে? مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ অপেক্ষা صِبْغَةً রাঙ্গানোর বেলায় وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।

১৩৯. قُلْ আপনি বলুন اَتُحَآجُّوْنَنَا তোমরা কি তর্ক জুড়েছ আমাদের সাথে فِى اللّٰهِ আল্লাহর সম্বন্ধে? وَهُوَ رَبُّنَا অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু وَرَبُّكُمْ আর তোমাদেরও প্রভু وَلَنَآ اَعْمَالُنَا আর আমরা পাব আমাদের কর্মফল وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ আর আমরা শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে খাঁটি করে রেখেছি।

১৪০. اَمْ تَقُوْلُوْنَ অথবা তোমরা কি বলছ যে, اِنَّ اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীম وَاِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ ইসহাক وَيَعْقُوْبَ ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطَ এবং ইয়াকূবের বংশধর كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি বা নাসারা ছিলেন? قُلْ আপনি বলে দিন ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ তোমরাই কি অধিক ওয়াকিফ اَمِ اللّٰهُ না আল্লাহ? وَمَنْ اَظْلَمُ আর কে হবে অধিক জালেম مِمَّنْ كَتَمَ সেই ব্যাক্তি হতে যে গোপন করে شَهَادَةً সাক্ষ্য عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে।

১৪১. تِلْكَ اُمَّةٌ তা ছিল একটি জামাত قَدْ خَلَتْ যা অতীত হয়েছে لَهَا مَا كَسَبَتْ তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের কাজে আসবে وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ আর তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৫) قوله وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : প্রচলিত ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে শিরক থাকায় তা গ্রহণ যোগ্য নয়। অথচ তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম পালনীয় খৎনা, হজ ইত্যাকার কোনো কোনো কাজ করার কারণে নিজেদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীম অনুসারী বলে মনে করত। তেমনিভাবে মুশরিকরাও এ ধরনের কিছু কাজের জন্য নিজেদের ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করত। তাই ইহুদি ও নাসারাদের সাথে আরব মুশরিকদেরও প্রতিবাদে বলা হলো তোমাদেরও হযরত ইবরাহীমের মধ্যে যখন শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য রয়েছে। তখন কেবল কোনো কোনো আনুষ্ঠানিক কার্য পালন করেই তোমরা কি মিল্লাতে ইবরাহীমের দাবি করতে পার? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

(১৩৮) قوله صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً الخ আয়াতের শানে নুযূল : খ্রিস্টানরা পুত্র– সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিবসে হলুদ বর্ণের পানিতে গোসল করায়। একে তারা বাপ্তাইজম বা বাপ্তাইষ্ট করা বলে। আর বলে সে এবার খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের ঐ কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে অনুষ্ঠানের যথার্থতা কি? কারো যদি রং ধারণ করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহর রং ধারণ করে। এ ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৩৯) قوله قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইহুদিরা মুসলমানগণকে বলত যে, আমরা প্রথম আহলে কিতাব, আমাদের কিবলাও তোমাদের কিবলা হতে পূর্বের। অতএব, বনী ইসরাঈল ব্যতীত আরবদের মধ্য হতে কোনো নবী হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যদি নবী হতেন, তবে আমাদের মধ্য হতেই হতেন। তাদের উল্লিখিত ধারণা বাতিল করার জন্য উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হয়।

কুরআন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরকে اَسْبَاطْ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سِبْط-এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবিলার পর হযরত মূসা (আ.) যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান দ্বারা হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ তা'আলা আরো একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রাসূল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, হযরত আদম (আ.)–এর পর হযরত নূহ, শোয়াইব, হূদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, ইসমাঈল, ও মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ (যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ) সূরা বাকরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-আর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী রাসূল, আল্লাহর কিতাব ও এ সবের শিক্ষা

সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী রাসূগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থি।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবিদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবি মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টানরাও করত এবং প্রতিটি যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহর কাছে তা ধিকৃত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কোনো কোনো দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোনো কোনো পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'আল্লাহ' অথবা 'আল্লাহর পুত্র' অথবা আল্লাহর সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে– بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ আয়াতে।

ইসলামি শরিয়তে রাসূলের মহত্ত্ব ও ভালোবাসা ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রাসূলকে ইলম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও শিরক। আজকাল কোনো কোনো মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহর মতোই সর্বত্র বিরাজমান' 'উপস্থিত ও দর্শক' [হাজির ও নাজির] বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী ﷺ-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহর কাছে মহানবী (সা.)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রাসূলের যেকোনো রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা : এমনিভাবে কোনো কোনো সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' [সর্বশেষ নবী]-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রাসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী-যিল্লী' [ছায়া-নবী] 'নবী-বুরুযী' [প্রকাশ্য নবী] ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশটিকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী-বুরুযী' বলে কোনো নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোনো অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় : কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তুও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ উক্তির পরিপন্থি হওয়ার কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলি কুরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের দিন পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুণরুত্থান স্বীকার করা এবং আজাব, ছওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

ইখলাসের তাৎপর্য : وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ : বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

قوله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর বাণী "তিনি তথা ইব্‌রাহীম মুশরিক ছিলেন না।" এ কথার মাধ্যমে ইহুদিদের একটি দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের খাঁটি অনুসারী বলে দাবি করত। অথচ তারা প্রত্যক্ষ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা নবী উযায়িরকে اِبْنُ اللّٰهِ অথবা আল্লাহর পুত্র বলত। অথচ ইব্‌রাহীম (আ.) ছিলেন শিরক মুক্ত। কাজেই তাদের দাবির সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। একথা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে– وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অনেকের মতে নাসারা এবং মুশরিকদেরও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল।

قوله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ-এর ব্যাখ্যা : মুমিনদের বক্তব্য নবীদের কারোর মাঝে 'আমরা পার্থক্য করি না।' এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(ক) আমরা সকল নবীকেই নবী মনে করি। ইহুদিরা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর আর হযরত উযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। আমরা এমনটি করি না।

(খ) আমরা সকল নবীকে সত্য পথের দায়ী মনে করি, এতে কোনো পার্থক্য করি না।

(গ) বংশ বিবেচনা পূর্বক ইহুদি নাসারাদের মতো আমরা নবীদের মর্যাদার ব্যাপারেও কোনো পার্থক্য করি না।

(ঘ) তাছাড়া প্রত্যেক নবী একই দাওয়াত প্রদান করেছেন, এ ব্যাপারেও আমরা দ্বিমত করি না। বরং মূলগতভাবে সবাই মানুষকে আল্লাহর পথেই ডেকেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী– شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ-

قوله اَتُحَآجُّوْنَنَا-এর মর্ম : তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করবে?" এ বাক্যের مخاطب ও مخاطب কে ও কারা তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

- বাক্যটি مُخَاطِبْ বা সম্বোধনকারী হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)।
- আলোচ্য বাক্যের مُخَاطَبْ হলো মদিনার ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। কারণ, ঝগড়াটি ছিল তাদের সাথে।
- কারো মতে, مُخَاطَبْ হলো সমুদয় মুশরিক জাতি।
- কারো মতে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক সকলেই এই বাক্যের مُخَاطَبْ

তবে আয়াতের বাচনভঙ্গি ও বর্ণনার ধরন থেকে মনে হয় প্রথম অভিমত অধিক গ্রহণ যোগ্য। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : ইহুদিরা তাদের হস্তগত আল্লাহর সাক্ষ্যকে গোপন করেছিল বলেই আল্লাহ তাদেরকে اَظْلَمُ অধিক অত্যাচারী বলে তিরস্কার করেছেন। এখানে شَهَادَةً দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

- তাওরাতে প্রমাণ ছিল যে, আহমদ নামে আখেরী নবী আসবে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলিও উল্লেখ ছিল। তা তারা গোপন করেছে।
- হযরত ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) প্রমুখ নবী রাসূলগণ যে ইহুদি ছিলেন তার প্রমাণ ও তাদের কাছে ছিল যা তারা গোপন করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, شَهَادَةً দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাওরাত ও ইহুদিদের নিকট সংরক্ষিত পরবর্তীদের অসিয়তসমূহ উদ্দেশ্য হতে পারে।

ঝগড়ার বিষয়

ইহুদিরা যে বিষয়ে ঝগড়া করছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- মুসলমানগণ নয় বরং তারাই হকের উপর আছে।
- অথবা, আরবের মুশরিক অপেক্ষা ইহুদিরাই উত্তম।
- তারা ব্যতীত অন্য কেউ বেহেশতে যাবে না।
- অথবা, ইহুদি ধর্ম বর্তমান থাকতে ইসলাম ধর্মের প্রয়োজন নেই।

ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে ইহুদিদের সাথে মু'মিনদের ঝগড়া হয়েছে বটে, তবে এখানে ঝগড়ার বিষয়বস্তু ছিল নবুয়ত বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় থেকে হতে পারে না। –[তাফসীরে কবীর]

قوله صِبْغَةَ اللهِ -এর ব্যাখ্যা : صِبْغَةَ শব্দের অর্থ مَا يُصْبَغُ بِهٖ অর্থাৎ, যার মাধ্যমে রঙ্গিন হয়। صِبْغَةٌ শব্দটি বাব فَتَحَ -এর مَصْدَرٌ অর্থ– রঙ্গিন করা। যেমন– صَبَغَ الثَّوْبَ সে কাপড় রঙ্গিন করল। صِبْغَةٌ -এর বহুবচন صِبْغٌ কিন্তু এখানে صِبْغَةَ اللّٰهِ অর্থ হলো اَلْفِطْرَةُ الَّتِىْ خَلَقَ اللّٰهُ عَلَيْهَا النَّاسَ অর্থাৎ, ঐ দীন বা স্বভাব যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

অথবা صِبْغَةَ اللهِ অর্থ হলো– اَلدِّيْنُ الَّذِيْ شَرَعَهُ اللّٰهُ لَهُمْ (ঐ দীন যা আল্লাহ মানুষের জন্য শরিয়ত করে দিয়েছেন)। কাজেই صِبْغَةَ اللهِ -এর অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহর প্রদত্ত দীনের আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করা।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَصٰرٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন نَصْرَانٌ، نَصْرَانِىٌّ অর্থ– খ্রিস্টান, ইসায়ী, হযরত ঈসা (আ.) -এর অনুসারী।

تَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ– (ه . د . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– তোমরা হেদায়েত পাবে।

اَلنَّبِيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اَلنَّبِىُّ অর্থ– নবীগণ বা পয়গম্বরগণ।

لَانُفَرِّقُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মূলবর্ণ (ف . ر . ق) জিনসে صحيح অর্থ– আমরা পার্থক্য করি না।